গোয়েন্দার দপ্তর ২০১৬

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

গোয়েন্দার চোখ, ২০১৬
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ৩১০ জন জনবলের গোয়েন্দা বাহিনী নিয়ে উপ-পরিচালকের কার্যালয় হিসাবে ১৯৭৪ সালে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮২ সালে এটি পুনর্গঠন করে পরিচালকের কার্যালয়ে রুপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে মহাপরিচালকের কার্যালয় হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে এবং তখন আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রামে অতিরিক্ত পরিচালককে আঞ্চলিক প্রধান করে এটি পুনরায় পুনর্গঠন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে আরো তিনবার এর জনবল সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে এই অধিদপ্তর ৩২৯ জন জনবল নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ কাস্টমস প্রশাসন ও বিশ্ব কাস্টমস অঙ্গনের গর্বিত অংশীদার হিসাবে চোরাচালান ও অপবাণিজ্য রোধে নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে কার্যত ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য উদারীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এই অধিদপ্তরের মূল মন্ত্র হলো 'নিরাপদ বাণিজ্যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ'।

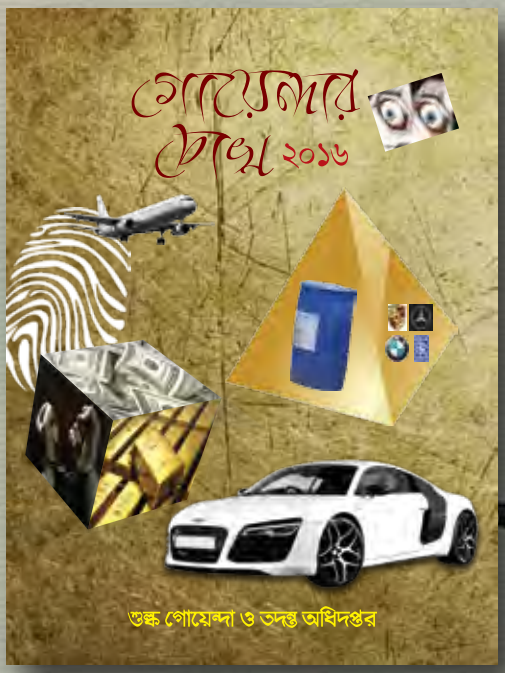

প্রকাশক : শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

সম্পাদনা : **ফেরদৌসী মাহবুব, সহকারি পরিচালক**

জোবায়দা খানম, সহকারি পরিচালক

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: প্রিন্ট ভট, ৯০, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

ফোন : **০১৮১১-৪৮২৮১৫**

মুদ্রণ : প্রিন্ট ভট, ৯০, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৬

মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সময়ের পরিক্রমায় শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বার্ষিক প্রকাশনা 'গোয়েন্দার চোখ' এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সৃষ্টিশীল উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

শুল্ক ফাঁকি, বাণিজ্যিক জালিয়াতি ও চোরাচালানের মতো অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিহত করার পাশাপাশি বাণিজ্য-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ দপ্তরের অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বৈধ বাণিজ্যের জন্য এক নিরাপদ দ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে এ দপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, যা ইতোমধ্যে নন্দিত হয়েছে। বিশেষ করে স্বর্ণ, মুদ্রা, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে এই দপ্তরের কর্মকর্তাদের ভূমিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আমদানিকৃত গাড়িসহ অন্যান্য পণ্য আটক এবং অর্থ পাচার রোধে শুল্ক গোয়েন্দাদের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। এসবের মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় এই দপ্তরের অবদান স্বীকৃত।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ভবিষ্যতেও পরিশীলিত মেধা, মনন ও দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষায় আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

২১/৭/১৬

[আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি]

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

'গোয়েন্দার চোখ' এর সফল দুটো প্রকাশনার পর তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশনালগ্নে শুভকামনা রইল।

রাজস্ব ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা এবং দেশীয় স্বার্থ রক্ষার্থে শুল্ক গোয়েন্দার সাফল্য প্রশংসনীয়। 'গোয়েন্দার চোখ' শুল্ক গোয়েন্দার কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি। সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং দেশে ন্যায়ভিত্তিক প্রতিযোগী ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টিতে এই দপ্তর অবদান রাখছে। এর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে নন্দিত হয়েছে।

শুল্ক গোয়েন্দা ও অন্যান্য দপ্তরের শুল্কসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়ে প্রকাশনাটি একটি উত্তম মাধ্যম। সদাজাগ্রত শুল্ক গোয়েন্দাদের কর্মব্যস্ত মুহূর্তগুলোর ফাঁকে কাগজে-কলমে তাদের অভিজ্ঞতা, আবেগ তুলে ধরতে 'গোয়েন্দার চোখ' একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে।

সার্বিকভাবে, শুল্ক গোয়েন্দার কাজের গতিপ্রকৃতি সকলের সামনে তুলে ধরতে এই প্রকাশনা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

[এম.এ. মান্নান, এমপি]

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

গোয়েন্দা কার্যক্রমের অভূতপূর্ব সাফল্যের পাশাপাশি শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রকাশনা 'গোয়েন্দার চোখ' এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শুল্ক ফাঁকি, বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং, বাণিজ্যিক জালিয়াতি, আন্তঃদেশীয় চোরাচালান, স্বর্ণ, মাদক ও মুদ্রা পাচারের মতো অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিহত করার পাশাপাশি দেশ ও জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে এই দপ্তর। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এই দপ্তর নন্দিত হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে গত ২রা জুন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাম্প্রতিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতার খন্ডচিত্র এ বার্ষিক প্রকাশনায় চিত্রায়িত হয়েছে। 'গোয়েন্দার চোখ' এর এই সংখ্যা আরও তীক্ষ্ণ, শানিত ও ভবিষ্যতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হবে, সেটিই কামনা করছি।

সবশেষে, এই প্রকাশনার দাপ্তরিক উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

[মো. নজিবুর রহমান]

মহাপরিচালক
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

বাণী

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক ফলপ্রসু কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় 'গোয়েন্দার চোখ' ২০১৬ এর প্রকাশনা উপলক্ষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

রাজস্ব সংরক্ষণ, চোরাচালান রোধ, সামাজিক সুরক্ষা, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং পারস্পরিক বাণিজ্য বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রসমূহে কৌশলগত অবস্থান সংহত করতে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন কাস্টমস অপরাধসমূহ প্রতিহত করে বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতীয় অর্থনৈতিক সুরক্ষায় অবদান রাখছেন। এই অধিদপ্তরের চোরাচালানরোধী দৃশ্যমান অভিযান পরিচালনায় অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায়ও অত্যন্ত কার্যকর ভুমিকা পালন করছে। বিশেষ করে এই দপ্তরের কার্যক্রম জঙ্গি অর্থায়নের উৎসসমূহ সংকুচিত করতে সহায়ক।

পেশাদারিত্ব, ক্ষিপ্রতা ও চৌকস বৃত্তিতে নিজেদেরকে অগ্রবর্তী রেখে এবং কাস্টমস সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতে এই অধিদপ্তর অঙ্গীকারবদ্ধ। এই পথচলায় সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করছি।

একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে এই দপ্তর বিগত বছরে যে সকল সাফল্য অর্জন এবং একইসাথে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তা এই প্রকাশনায় উঠে এসেছে। আশা করি, এই প্রকাশনাটি সবার কাছে নন্দিত হবে। উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্ত। এটি ভবিষ্যতে গবেষণার জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

[ড. মইনুল খান]

সম্পাদকীয়

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আবারও প্রকাশ হয়েছে ‘গোয়েন্দার চোখ’। গোয়েন্দারা নানা প্রতিকূলতার মাঝেও অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যাপারে সদা তৎপর। সারা বছরের চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা বিনিময়, চিন্তার প্রতিফলন ও সৃজনশীলতা তুলে ধরা সহ এই অধিদপ্তরের ঘূর্ণায়মান চাকাকে বেগমান করতে এই প্রকাশনার আয়োজন।

তিন বছরে পা দেয়া ‘গোয়েন্দার চোখ’-কে এবার কিছুটা ভিন্ন মাত্রায় সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি মূলত একটি ব্যতিক্রমধর্মী গোয়েন্দা প্রতিবেদন। এর মূল লক্ষ্য হলো বছরব্যাপী পরিচালিত গোয়েন্দা কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা এবং বিগত বছরগুলোর অর্জনের সাথে তুলনামূলক আত্মবিশ্লেষণ। এই বাৎসরিক প্রতিবেদনে রয়েছে অধিদপ্তরের কর্মতৎপরতা, সাফল্য ও কৌশলগত রেখাচিত্র।

সৃষ্টিশীল এই প্রকাশনা সম্পন্ন করতে লেখা ও ছবি বাছাই এবং প্রকাশনার সার্বিক ডিজাইনের বিষয়ে গঠিত কমিটি এবং লেখা সংগ্রহ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি সমূহের নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই। গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম যাদের লেখায় ফুটে উঠেছে, তাদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গোয়েন্দাধর্মী লেখার পাশাপাশি যাদের ভিন্নধর্মী কিছু প্রবন্ধ এই 'গোয়েন্দার চোখ'-কে করেছে সমৃদ্ধ, তাদের প্রতিও রইলো অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। প্রকাশনাটি কতটুকু সফল বা ব্যর্থ হয়েছে, তা জানতে পাঠকদের গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের কাম্য। দৈনন্দিন শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও প্রকাশিত আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল এই প্রকাশনায় থাকা মুদ্রণ প্রমাদসহ সকল ভুলের দায়ভার আমাদেরই।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে শুল্ক গোয়েন্দা এগিয়ে চলছে আগামীর পথে। 'নিরাপদ বাণিজ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' গড়তে এই অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রকাশনাটি পাঠক নন্দিত হলে আমাদের প্রয়াস সফল হয়েছে বলে ধরে নেবো। বছর ঘুরে আবারো প্রকাশিত হবে 'গোয়েন্দার চোখ', এই প্রত্যাশা রইলো।

সবাইকে আবারো আন্তরিক অভিনন্দন।

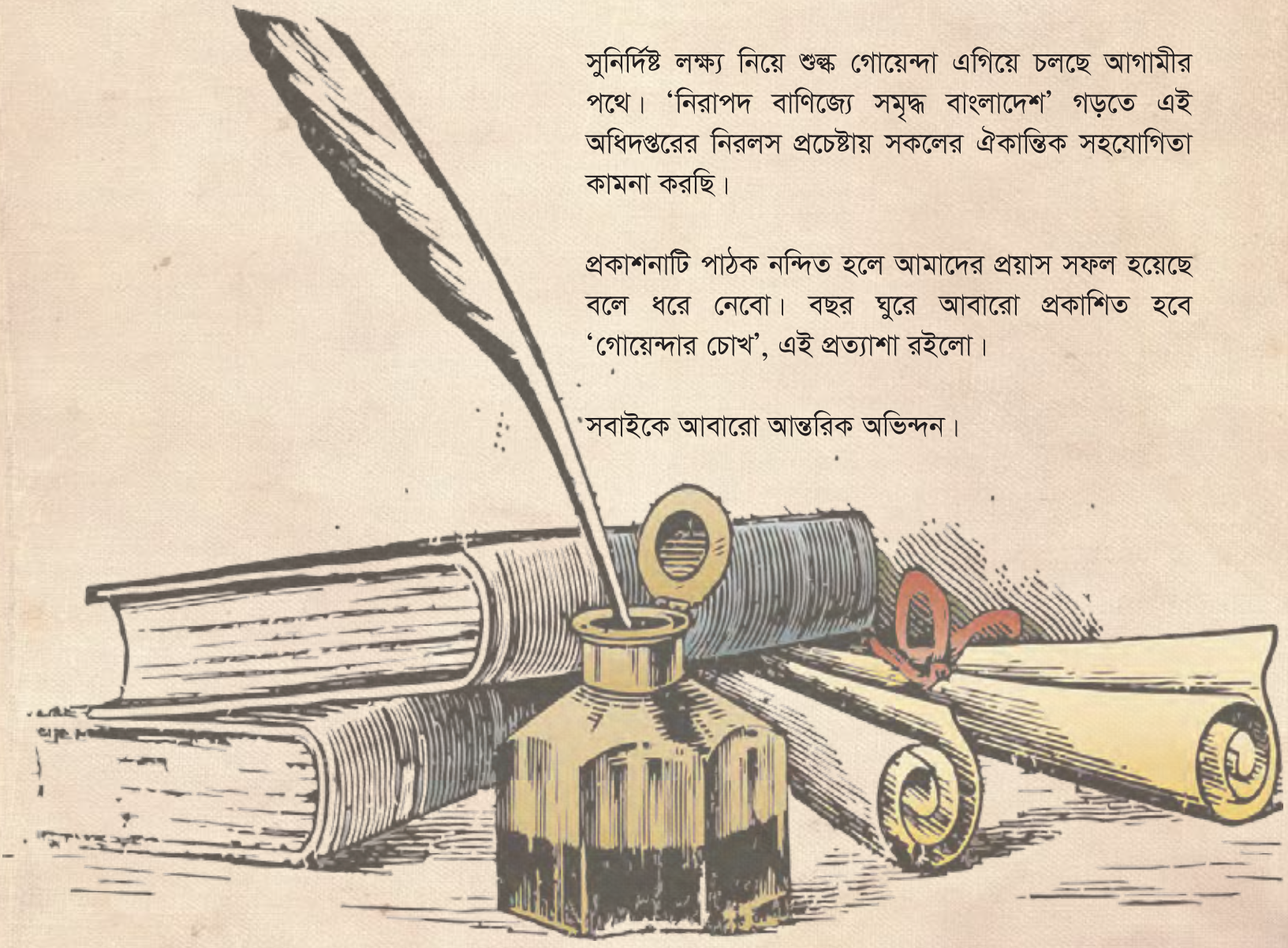

সূচী

গোয়েন্দা কার্যক্রম

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ঃ ভিশন ও মিশন ১৪-১৮

বছরের গোয়েন্দা উপাখ্যান - ড. মইনুল খান ১৯-২৮

লেন্স অব মিডিয়া - ফেরদৌসী মাহবুব ২৯-৪৪

বুলেটিন বোর্ড ৪৫-৬০

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা - ফেরদৌসী মাহবুব ৬১-৬৪

গোয়েন্দা কাহিনি ও প্রবন্ধ

চোরাচালানের সাত কাহন - শেখ হাফিজুল কবির ৬৭-৭০

চোরাচালানী জাহাজ 'এমভি আলবা' জব্দ করণের ইতিহাস - আব্দুল লতিফ সিকদার ৭১-৭৮

অবাক করা গোয়েন্দাগিরি - শাহাবুদ্দীন নাগরী ৭৯-৮৪

The Changing Role of Customs in the 21th Century - Dr. Abdul Mannan Shikder ৮৫-৯০

স্বর্ণ-পিদিম - মোঃ জামাল হোসেন ৯১-৯৮

বাঙ্গালোরে গোয়েন্দা বাঙ্গাল - মোঃ আনোয়ার হোসাইন ৯৯-১০৪

চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধে কাস্টমস - ড.মইনুল খান ১০৫-১১২

কাস্টমস এর নতুন ভূমিকায় অর্থ পাচার প্রতিরোধ - ড. মইনুল খান ১১৩-১২২

Enhancement of Bangladesh customs website: Improving ways to communicate customs Information and promoting Trade Transparency - Khairuzzaman Mozumder ১২৩-১৩৬

"Using A Risk Based, Intelligence- led Approch to Everything We Do.....

-Mohammad Abu Yusuf (Ph.D) and Mark Hamill - USAID BTFA ১৩৭-১৫০

Enforcement of Intellectual property Rights at the Border: Bangladesh Perspective -

Muhammad Mubinul Kabir ১৫১-১৬২

সোনার ডিম পাড়া মাটির মানুষ ও এক তরুণ গোয়েন্দা - মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী ১৬৩-১৭০

Authorized Economic Operator: Certification Process of Selected Asia-Pacific

Countries & Lessons for Bangladesh - Syed Mushfequr Rahman ১৭১-১৭৮

কফিমেকার - অরুণ কুমার বিশ্বাস ১৭৯-১৮৪

Capacity building as a pre-requisite of IPR Enforcement - Novera Moazzem Chowdhury ১৮৫-১৯২

স্মার্ট পেইজ - ফেরদৌসী মাহবুব ১৯৩-১৯৮-

The Prospective side of implementing VGM a customs prospective - Mukitul Hasan ১৯৯-২০৬

...

মাসির্ডিজ তরুণীর খোঁজে - প্রভাত কুমার সিংহ ২০৭-২১৬

আন্ডার কাভার - মো: আল আমিন ২১৭-২২২

গোয়েন্দার ডায়েরি থেকে - মোঃ তারেক মাহমুদ ২২৩-২২৭

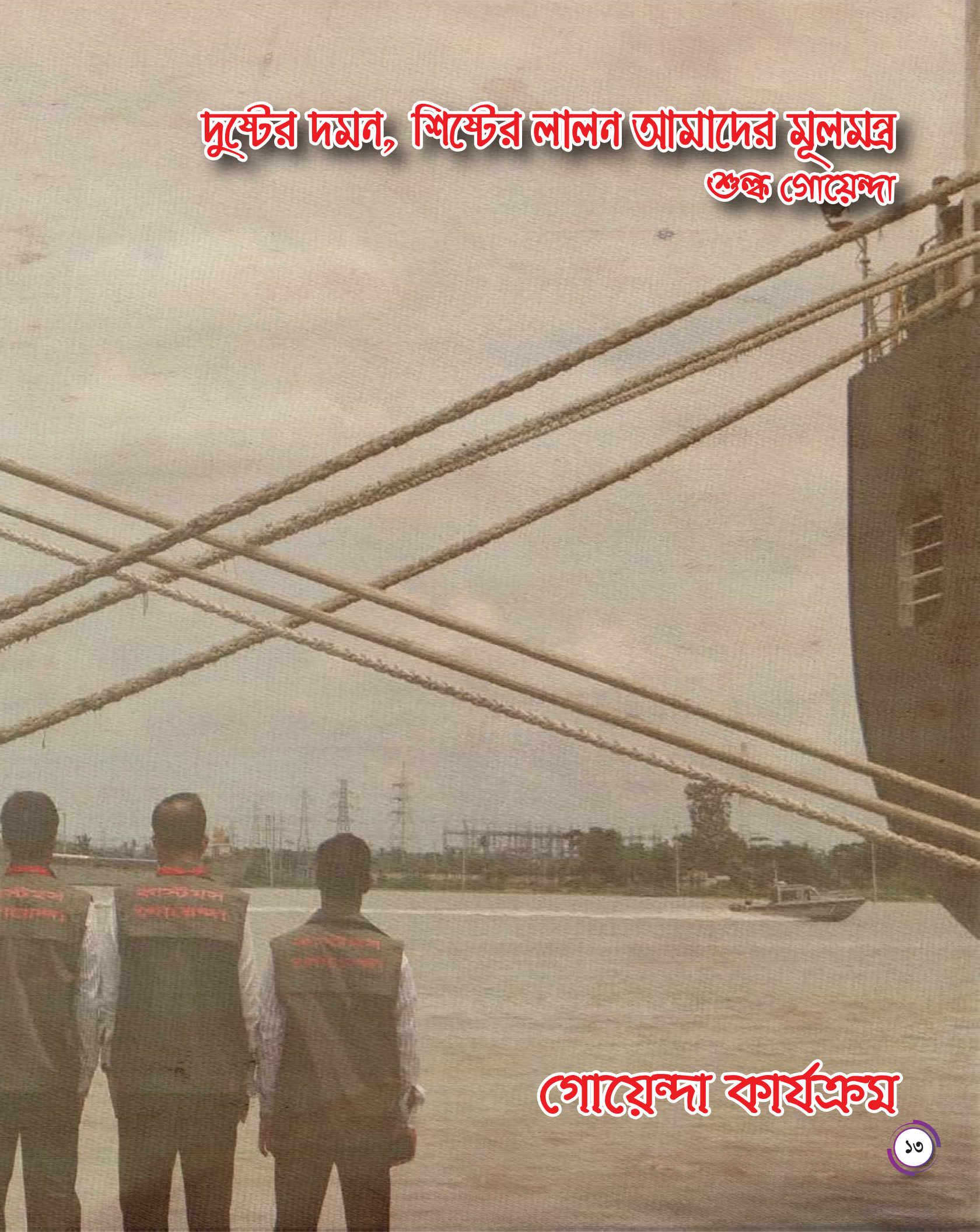

দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন আমাদের মূলমন্ত্র

শুল্ক গোয়েন্দা

গোয়েন্দা কার্যক্রম

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

ভিশন ও মিশন

অর্থনীতি এখন অনেকটাই বাজার অর্থনীতির জটিল বলয়ে ঘূর্ণায়মান। এই বাজার অর্থনীতির চাহিদা-যোগানের মধ্যে বাস্তবসম্মত ভারসাম্য রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা কখনো সীমান্তদ্বার উন্মুক্ত করি, কখনো রুদ্ধ করি। একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সীমান্ত উন্মুক্ত করা হয় অপরদিকে সীমান্ত দিয়ে যেন অনভিপ্রেত পণ্য আমদানি-রপ্তানি না হয় তা রোধ করতে সীমান্ত রুদ্ধ করা হয়। মূলত অভ্যন্তরীণ স্বার্থ সুরক্ষায় প্রণীত আইন ও বিধানাবলীর সাথে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধানাবলীর মেলবন্ধন ঘটিয়ে দক্ষভাবে সতর্কতার সাথে কাজ করে চলছে শুল্ক প্রশাসন। এ কথা বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ শুল্ক প্রশাসন এখন বিশ্ব কাস্টমস অঙ্গনের গর্বিত অংশীদার হিসেবে বাণিজ্য উদারীকরণ এবং অপবাণিজ্যরোধ করতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সক্ষমতার দিক দিয়ে বাংলাদেশ কাস্টমস বর্তমানে অনেক দূর এগিয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন নীতির মাধ্যমে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ইতোমধ্যে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। বাণিজ্য উদারীকরণ ও অপবাণিজ্য রোধে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হিসেবে দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ দ্বারা ক্ষতমাপ্রাপ্ত বিশেষ দপ্তর হিসেবে শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ ও অপতৎপরতা সংকোচনের মাধ্যমে এ দপ্তর অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশিত ও স্বতপ্রণোদিত গোয়েন্দা অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে এ দপ্তরের তৎপরতা লক্ষণীয়। অতি সম্পতি এ দপ্তরের ভিশন, মিশন, স্ট্রাটেজি ও অ্যাকশন প্লানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরো সুসংহত, আধুনিক ও যুগোপযোগী হয়েছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণশীল এর সাথে শেষ হয়েছে অপরাধীর নিত্য নতুন কৌশল। সরাসরি অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি যুক্ত থাকায় সহজ মুনাফায় লোভ এক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতাকে উস্কে দেয় এবং অপরাধীদের ঝুঁকি নিতে প্রলুব্ধ করে। এতে করে বিবর্তনশীল ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সাথে অপরাধের মাত্রা ও প্রবণতার বিবর্তন ঘটে। আর এজন্য এখন শুধুই ইনফরমেশনের উপর নির্ভর করার সুযোগ নেই। ডাটা অ্যানালাইসিস, রিস্ক অ্যানালাইসিস, রিস্ক প্রোফাইলিং ইত্যাদির মাধ্যমে ইনফরমেশনকে ইন্টেলিজেন্সে রূপান্তর এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ যা একদিকে পরিশ্রম ও সময় অপচয় হ্রাস করে অপরদিকে, কার্যকর ফলাফল প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। এতে করে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ বজায় রেখেই গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়।

ব্যাপারটা অনেকটাই সুডোকুর ধাঁধা মেলানোর মতো। বাণিজ্য উদারীকরণের স্বার্থে এ ধাঁধা মেলানোর পরিশ্রমটুকু করা শুল্ক গোয়েন্দার অন্যতম কাজ। কারণ, ইনফরমেশন যতক্ষণ ইন্টেলিজেন্সে রূপান্তরিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল ইনফরমেশনের উপর নির্ভর করে মাঠে নামলে একজন অপরাধীকে শনাক্ত করতে গিয়ে অসংখ্য নিরপরাধীকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এতে ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে স্বাভাবিক ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশ কাস্টমসের মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো। একই সাথে শুল্ক ফাঁকি ও চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও স্থানীয় বাজারের স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারীদের নিবৃত্ত করে প্রচলিত শুল্ক আইনের আওতায় ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধ্য করাও শুল্ক গোয়েন্দার অন্যতম দায়িত্ব। বাণিজ্য উদারীকরণকে যথাসম্ভব নিশ্চিত এবং স্থিতিশীল ব্যবসার পরিবেশ বজায় রাখতে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর অত্যন্ত সচেষ্ট। আর তা করতে, ইনফরমেশনকে ইন্টিলিজেন্সে রূপান্তরকরণ প্রথম শর্ত। এরপর ইন্টেলিজেন্সকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় পরবর্তী তদন্ত।

কেবল শুল্ক ফাঁকি প্রতিরোধই নয়, স্বর্ণ, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যসহ যেকোন প্রকারের চোরাচালান প্রতিরোধে অব্যাহত গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। দেশের অভ্যন্তরীণ গণ্ডি পেরিয়ে এ তৎপরতা এখন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ব্যাপৃত হয়েছে। ন্যাশনাল কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট হিসেবে গোপনীয় তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ এ দপ্তর অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করে বাংলাদেশ কাস্টমসের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনের গুরুভার দক্ষতার সাথে বহন করে চলছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে কাস্টমস সংক্রান্ত অনিয়ম ও শুল্ক আইন বর্হিভূত কর্মকাণ্ডের প্রতি সুতীক্ষ্ণ গোয়েন্দা দৃষ্টি রাখা এবং তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মূল ভিশন।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম

১। চোরাচালান এবং শুল্ক সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধ ও জালিয়াতি প্রতিরোধ; শুল্ক সংক্রান্ত আইন অমান্যের কারণে পণ্য আটক, বাণিজ্যিক জালিয়াতি, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অর্থপাচার এবং শুল্ক আইনের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তদন্তকাজ পরিচালনা;

২। মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য, জালমুদ্রা, মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত পণ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ, জীববৈচিত্র সম্পন্ন বন্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি, মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর পণ্য, অস্ত্র, বিস্ফোরকদ্রব্য পাচার রোধ; এবং চোরাচালান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রোফাইলিং; তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করা;

৩। বাণিজ্য শিল্প সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ; অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে বিভিন্ন শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশন বা কোন শুল্ক এলাকায় সংঘটিত অপরাধ ও বিচ্যুতি সংক্রান্ত গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

এই কার্যক্রমসমূহ নিম্নবর্ণিত আইনের আওতায় সম্পন্ন করা হয়

- ❑ দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯;
- ❑ অ্যালাইড অ্যাক্টস;
  - ❖ আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮;
  - ❖ এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স অ্যাক্ট, ১৯০৮;
  - ❖ আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) অ্যাক্ট, ১৯৫০;
  - ❖ ক্রিমিনাল আইন (সংশোধিত) ১৯৫৮;
  - ❖ Agricultural Produce Cess Act, 1940
  - ❖ Foreign Exchange Regulation Act, 1947;
  - ❖ Wild Life Crime Prevention Act, 2012;
  - ❖ Prevention of Money Laundering Act, 2012;

এই দপ্তরের ভিশনকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োসে শুল্ক সংক্রান্ত অনিয়ম ও শুল্ক আইন বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রতি সুতীক্ষ্ণ গোয়েন্দা দৃষ্টি রাখা এবং তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মূল ভিশন।

আর এই ভিশনকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ দপ্তরের মিশন নিম্নরূপ

- ❑ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায়ে অন্যান্য ফাংশনাল দপ্তরকে সহায়তা প্রদান করা;
- ❑ শুল্ক অপরাধ ও অন্যান্য অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধ ও অপরাধীদের শনাক্ত এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা;
- ❑ চোরাচালানসহ জনস্বার্থে ও জননৈতিকতা বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ করা;
- ❑ জাতীয় নিরাপত্তা (বিধ্বংসী অস্ত্র, গোলাবারুদ, পারমাণবিক বর্জ্য ইত্যাদি আমদানি প্রতিরোধ), সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি কোনো পণ্য আমাদানি প্রতিরোধ নিশ্চিত করা।

MAERSK
OOCL
MAERSK
P&O Nedlloyd

বছরের গোয়েন্দা উপাখ্যান

-ড. মইনুল খান

শুল্ক গোয়েন্দা দীপ্ত ও ক্ষিপ্র কাজের ধারাবাহিকতার আরেকটি বছর অতিক্রম করলো। কাজের মান ও ব্যাপকতায় ছিলো বৈচিত্র। নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়েছে এর ঝুড়িতে। নতুন ক্ষেত্রে যাত্রা ও অগ্রগতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। কর্মকর্তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাও ছিলো অটুট। ঘটনাকেন্দ্রিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অর্জিত হয়েছে লক্ষ্য।

বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সেমিনার। 'চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মোঃ ফরিদ উদ্দীন, এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট আবদুল মাতলুব আহামাদ, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অবঃ) আবদুর রশীদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মোঃ নজিবুর রহমান। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শুল্ক গোয়েন্দার মহাপরিচালক ড. মইনুল খান। সেমিনারটি ব্যাপকভাবে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অনুবিভাগে এই জাতীয় একাডেমিক সেমিনার সাম্প্রতিকালে প্রথম। শুল্ক গোয়েন্দার জন্য এই সেমিনার নতুন মাত্রা।

শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক এই সেমিনারটি তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমত,** গত তিন বছর শুল্ক গোয়েন্দা অব্যাহতভাবে দৃশ্যমান কাজের স্বাক্ষর রেখেছে। স্বর্ণ, মুদ্রা, মাদকসহ নানা অবৈধ পণ্য আটক ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে তৎপর থেকেছে। বড় বড় চালান আটকের মধ্য দিয়ে মিডিয়ার শিরোনাম হয়েছে। শুল্ক বিভাগের অস্তিত্ব ও এর অবদান স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বের লুকিয়ে থাকা বিভাগটি সামনে এসেছে ইতিবাচক ভূমিকায়। জনগণের নানা ধারণা ও সমালোচনাকে বিচেনায় নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। সরকারের কোষাগারে রাজস্ব আদায়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তেমনি চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের নানামুখী স্বার্থ রক্ষায় ভুমিকা পালন করেছে। সেমিনারটি আয়োজনের ফলে এসব ইতিবাচক কর্মকান্ড সংহত ও মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, এটি বলা যায়। সেমিনার সম্পর্কে মিডিয়া কভারেজ এটি নির্দেশ করে। ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রধান খবরের মধ্য দিয়ে এটি ছড়িয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** শুল্ক গোয়েন্দার সাম্প্রতিক কার্যক্রম নিছক কোন ঘটনা নয়, এর একটি বৃহৎ দর্শন আছে তা সেমিনারে আলোচিত হয়েছে। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন আটক ও গ্রেফতার বলে শুল্ক গোয়েন্দার কাজকে ব্যাখ্যা করার অবকাশ সীমিত। এর

যে তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে এর পেছনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে তার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দার মতো একটি সরকারী বিভাগের কাজের পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা থাকতে পারে তা সম্ভবত প্রথম পথ দেখিয়েছে এই সেমিনারটি। এটি অন্যান্য সরকারী বিভাগের জন্যও দৃষ্টান্ত হতে পারে। **তৃতীয়ত,** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেমিনারে আলোচনায় উঠে এসেছে শুল্ক ও শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের অবদান, যা ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। মাননীয় মন্ত্রী ও আলোচকবৃন্দ সকলে নিরাপত্তার সাথে চোরাচালান প্রতিরোধের বিষয়টিকে এক করে দেখেছেন। বিভিন্ন গবেষণায় জঙ্গিবাদ ও অপরাধের সাথে চোরাচালানের গভীর সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। দেশের অপ্রচলিত নিরাপত্তা রক্ষায় চোরাচলান প্রতিরোধ অগ্রাধিকারযোগ্য। বিষয়টি বারবার বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম এই সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনায় বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে। নিরাপত্তার প্রতি হুমকি যে কোন ইস্যু জাতীয় প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুল্ক গোয়েন্দা যে কাজটি করছে তা এখন জাতীয় অগ্রাধিকার। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় শুল্ক গোয়েন্দা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, এটি সম্মানের ও গৌরবের।

শুল্ক গোয়েন্দার নতুন দিগন্ত অর্থ পাচার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখা। সম্প্রতি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সংশোধনীতে 'সম্পৃক্ত অপরাধ' তদন্ত করার ক্ষেত্রে কাস্টমসকেও আইনী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এই ক্ষমতা দেয়া হলেও শুল্ক কর্তৃপক্ষের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল কারণ হলো, গবেষণায় উঠে এসেছে অর্থ পাচারের প্রায় ৮০% সংঘটিত হয় বাণিজ্যের মাধ্যমে। বাণিজ্যভিত্তিক অর্থ পাচারের ক্ষেত্রসমূহ সংকুচিত করতে কাস্টমস জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই অর্থ পাচার প্রতিরোধ নতুনভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানসিয়াল ইন্ট্রিগ্রিটি (জিএফআই)-র সর্বশেষ রিপোর্টে বলছে, বাংলাদেশ থেকে ২০১৪ সালে প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। গত দশ বছরে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। টাকার অংকে এই হিসেব অনেক। পদ্মা সেতুতে মোট খরচ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। এক বছরে যে অর্থ পাচার হয়েছে তা দিয়ে তিনটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। যদিও জিএফআই এর পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্ক আছে কিন্তু এটি অর্থ পাচারে নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। অর্থ পাচার জঙ্গি অর্থায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী বিষয়টিতে স্পর্শকাতরতা বেড়েছে। ফিন্যানসিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ) ও এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং

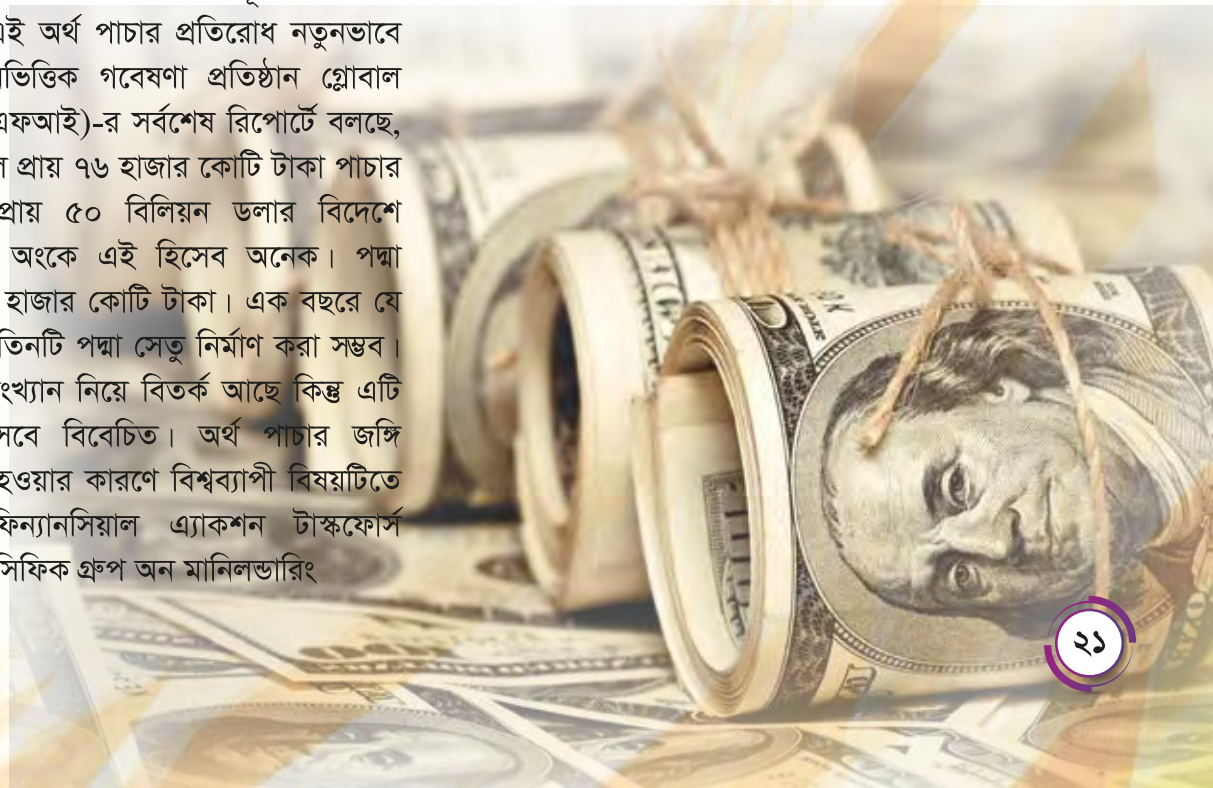

(এপিজিএমএল) অর্থ পাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছে। এপিজিএমএল সময়ে সময়ে বাংলাদেশকে কালো, ধূসর বা সাদা তালিকাভূক্ত করার জন্য মুল্যায়ন করে। বর্তমানে চলমান এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়নে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যৌথভাবে কাজ করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে শুল্ক গোয়েন্দার মহাপরিচালককে প্রধান করে গঠিত টিম কাজ করছে। চোরাচালান, কর ফাঁকি, মাদক দ্রব্য পাচার, আন্তসীমান্ত অপঘোষণাসহ নানা অপরাধ হতে উৎসারিত অর্থ পাচার প্রতিরোধে কাস্টমসের সক্ষমতা ও আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় এতে। পাশাপাশি নতুন ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। চার ব্যাচে প্রায় ১৯৭ জন কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিআইডি, প্রসিকিউটরসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগন এই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। অন্যদিকে, বর্তমান কাস্টমস আইনে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকায় তা সংশোধনের জন্যও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দা থেকে একটি বিশেষ প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিবেচনা করে তা আইন আকারে পাশ হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে সম্পৃক্ত অপরাধের সংশ্লিষ্ট আইনে তদন্ত করার ক্ষমতা থাকতে হবে। শুল্ক আইনে তদন্ত করার ক্ষমতা এতোদিন অনুপস্থিত ছিলো। অর্থ আইন ২০১৬ এ দি কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর ধারা ১৫৬(৫) এ শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক শুল্ক আইনে যে কোন অপরাধ তদন্ত করার ক্ষমতা অন্তর্ভূক্ত করায় মানি লন্ডারিং আইনেও এই তদন্ত করার ক্ষমতা স্পষ্ট হলো। শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও সুপারিশের আলোকেই এই সংযোজন করা হয়েছে।

একইসাথে, চোরাচালান প্রতিরোধের ন্যায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি অর্থ পাচারের মামলা প্রস্তুত করা হয়েছে। ঢাকার মিরপুরের একটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৯৭টি কন্টেইনার বিদেশে রপ্তানি করেছে। কিন্তু এর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা আসার কথা থাকলেও তা আসেনি। কারণ ব্যাংকের ইএক্সপিসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি যাচাই করে দেখা গেছে এগুলো জাল। ফলে প্রায় ১০০ কোটি টাকা দেশে আসার কথা থাকলেও তা আসেনি। এ ব্যাপারে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার তদন্ত করবে শুল্ক গোয়েন্দা। বর্তমানে তদন্ত চলছে। দেশে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সংশোধনী আনার পর এটি প্রথম মামলা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেরও প্রথম অভিজ্ঞতা। এ সংক্রান্ত আরো কতগুলো অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অনুসন্ধানশেষে অনুরুপভাবে মামলা দায়ের ও তদন্ত হবে। অচিরেই বাণিজ্যভিত্তিক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে দৃশ্যমান ফল দেখা যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা চুরি ও পানামা পেপারস কেলেঙ্কারি প্রকাশের পর এ জাতীয় উদ্যোগ সময়ের দাবি। আশা করা যায়, শুল্ক গোয়েন্দা এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে।

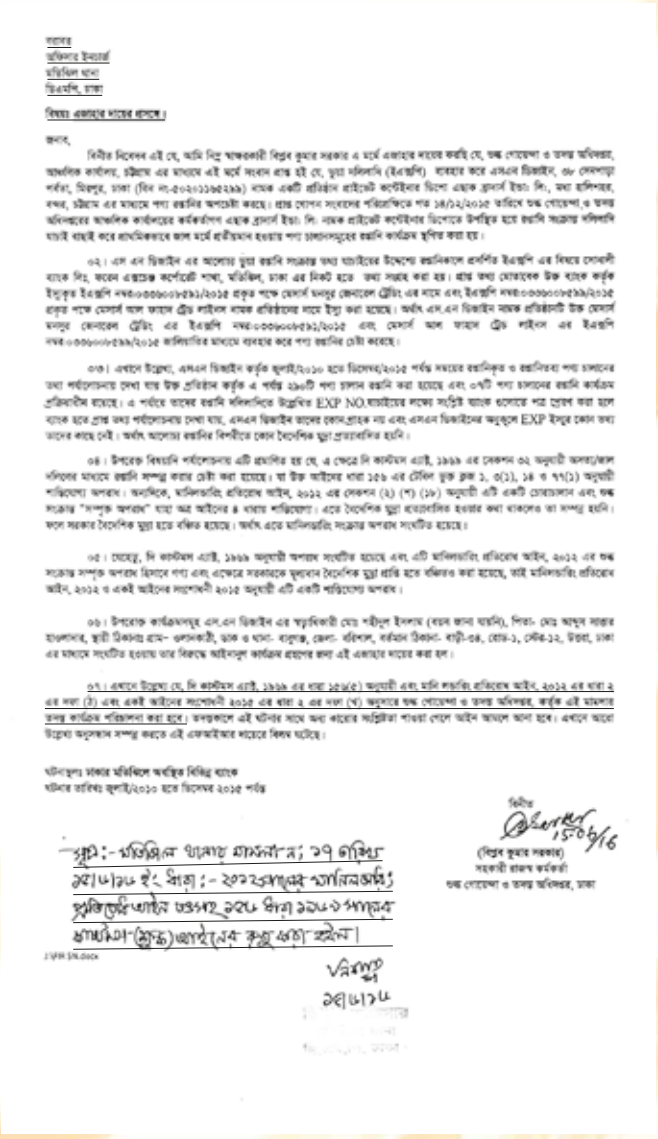

বছরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ছিলো চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই কর্মকান্ড দৃশ্যমান হয়েছে। বিশেষ করে বিলাসবহুল গাড়ি আটকে শুল্ক গোয়েন্দার অভিযান ছিলো নজরকাড়া। শুল্ক গোয়েন্দার নিজস্ব মূল্যায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে বেশ কিছু বিলাসবহুল গাড়িতে শুল্ক ফাঁকি সংঘটিত

হয়েছে এবং এতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব জড়িত। অন্যদিকে, গাড়ি আমদানি ও ব্যবসায় অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দার হিসেবে তিন ধরণের বিলাসবহুল গাড়ি তাদের অভিযানের লক্ষ্যবস্তু। **প্রথমত,** এক শ্রেণীর বিদেশী প্রবাসী কারনেট ডি প্যাসেজ সুবিধার আওতায় বিনা শুল্কে গাড়ি এনেছেন। শর্ত ছিলো নির্দিষ্ট সময় পর এগুলো ফেরত নিয়ে যাবেন। কিন্তু সময় পার হওয়ার পরও এসব গাড়ি ফেরত যায়নি। অর্থের বিনিময়ে এই দেশে বিক্রি করে চলে গেছে। এসব গাড়ি সাধারণত ২০০৯-২০১২ সময়ে এসেছিল। অধিকাংশই অত্যন্ত নামীদামী ব্র্যান্ডের। বেশকিছু গাড়ি ইতোমধ্যে আটক করা হয়েছে। আরও গাড়ি ধরার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব গাড়ির সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। অনুমান শতাধিক গাড়ি এখনো রাস্তায় চলছে এবং তা আটকযোগ্য। **দ্বিতীয়ত,** বিভিন্ন শুল্ক বন্দর দিয়ে নানা মিথ্যা ঘোষণায় আনা ও ছাড়কৃত গাড়ি এই অভিযানের অন্যতম ক্ষেত্র । অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিলাসবহুল গাড়িতে সিসি কম দেখিয়ে কম শুল্ক পরিশোধ করা হয়েছে। উচ্চ সিসিতে বেশি শুল্ক দিতে হয়। যেমন-৪০০০ সিসির উপরে গাড়িতে প্রায় ৮৩৩% শুল্ক, অন্যদিকে ১৫০০ সিসির নিচে প্রায় ১৪০%। শুল্কের এই ব্যাপক তারতম্যের কারণে কেউ কেউ ফাঁকির উদ্দেশ্যে এই জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। ইতোমধ্যে এই অভিযোগে সংশ্লিষ্ট অনেক গাড়ি ধরা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিশ্বখ্যাত অডিআর৮ মডেলের বিলাশবহুল রেসিং কার আটক। ঢাকার একটি গ্যারেজ থেকে এই গাড়িটি আটক করা হয়। প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে, মংলা বন্দর দিয়ে এই গাড়িটি অডিটিটি নামে খালাস হয়েছে এবং শুল্ক দেয়া হয়েছে প্রায় ১.৭৫ কোটি টাকা। গাড়িটিতে সিসি দেখানো হয়েছে ২৫০০ সিসি। অথচ প্রকৃত অর্থে গাড়িটি হলো ৫২০০ সিসির অডিআর৮। সেই হিসেবে শুল্ক প্রযোজ্য প্রায় ১৭ কোটি টাকা। এতে প্রায় ১৫ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়েছে একটি গাড়িতে। এত বড় জালিয়াতির কারণে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে দায়দায়িত্ব নিরূপন করার জন্য। **তৃতীয়ত,** কতিপয় ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধাভোগী হিসেবে আমদানিকৃত গাড়িতে শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যেমন কূটনৈতিক, এমপি, ইপিজেডে বিদেশী বিনিয়োগকারী। এসব ব্যক্তিদের এই সুবিধা দেয়া হয় শর্তসাপেক্ষে। কোন কারণে শর্ত ভঙ্গ হলে এই সুবিধা প্রত্যাহারযোগ্য। প্রযোজ্য শর্ত ভঙ্গ হয়েছে এমন গাড়ির সংখ্যাও কম নয়। এসব গাড়িও আটকযোগ্য। শুল্ক গোয়েন্দার অভিযানে এসব গাড়িও লক্ষ্যবস্তু।

একটি বিদেশী বেসরকারী বিমান সংস্থার স্থানীয় এজেন্ট কর্তৃক আনীত ৪টি বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ সাম্প্রতিক অভিযানে উল্লেখযোগ্য দিক। এই এজেন্ট রোলস রয়েস, মার্সিডিজ, রেঞ্জ রোভার ও ল্যান্ড রোভার নামীয় বিশ্বখ্যাত গাড়ি বিনা শুল্কে আমদানি করে। তদন্তে দেখা যায়, মিথ্যা তথ্য দিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে এই সুবিধা নেওয়া হয়েছে। বিদেশের সাথে সিভিল এভিয়েশন সংক্রান্ত কোন চুক্তি না হওয়া সত্ত্বেও ঐ চুক্তির বরাত দিয়ে এই আবেদন করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত এই এজেন্ট মূলত এসব বিলাসবহুল গাড়ি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই এনেছেন। তদন্তে আরো বের হয় যে, দুদেশের মধ্যে এয়ার সার্ভিসেস এগ্রিমেন্ট সমঝোতা থাকলেও তা কেবল সুভ্যেরি, পোশাক, ফ্লাইট ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত পণ্যের কথ বলা হয়েছে। গাড়ী

এই তালিকায় নেই। এর সূত্র ধরে গাড়ী চারটি জব্দ করা হয়। বর্তমানে বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলো নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কেবল রোলস রয়েস গাড়ীর শুল্ক ফাঁকি হয়েছে ২২ কোটি টাকা। এই চারটি গাড়ীর সাথে মোট শুল্ক জড়িত প্রায় ৩৪ কোটি টাকা।

অবৈধভাবে আমাদনিকৃত সিগারেট দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়িক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সাম্প্রতিক এসব সিগারেট আটক শুল্ক গোয়েন্দার অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচ্য। দেশের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ হয় এই খাত থেকে। বিদেশী সিগারেট অবৈধভাবে চোরাচালান হলে দেশের এসব সিগারেটশিল্প চাপের মধ্যে পড়ে। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। অন্যদিকে, বিদেশ থেকে যে সব সিগারেট চোরাচালান হয় তা অনেক ক্ষেত্রে বৈধ বাজার থেকে আসে না। এতে কোন কোন সিগারেট চালান যাচাই করে দেখা গেছে এগুলো নকল এবং মেয়াদোত্তীর্ণ। বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, এসব সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অবৈধভাবে আনা বিদেশী সিগারেট যেমন দেশের রাজস্ব হানি ও দেশের ব্যবসার পরিবেশ ক্ষতি করছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটাচ্ছে। এই অধিদপ্তর এসব সিগারেট অবৈধভাবে আমদানিতে কঠোর মনোভাব পোষণ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার ভর্তি সিগারেট আটক সবচেয়ে বড় চালান। এটি একটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের নামে আমদানি করা হয়েছিল। শুল্ক গোয়েন্দার হস্তক্ষেপে এটি ধরা পড়ে। অন্যদিকে, ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবিরতভাবে অবৈধভাবে আনীত বিদেশী সিগারেট আটকের ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বড় চালান আটক হয়েছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এয়ারফ্রেইট ইউনিটে প্রায় ২৮৮০ কার্টুন। বিভিন্ন ব্রান্ডের প্রায় ৫৭৬০০০ শলাকা। গত বছর সবচেয়ে বেশী ইজি স্পেশাল ও মাউন্ট ষ্ট্রবেরী ব্রান্ডের সিগারেট আটক হয়েছে।

এর দ্বারা চোরাচালানিদের ঝুঁকি বেড়ে গেছে। ধারণা করা যাচ্ছে, স্থানীয় বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। আগে যে মূল্যে বিদেশী সিগারেট পাওয়া যেতো, তা এখন আরো বেড়েছে। এসব এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারলে সিগারেট চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

অন্যদিকে, স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধ এই দপ্তরের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গত তিন বছরে এই দপ্তর একের পর এক স্বর্ণ চোরাচালানে বড় বড় সাফল্য দেখিয়েছে। বিশেষ করে ২৬ এপ্রিল ২০১৪ এ শাহজালালে বিমানের কুঠরি থেকে ১০৫ কেজি, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এ ৬২ কেজি, এয়ারফ্রেইট ইউনিটে ৪৩ কেজি স্বর্ণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পল্টনে ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ এ একটি বাড়িতে তল্লাশি করে ৬১ কেজি স্বর্ণ ও পাঁচ বস্তা দেশি ও বিদেশী মুদ্রা আটক এবং হাতে-নাতে একজনকে গ্রেফতার ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এসকল চোরাচালানের দায়ে কেবল বহনকারীরাই আটক হচ্ছে না, কোন কোন ক্ষেত্রে চিহ্নিত চোরাচালানীরাও আইনের আওতায় এসেছে। এদের কেউ বর্তমানে জেলে আছে, কেউ জামিনে আছে, কেউবা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ফলে নেটওয়ার্ক হয় ভেঙ্গে গেছে নতুবা দুর্বল হয়েছে। এর প্রতিফলন দেখা যায় গত বছরের প্রতিরোধ কর্মকান্ডে। অভিযান পরিচালনা হয়েছে আগের বছরের তুলনায় বেশি, কিন্তু আটক হয়েছে কম। যেমন, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১২১.৬৮১ কেজি স্বর্ণ আটক হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ২১ জন। আগের বছরে স্বর্ণ আটক হয়েছে ৩৬৩ কেজি এবং গ্রেফতার হয়েছে ৫০ জন। এতে বুঝা যায়, অতীতের চেয়ে স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, এই বছরে কৌশলে অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেটের ভেতর বিশেষ কৌশলে স্বর্ণ আনার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। কোন কোন যাত্রীকে জুস ও দুধ খাইয়ে সুস্থ্য করতে হয়েছে। পেট কেটে স্বর্ণ বের করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়। টয়লেটে বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রহরায় বাহকদের রেক্টামে লুকিয়ে রাখা স্বর্ণ বের করে আনার শুল্ক গোয়েন্দার কৌশলটা অত্যন্ত নন্দিত কাজ। অন্যদিকে, ডিটারজেন্ট পাউডার আকারে আনা স্বর্ণ গুড়াও আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিতে এই ধরণের কৌশল অবলম্বণ করলেও তা ধৃত হয়। এছাড়া, রয়েছে বিভিন্ন পার্টস, শরীর, ব্যাগ, জুতা ও মোজার ভেতরে লুকিয়ে আনার নানা কৌশল প্রয়োগ। এর দ্বারা একটি বিষয় অনুমিত হয়, বড় আকারে স্বর্ণ পাচারে নজরদারির ফলে এসব ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক গোয়েন্দারা তাদের পরাস্ত করেছে।

একইসাথে, মুদ্রা পাচার রোধে আছে দৃশ্যমান সাফল্য। গত বছর ১২ টি ঘটনায় প্রায় ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা আটক করা হয়েছে। এতে গ্রেফতার করা হয়েছে ১২ জনকে। বৈদেশিক মুদ্রা পাচার যেমন চোরাচালান, অন্যদিকে মানি লন্ডারিং। এই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যও ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনেও এটি অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য। গত বছরের আটক মুদ্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ০৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে কন্টেইনারের ভেতর ভারতীয় নকল মুদ্রা। চালানটি দুবাই থেকে আনা হয়েছে ইউব্যাগেজে। কিন্তু শুল্ক গোয়েন্দার সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সমুদ্র বন্দরে প্রথম এই ভারতীয় মুদ্রার চালান আটক হলো। আটক মুদ্রা বাংলাদেশী মুদ্রার ২.৭১ কোটি টাকা। এসংক্রান্ত ০৬ জনকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়। এছাড়া, গত ১০ জুন ২০১৬ তারিখে শাহজালালে পাকিস্তান থেকে আগত এক যাত্রীর কাছ থেকে ১.৫৬ কোটি টাকার সমমূল্যের ভারতীয় মুদ্রা আটক হয়েছে। করাচি থেকে দুবাই হয়ে যাত্রী ঢাকায় অবতরণ করলে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক ধৃত হন। আগে থেকেই গোপন সংবাদ থাকায় তাকে প্লেন থেকে অনুসরন এবং তার ব্যাগে লুকায়িত অবস্থায় এই মুদ্রাগুলো উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে, এসব মুদ্রা জাল বলে ধারণা করা হয়। এতে যাত্রীসহ আরেক জনকে গ্রেফতার করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। বর্তমানে মামলাটি পুলিশ কর্তৃক তদন্ত চলছে। সার্বিকভাবে, মুদ্রা পাচারের ক্ষেত্রে শুল্ক গোয়েন্দার এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ঘঠনাবহুল।

শুল্ক গোয়েন্দার বন্ড ফাঁকি রোধে কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলেও এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। বন্ড অপব্যবহারকারীরা রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে কাঁচামাল আমদানি করে তা খোলাবাজারে বিক্রি করে দেয়। তাদের বন্ড লাইসেন্স দেয়া হয় বিনা শুল্কে পণ্য এনে রপ্তানি করার জন্য। কিন্তু রপ্তানি না করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করলে সরকার যেমন রাজস্ব হারায় তেমনি স্থানীয় শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে এক শ্রেনীর ব্যবসায়ির অবৈধ আয় উন্মুক্ত হয়। যাদের বন্ড লাইসেন্স নেই এবং শুল্ক করাদি দিয়ে আমদানি করেন তারা প্রতিযোগিহীন হয়ে পড়ে। বন্ড লাইসেন্স সুবিধা প্রদানের যুক্তিগ্রাহ্যতা এতে দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা অর্জনকে সামনে রেখে এই সুবিধার প্রচলন করা হয়েছিল। ১৯৯০ এর দশকে এই সুবিধা দেয়া হয়। এতে যেমন রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানার প্রসার ঘটেছে, তেমনি আবার অপব্যবহারও বেড়েছে। তাই এই অপব্যবহার রোধে এই অধিদপ্তর

গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। সারাদেশে এই অধিদপ্তর তিন ভাগে কাজ করেছে। **প্রথমত,** আমদানিস্থলে যাচাই-বাছাই করে কোন অনিয়ম পেলে আইএম ৭ এ আনীত মালামাল আটকে দিয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা অঞ্চলের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৭০ টি কন্টেইনার আটক করে প্রায় ৩০৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। আমদানি প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ঐ প্রতিষ্ঠানটি এই পণ্য আমদানি করায় এ সংশ্লিষ্ট মামলা দায়ের করা এবং রাজস্ব আদায় করা হয়। **দ্বিতীয়ত,** কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের আলোকে বন্ডের কারখানা পরিদর্শন করে স্টক ও কাগজ-পত্রাদি যাচাই করে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানের। এতে দেখা যায়, শত শত টন মালামাল আমদানি করা হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মেশিন নেই, থাকলেও চলে না, কারখানায় যে মালামাল থাকার কথা তা নেই। খোলা বাজারে বিক্রিই তাদের উদ্দেশ্য। এককালীন ও বার্ষিক প্রাপ্যতা অনেক বেশি নেয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন নেই, অথবা যার মেশিন নেই সেসব পণ্য বন্ড সুবিধায় আনা হয়েছে। এরকম অনেক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। খুলনা অঞ্চলের একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২৭২ কোটি টাকা ফাঁকির ঘটনা উদঘাটন করা হয়েছে। বর্তমানে তা বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। উত্তরা ইপিজেড এর অন্তর্ভুক্ত দুটো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ কোটি টাকার পণ্য খোলা বাজারে বিক্রি করার অপরাধে মামলা করা হয়েছে। চট্টগ্রামে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কারখানা পরিদর্শন করে নানা অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা প্রতিষ্ঠান সমূহকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। **তৃতীয়ত,** এসব পণ্যাদির যেসব খুচরা ও পাইকারি বাজার আছে সেসব বাজারেও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বিশেষ করে পুরান ঢাকার উর্দু রোডে প্লাস্টিক দানার বাজারে বেশ কিছু গুদামে সিল করা হয়েছে। এই বাজারের কতিপয় ব্যবসায়ি বন্ডের মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করে বন্ড সুবিধার অপব্যবহারে সহায়তা করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এসব অভিযোগের সার্বিক প্রভাব ইতিবাচক। বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধে এসব কর্মকাণ্ডের ফলে রাজস্ব আহরণেও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে।

মিথ্যা ঘোষণা শুল্ক সংক্রান্ত একটি প্রচলিত অপরাধ। দি কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর ধারা ৩২ এ এই অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যে কোন আমদানি বা রপ্তানি পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ ও ওজনে কম-বেশি ঘোষণা অথবা কোন অসত্য বা জাল দলিল দাখিল করে খালাসের চেষ্টা করা হলে এই অপরাধ সংঘটিত হয়। এর জন্য জরিমানা শাস্তির কথাও আইনে বলা হয়েছে। গত বছর শুল্ক গোয়েন্দা ব্যাপক সংখ্যক এই মিথ্যা ঘোষণার পণ্য আটক ও তদন্ত

করে শুল্ক ফাঁকির ঘটনা উদঘাটন করেছে। এতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব জড়িত রয়েছে। এই দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী মোট ৬২৪ টি মামলায় ৩৫৫.৪১ কোটি টাকার পণ্য জড়িত। একইসাথে এসবে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়েছে ৭১.৬৮ কোটি টাকা। এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং জড়িত টাকা আদায় হয়েছে।

এসব রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা ছাড়াও এই দপ্তর বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে গোয়েন্দা প্রতিবেদন তৈরি করেছে। মাঠ পর্যায়ে নানা সমস্যা তুলে ধরে কমিশনারের সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কোন স্থানে অন্য দপ্তর কর্তৃক আইন বহির্ভূত অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সরকারের নজরে এনে তা সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করেছে। একইসাথে, শুল্ক বিভাগের সরকারি দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণি কর্তৃক হুমকি ও হামলার ঘটনায় শুল্ক গোয়েন্দা এগিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরুপ, ঢাকা কাস্টম হাউসে শ্যামল বাহিনি কর্তৃক কতিপয় শুল্ক কর্মকর্তার সরকারী দায়িত্ব পালনের বাঁধা দানের ঘটনায় এই দপ্তর আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদের সাথে একযোগে কাজ করেছে। আসামী গ্রেফতার ও তাদের আইনের আওতায় আনতে সব রকম সহায়তা দিয়েছে এই দপ্তর। অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ ষ্টেকহোল্ডাদের পারস্পারিক আস্থা ও সমঝোতা বৃদ্ধিতে এই অধিদপ্তর সদা তৎপর থেকেছে। সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিফলনেরে ক্ষেত্রে নিয়মিত মনিটরিং করেছে। সার্বিকভাবে, এই অধিদপ্তর চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধে যেমন সক্ষমতা দেখিয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায়ও সংযোগ স্থাপন করেছে অর্থবহভাবে। একইসাথে এনবিআরের মনিটরিং অধিদপ্তর হিসেবে শুল্ক গোয়েন্দা দৃশ্যমান উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। আগামি বছরে এই ভূমিকা আরো জোরালো হবে, এটিই প্রত্যাশা।

- ড. মইনুল খান, মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

লেন্স অব মিডিয়া
-ফেরদৌসী মাহবুব

শুল্ক গোয়েন্দার কাজের পরিধি আর দশটা শুল্ক দপ্তরের চেয়ে একটু আলাদা। সে কারণে অন্যদের মতো শুল্কায়ন নিয়ে দিনমান কাটে না শুল্ক গোয়েন্দাদের। জাগ্রত ও জিজ্ঞাসু চোখে তারচেয়েও অধিক সতর্ক কান ও মস্তিষ্কে তারা প্রহরায় থাকেন রাজস্ব সুরক্ষায়। মুদ্রা, মাদক ও স্বর্ণ পাচারসহ শুল্ক সংক্রান্ত যাবতীয় অপরাধের ওপর সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি রাখা এই অধিদপ্তরের মূল কাজ। পাশাপাশি দেশে বিদ্যমান আইন-কানুন ভঙ্গ করে কোনো অবৈধ পণ্য ও ব্যক্তি যেন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে এবং দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে কোন অপরাধ কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে শুল্ক গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা কাজ গোপন রাখা মতাদর্শে অনেকে বিশ্বাসী। মিডিয়ায় প্রচারের বিষয়টিকে তারা ভিন্নভাবে দেখে থাকেন। তবে শুল্ক গোয়েন্দা কাজ করে নথির পাতা, শুল্কায়নের দিস্তা আর প্রতিদিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে পিঁপড়ের ঝাঁকের মতো আনলোড হওয়া অজস্র পণ্য আর মানুষ নিয়ে। এর পেছনের গল্পগুলো সাফল্যের গল্প। তাই মিডিয়ার স্ক্রল ও পত্রিকার পাতায় উঠে আসা এ গল্পগুলো মানুষকে স্বস্তি দেয়।

শুল্ক গোয়েন্দাদের কাজের সাথে মিডিয়াকে যুক্ত করার **প্রথম** কারণটি হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। যেমন-একটা প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়, আপনারা এত স্বর্ণ ধরেন সেই স্বর্ণ যায় কোথায়? এই বিষয়গুলো যখন মিডিয়ায় প্রচারিত হয় সাধারণ মানুষ সেটা জানতে পারেন। কাজের স্বচ্ছতার বিষয়টিও নিশ্চিত হয়। কারণ দেয়া তথ্যগুলো কালবিলম্ব না করে চলে আসে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। উৎসুক হাজারো প্রশ্নের জবাবও তুলে ধরা হয় মিডিয়ার বিভিন্ন টকশোতে। এক সময়ের সাধারণ মানুষ থেকে বহুদূরের কাস্টমস বিভাগ হয়ে ওঠে প্রতিবেশীর মতো। দর্শকের অবাক দৃষ্টিসীমায় চলে আসে ঘটনাবহুল শুল্ক গোয়েন্দার দিনলিপি।

দ্বিতীয়ত শুল্ক গোয়েন্দার প্রধান কাজ হচ্ছে চোরাচালান প্রতিরোধ ও প্রতিহতকরণ। চোরাচালানের নিত্য নতুন কৌশলের সাথে সাধারণ মানুষকে পরিচয় করিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাও তাদের লক্ষ্য। শুল্ক গোয়েন্দার কর্মযজ্ঞকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ জনগণকেও

রাজস্ব বিশেষজ্ঞ করেছে মিডিয়া আর ফেসবুক। অধিকাংশ মানুষই এখন জানেন চোরাচালানকৃত পণ্য কি, কিভাবে এ তথ্য শুল্ক গোয়েন্দার কাছে পৌঁছে নিরাপদ রাখা যায় রাজস্ব। রাজস্বের দশ দিক নিয়ে শুল্ক গোয়েন্দার সুগঠিত নেটওয়ার্ক প্রত্যাশায় থাকে নতুন কোনো তথ্যের বা কোনো সন্দেহজনক গতিবিধির বা দৈবক্রমে পেয়ে যাওয়া কোনো উৎসবের। এ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণও তথ্য দিয়ে সহায়তা করে থাকেন।

তৃতীয়ত গোয়েন্দার চোখ সবসময় অপরাধীদের অনুসরণ করে, এই বার্তা দেয়া। অপরাধীকে তার অপরাধ ও এর পরিণতি জানিয়ে ডেটারেন্ট ইফেক্ট তৈরি করা যাতে সে সতর্ক হয় এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের এই যুগে শুল্ক গোয়েন্দাদের কাজের মূল্যায়নের ভার মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। তবে এর সাথে একটা সংকেতও শুল্ক গোয়েন্দা দিয়ে যায়- এ দেশের প্রতিটি মানুষ তার ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর থেকে সীমিত সামর্থ্যে উন্নতি সাধনে যে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন এই অধিদপ্তরও সবটুকু নিয়ে তাদের এই প্রচেষ্টার সাথী। হতাশ হয়ে মানুষ যখন বলে কর দিয়ে কী হয়? শুল্ক গোয়েন্দা তখন তাদের বুকে আশার দ্বীপ জ্বালায়। হ্যাঁ, এই উন্মাদনাটুকু জীবনের সাথে মিলিয়ে দিয়ে উজ্জীবিত করে মিডিয়া।

মিডিয়া ও এই দপ্তরের হাত ধরে পাশাপাশি চলার পথটুকু বিস্তৃত হোক বন্ধুত্বের অপরিসীম গন্তব্যে। জীবনের ঝুঁকি আর নিজের কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিনিয়ত চলমান এ সংগ্রামে পাশে থাকুক মিডিয়া আর পর্দায়-পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ছড়িয়ে যাক উৎসবমুখর হরফে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এ রকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে উপস্থাপন করা হলো "লেন্স অব মিডিয়া" অংশটি।

- **ফেরদৌসী মাহবুব,** সহকারী পরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর ২০১৫

অবৈধ ভিওআইপি সামগ্রী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রথম আলো মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ২০১৫

আমদানিকারক আটক

ভিন্ন নামে আমদানি করা এক টন ঘনচিনি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি নিষিদ্ধ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এক টন ঘনচিনি (সোডিয়াম সাইক্লামেট) জব্দ করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা। তাঁরা বলছেন, ভিন্ন নামে ওই ঘনচিনি আমদানি করেছিলেন ওমর ফারুক নামের একজন আমদানিকারক। গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর বাবুবাজার থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

বিকেল পাঁচটার দিকে কাকরাইলে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কার্যালয়ে সংস্থার মহাপরিচালক মইনুল খান সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, এ ঘটনায় চট্টগ্রাম বন্দর থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। ওই মামলায় ওমর ফারুককে গ্রেপ্তার দেখানো হবে। তাঁকে ওই থানায় পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

শুল্ক গোয়েন্দা সূত্র বলেছে, স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে বিভিন্ন দেশে ঘনচিনি নিষিদ্ধ। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ সরকারও ঘনচিনি আমদানি নিষিদ্ধ করে। সম্প্রতি একটি ব্যাংকে এলসি খুলে কাগজে-কলমে সোডিয়াম

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

এক টন ঘনচিনি জব্দ

থেকে গতকাল বিকেল চারটার দিকে তাঁকে আটক করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলেন, ঘনচিনির প্রতি কেজির দাম ২৪০ টাকা। আর সাধারণ চিনি কেজিপ্রতি দাম ৪০ টাকা। কিন্তু এক কেজি ঘনচিনি ৫০ কেজি সাধারণ চিনির মতো কাজ করে। এদিক থেকে ঘনচিনি সাশ্রয়ী। ফলে দই, মিষ্টি, আইসক্রিম, বিভিন্ন পানীয়, এমনকি চকলেট-টফি তৈরিতে অনেকে ঘনচিনি ব্যবহার করছে। ঘনচিনি দিয়ে তৈরি দ্রব্য খেলে ক্যা... কিডনি রোগ, হজমশক্তি হ... বি...

আশঙ্কা থাকে। ওমর ফারুক যে সোডিয়াম সেট্রিট নাম ব্যবহার করে ঘনচিনি আমদানি করেছেন, তা আসলে এক ধরনের অ্যাসিড। এটি দেখতে ঘনচিনি অর্থাৎ সোডিয়াম সাইক্লামেটের মতোই। এমনকি সাধারণ চিনির সঙ্গেও ঘনচিনির পার্থক্য খালি চোখে নির্ণয় করা বেশ কঠিন।

...গোয়েন্দা ও ...পরিচালক ...এমন

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান। এই চিনি তিনি কোন গুদামে রেখেছেন তা জানার চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বাজারেও নজরদারির মাধ্যমে ঘনচিনি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। চট্টগ্রাম বন্দরে যেসব মালামাল আমদানি করা হয়েছে সেসবও ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে।

মইনুল খ... বার ঘনচিনি... ফারুক ধরা-... কারণও খতি... কোন ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়ে... পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধরনই বা কে... ...ব।

দৈনিক জনকণ্ঠ

www.dailyjanakantha.com, www.edailyjanakantha.com এবং www.ejanakantha.info

অর্থপাচার– এবার শুল্ক গোয়েন্দারাই আটক ও চার্জশীট দেবে

আজাদ সুলায়মান ॥ সংশোধিত মানি লন্ডারিং আইনের আওতায় ছয় ধরনের অপরাধ তদন্ত, চার্জশীট প্রদান ও গ্রেফতার করার মতো ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ও শুল্ক বিভাগ। এজন্য দেশের চৌকস ৫০ শুল্ক কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। এ ছয় ধরনের অপরাধ হচ্ছে- চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি, মেধাস্বত্ব প্রতারণা, মাদক পাচার, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা, পরিবেশ আইন ভঙ্গ ও জীববৈচিত্র্য পাচার। শুল্ক গোয়েন্দা কার্যালয়ে তাদের এ ছয় ধরনের অপরাধ নিয়ে কাজ করার জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের পর দেশব্যাপী চালানো হবে সাঁড়াশি অভিযান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান এম নজিবুর রহমান জানিয়েছেন, মূলত আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই পর্যায়ক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাকে এ ধরনের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে।

জানা যায়, সংশোধিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১৫

সংশোধিত আইনে ক্ষমতা পেয়েছে শুল্ক বিভাগ

এর আওতায় শুল্ক গোয়েন্দা ও শুল্ক কর্মকর্তাদের এ ছয় ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ আইনে কেউ অপরাধী প্রমাণিত হলে তাঁকে সর্বনিম্ন ৪ বছর ও সর্বোচ্চ ১২ বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি রয়েছে। এছাড়া পাচারকৃত অর্থ বাজেয়াফত করার পাশাপাশি দ্বিগুণ জরিমানা করার বিধান রাখা হয়েছে। এ

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

অর্থপাচার– এবার

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

জন্যই ব্যবসা বাণিজ্যের অজুহাতে বিদেশে অর্থপাচারের মতো অপরাধ প্রতিরোধে সংশোধিত আইন যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছেন রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান এম নজিবুর রহমান। সূত্রমতে, প্রচলিত আইনে এসব অপরাধের তদন্ত আগেও হতো। কিন্তু সংশোধিত আইনে এ ছয় ক্যাটাগরির অপরাধ নিয়ে বিশেষায়িত কাজ করা হবে। এক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশের সিআইডি- এ চারটি প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করবে। এর মধ্যে রাজস্ব বোর্ডের সদস্যরা প্রতিরোধ করবে ক্রসড বর্ডার ও ট্যাক্সসংক্রান্ত অপরাধ। মাদক, অস্ত্র ও হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচারের মতো অপরাধের দায়িত্ব পালন করবে সিআইডি। বাকি দুটো অপরাধ জগতের ওপর নজরদারি করবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুদক। ইতোমধ্যে এ চারটি প্রতিষ্ঠান দুই মাস ধরে এ বিষয়ে বৈঠকের পর বৈঠক করে নিজেদের মধ্যে সমন্বিত কর্মকৌশল ঠিক করেছে। এরপরই শুল্ক গোয়েন্দা ও শুল্ক বিভাগের ৫০ চৌকস কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বুধবার শুল্ক গোয়েন্দার সদর দফতরে দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান এম নজিবুর রহমান।

এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সংশোধিত আইনে যে সব অপরাধের কথা বলা হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে দেশের নিরাপত্তা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বাড়বে রাজস্বও। বিশেষ করে সন্ত্রাস ও জঙ্গী অর্থায়নে কিভাবে কারা জড়িত, কারা ...া ষড়যন্ত্রের এসব ...র হবে। এটা যে শুধু ...র ঠেকানোর লক্ষ্য ...ব সেটা নয়। যারা ...র্থ এনে দেশে বসে ... ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদেরও শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

শুল্ক গোয়েন্দা সূত্র জানায়, সংশোধিত আইনে শুল্ক গোয়েন্দা সদস্যরা সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এ ছয়টি অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের যে কোন সময় আটক, গ্রেফতার, রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত শেষে চার্জশীট প্রদান করতে পারবে। এমনকি আইনী লড়াইয়েও বাদী হিসেবে দায়িত্ব পালনের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

জানতে চাইলে শুল্ক গোয়েন্দার মহাপরিচালক ডক্টর মইনুল খান জনকণ্ঠকে বলেন, হুন্ডির মাধ্যমে অর্থপাচার করা বড় ধরনের অপরাধ। এ অর্থ শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করা হয় না, জঙ্গী-সন্ত্রাস ও নাশকতার কাজেও ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই পাকিস্তান থেকে ভারতীয় মুদ্রা ঢাকায় ধরা পড়ছে। প্রচলিত আইনে পুলিশ এসব মামলা তদন্ত ও পরিচালনা করে। এখন প্রচলিত সংশোধিত আইনে মুদ্রাপাচার ছাড়াও জীববৈচিত্র্য পাচার, অস্ত্র চোরাচালান ও মাদক পাচারের মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় থাকছে শুল্ক গোয়েন্দা। বিমানবন্দর, স্থলবন্দর ও অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় এজন্য বিশেষ ইউনিট সাদা পোশাকে তৎপর থাকবে। এমনকি একটি নামকরা পণ্যের ব্র্যান্ড নকল করে অন্য কেউ যদি কোন পণ্য বাজারজাত করতে চায়, তাহলে মেধাস্বত্ব প্রতারণা আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২৬ জানুয়ারি ২০১৬

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সচিবালয়ে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম এবং ডেটা কার্ড অবমুক্ত করেন। পাশে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ● ছবি : বাসস

প্রথম আলো শুক্রবার, ২২ জানুয়ারি ২০১৬

মালয়েশিয়া থেকে আসা বিমানে ২৪ কেজি সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর মালয়েশিয়ার একটি উড়োজাহাজ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ২৪ কেজি সোনা উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

অধিদপ্তরের উপপরিচালক এস এম শামীমুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজটি রাত সাড়ে নয়টার দিকে বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এরপর গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উড়োজাহাজের যাত্রীদের একটি আসনের নিচ থেকে কালো রঙের স্কচটেপে মোড়ানো ২০০টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। এর ওজন ২৪ কেজি। কিন্তু এর কোনো মালিক পাওয়া যায়নি। যাত্রীর তালিকা দেখে সোনার মালিককে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

The Daily Star DHAKA THURSDAY

1,000 illegal ATM cards seized at Dhaka airport

STAFF CORRESPONDENT

Customs Intelligence (CI) at Shahjalal International Airport yesterday seized 1,000 illegally imported ATM cards, suspected to have been brought for financial criminals' use.

Shipped from Hong Kong by a courier firm, the cards in five cartons arrived in Dhaka on a Thai Airways flight on February 26.

Tipped off, intelligence officials seized the ATM cards from the freight section of the airport around 11:00am yesterday while the consignment was being cleared without a bill of entry, said Moinul Khan, director general of CI.

The parcels were supposed to be delivered to a house in the city's Mohakhali, he noted.

"No trade mark and country of origination was engraved on the cards. Imports of this type of items are illegal."

SEE PAGE 2 COL 6

1,000 illeg

FROM PAGE 1

People involved in finan might be behind the cc said Moinul.

Meanwhile, Home Asaduzzaman Khan yester foreign and Bangladeshi the recent ATM forgery are by the law enforcement age

"The activities of all f Bangladesh are under wat newsmen at his secretariat

Four people, including were arrested in the capita on charges of stealing n ATMs by setting up skimn at ATM booths.

The minister sai Bangladeshis, including a ates, were involved in the f are underway to bring the he added.

The Daily Star DHAKA FRIDAY JANUARY 22, 2016

25.5kg gold seized at Dhaka airport

STAFF CORRESPONDENT

Customs officials last night seized 220 gold bars weighing around 25.5kg from two planes at Hazrat Shahjalal International Airport in the capital.

The bars are worth around Tk 12.5 crore, Moinul Khan, director general of the Customs Intelligence, told The Daily Star.

No one was arrested.

The DG said acting on a tip-off, a customs

SEE PAGE 17 COL 1

25.5kg gold

FROM PAGE 20

intelligence team recovered around 23.2kg of gold bars from two seats a Malaysian Airlines flight that landed at the airport around 9:30pr

In another incident, gold bars weighing around 2.3kg were found a toilet of a Regent Airways flight about an hour later. The flight came from Bangkok and was heading for

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিমানবন্দরে চেতনানাশক তরল পদার্থ জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাঁচ কেজি চেতনানাশক তরলজাতীয় পদার্থ জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। গত মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে ওই পদার্থ জব্দ করা হয়। তবে গতকাল বুধবার ওই তরল পদার্থ চেতনানাশক বলে নিশ্চিত হন শুল্ক গোয়েন্দারা।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মাইনুল খান সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল বিকেল চারটার দিকে বিমানবন্দরে কুরিয়ার ইউনিটের ফটক দিয়ে আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী এক যুবক হাতে একটি বাক্স নিয়ে বের

বৃহস্পতিবার। ৩ মার্চ ২০১৬। ২০ ফাল্গুন ১৪২২ **কালের কণ্ঠ**

মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি

বন্দরে এবার জব্দ সাত কোটি টাকার বিদেশি সিগারেট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

এক সপ্তাহের ব্যবধানে চট্টগ্রাম বন্দরে আবার 'মিথ্যা ঘোষণায়' আনা বিদেশি সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ আমদানি নিষিদ্ধ সিগারেটের ২৮৮টি মাস্টার কার্টন জব্দ করে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য সাত কোটি ২০ লাখ টাকা। এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আমদানি নিষিদ্ধ পৌনে পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট জব্দ করা হয়েছিল।

গতকাল বন্দর ইয়ার্ডে রাখা কনটেইনার থেকে জব্দ করা সিগারেটের মধ্যে মন্ড ব্র্যান্ডের ৩৮ কার্টন এবং ইজি ব্র্যান্ডের ২৫০ কার্টন সিগারেট রয়েছে। চট্টগ্রাম কাস্টমস গোয়েন্দা দলের ও সহকারী কমিশনার মুকিতুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঢাকার আশুলিয়ার জেনেটিক ফ্যাশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান বন্ডের আওতায় সুতা আমদানির ঘোষণা দিয়ে এসব সিগারেট নিয়ে আসে। গার্মেন্টের সুতা আমদানির ঘোষণা দিয়ে সাকি শিপিং লাইনসের মাধ্যমে কনটেইনারটি চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয়েছিল।'

জানা যায়, ২৫ ফেব্রুয়ারি যে জাহাজে করে চালানটি আনা হয়েছিল এর স্থানীয় শিপিং এজেন্ট ছিল সাকি শিপিং লাইনস। সুতা আমদানির ঘোষণা দিয়ে এবারও এই শিপিং লাইনসের মাধ্যমে কনটেইনারটি চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয়েছিল। দুই চালানের শিপিং এজেন্ট একই প্রতিষ্ঠান হলেও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান আলাদা।

জানা যায়, ওয়েবল্যাংকসেন নামের জাহাজে করে আনা কনটেইনারটিতে নথিপত্র অনুযায়ী সুতা থাকার কথা থাকলেও সেখানে পাওয়া গেছে ২৮৮ মাস্টার কার্টন সিগারেট, যা আমদানি নিষিদ্ধ। গতকাল বুধবার আটক চালানটির আমদানিকারক দেখানো হয়েছে ঢাকার সাভারের জেনেটিক ফ্যাশনকে। আগেরবার আমদানিকারক দেখানো হয়েছিল গাজীপুরের একটি প্রতিষ্ঠানকে। গতকাল জব্দ করা চালানটি আসে দুবাই থেকে মালয়েশিয়া কেলাং বন্দর হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসা ওয়েবল্যাংকসেন নামের জাহাজটিতে করে। আগের বার আরব আমিরাতের জেবল আলী বন্দর থেকে হো চি মিন নামের জাহাজটি আসে মালয়েশিয়ার একই বন্দর হয়ে। তখন জব্দ করা হয় ৫৫০ কার্টন ভর্তি ৪৭ লাখ বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট, যার বাজারমূল্য পৌনে পাঁচ কোটি টাকা। ওই সময় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল র‍্যাব-৭।

তাঁরা হলেন সাকি শিপিং লাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার শওকত আফসার, ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শফি, কর্মচারী মো. নাছির ও মো. ইমরান। নগরের বন্দর থানায় দায়ের হওয়া ওই মামলায় চার দিন পর জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পান আফসার। গতকাল একই প্রতিষ্ঠানের পণ্য আটক হওয়ার পর আফসার আবার আলোচনায় আসেন। তিনি চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক পরিচালক।

FE The Financial Express Thursday, March 3, 2016

Customs seizes counterfeit ATM cards at airport

FE Report

Foreigners under close watch: Home Minister

Customs watchmen seized 1,000 counterfeit automated teller machine (ATM) cards at Shahjalal International Airport in the city Wednesday, adding an extra stir to the recent bank-booth heists.

The cards in question arrived in five cartons, shipped by DHL Courier from Hong Kong.

There is no valid document for the imported parcels.

Customs Intelligence (CI) watchers intercepted the parcels at the time of obtaining clearance from the airport without Bill of Entry.

Continued to page 7 Col. 6

Customs seizes counterfeit ATM

Continued from page 1 col. 6

Some unscrupulous groups are still active to smuggle goods from freight unit at the airport. An investigation is under way to find out culprits.

Talking to the FE, director-general of the CI Moinul Khan said another lot of some 3000 pieces of ATM cards also lay under surveillance of the team.

Those VISA and MasterCards came in printed form, he added.

"We are waiting to see whether anybody comes to claim the cards. Otherwise, the CI will seize those, too," he added. There might be incidence of money laundering involved with the cards, he said.

...UNB report quoted ...saduzzaman Khan ... Wednesday that ...he foreign nationals ...desh are currently ...

...g on the foreign ...n the light of the ...-forgery scandal in ...n national, Piotr ...k, was arrested, the ... talking to reporters

...lso said efforts are ...ke sure that strict ...done at all immigra-...prevent the entry of

RMG, NGOs and other consultancy services, both in and out of Dhaka city.

With the ongoing monitoring, the minister said, notices will be issued to those whose visas are reaching the expiry dates and about deportation of those staying in Bangladesh despite the expiry of their visas.

Asked about Piotr's involvement in the card scandal, the minister said at first he showed a Polish passport, which was then found to be forged and later a German smart card was recovered from him.

On his arrival in Bangladesh, he had declared business as his reason for visit, but as part of a bigger global fraud syndicate, he married a local woman and wanted to stay in the country and committed more crimes through fraudulence.

Most of Piotr's associates have been arrested and those still on the run will be hunted down soon, Kamal added.

His comments were also sought on a string of recent murders of children, especially the killing of two siblings in Banasree, the minister termed those 'dreadful' and 'inhuman'.

About the initiative of police to collect tenants' information, he said his ministry's intention is to ensure that everyone does not remain in the dark about their next-door neighbours as terrorists can carry out their activities ...a ...y. ...of ...ker

---

বৃহস্পতিবার, ২০ ফাল্গুন ১৪২২
৩ মার্চ ২০১৬
দৈনিক ইত্তেফাক

বিদেশ থেকে আসছে অবৈধ ক্রেডিট কার্ড

বিমানবন্দরে এক হাজার এটিএম কার্ড উদ্ধার

আমাদের সময়
www.dainikamadershomoy.com
সোমবার ৪ এপ্রিল ২০১৬ ■ ২১ চৈত্র ১৪২২

শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ

কোটি টাকার সিলিং ফ্যান আটক

চট্টগ্রাম ব্যুরো ●

রপ্তানির নামে কাঁচামাল এনে সে পণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রির মাধ্যমে শুল্ক ও ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে চট্টগ্রামে একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তৈরি এক কার্ভার্ডভ্যান বৈদ্যুতিক পাখা আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ। গতকাল রোববার ভোরে নগরীর আকবর শাহ মাজার এলাকা থেকে কাভার্ড ভ্যানটি আটক করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের উপ-পরিচালক জাকির হোসেন জানান, আটক করা কাভার্ড ভ্যানটি 'গোল্ডেন সান' নামের একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা বৈদ্যুতিক পাখা নিয়ে কুষ্টিয়া এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

কোটি টাকার সিলিং

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) যাচ্ছিল। চালানপত্রে দেখা যায়, কাভার্ডভ্যানে ৯৫০টি ফ্যানের কথা উল্লেখ রয়েছে। আটক করা ফ্যানগুলোর আনুমানিক দাম এক কোটি টাকা। তিনি বলেন, গোল্ডেন সান নামের ওই প্রতিষ্ঠান রপ্তানির জন্য বন্ড সুবিধায় ফ্যানের উপকরণ আমদানি করে। কিন্তু সেই উপকরণ নিয়ে তৈরি বৈদ্যুতিক পাখা বিদেশে রপ্তানি না করে খোলা বাজারে সেগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি আমদানি পর্যায়ে শুল্ক এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এর আগে গত বছরের ১৬ নভেম্বর ও গত মঙ্গলবার গভীর রাতে খোলা বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানোর সময় এই প্রতিষ্ঠানের আরও দুটি চালান আটক করা হয়। এসব ঘটনায় শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বন্ড কমিশনারের কাছে মামলা করা হয়েছে।

সোমবার ৪ এপ্রিল ২০১৬
২১ চৈত্র ১৪২২ | যুগান্তর

শাহজালালে এক কেজি স্বর্ণ উদ্ধার গ্রেফতার ১

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় এক কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দারা। এ ঘটনায় মুক্তার হোসেন (৪৯) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বাজার মূল্য ২০ লাখ টাকা। শনিবার সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুর থেকে আসা বিজি-০১৮৭ ফ্লাইট তল্লাশি চালিয়ে এসব স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। আটক মুক্তার হোসেনের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ। তার পাসপোর্ট নম্বর এজি ৭৪২৯০৭৫। তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার। ১৯ নভেম্বর ২০১৫। ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২

শাহ আমানতে ১০ কেজি সোনাসহ যাত্রী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ১০ কেজি ওজনের ৮২ পিস সোনার বারসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে কাস্টমসের গোয়েন্দা বিভাগ। যার আনুমানিক মূল্য সাড়ে চার কোটি টাকা। আটক ব্যক্তির নাম সাইফুল আলম (৪৬)। তার বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজানে। জানা গেছে, ওমানের রাজধানী মাস্কাট ছেড়ে আসা একটি বিমানে করে তিনি শাহ আমানত বিমানবন্দরে আসেন। গতকাল সন্ধ্যা ৬টার দিকে সাইফুল আলম লাগেজ ও ব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার সময় তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয় কর্তব্যরত কর্মকর্তাদের। পরে তার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১০ কেজি ওজনের ৮২ পিস অবৈধভাবে আনা সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

FE The Financial Express Wednesday, April 6, 2016

Customs' drive to seize 147 'missing' luxury cars

FE Report

The customs intelligence (CI) team has intensified its drive to find out the 147 luxury cars that went 'missing' after entering the country under car-net-de-passage facility but being used here illegally.

The Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID) under the National Board of Revenue (NBR) has said some 300 luxury cars had entered the country under the special facility from 2010 to 2012 period.

Of the cars, some 150 were sent back by the tourists, while the remaining cars are being used in the country, escaping eyes of the government agencies concerned.

The government offered the car-net-de-passage facility only for tourists to facilitate them to bring their own used cars to the country for a certain period of time

Continued to page 7 Col. 4

Customs' drive to seize 147

Continued from page 1 col. 4

without paying any duty. However, the tourists can bring the vehicles on condition of taking those back to their respective countries.

In a press briefing on Tuesday CIID Director General (DG) Dr Moinul Khan said CI has initiated moves to seize the cars brought under the facility.

"We have seized three luxury cars so far, out of 150 brought under the facility," he said.

On Monday CI seized a BMW-X5 jeep that was brought to the country under the carnet facility. "It is a 2002 model jeep. Its total value is Tk 50 million including duty-taxes."

CI will investigate whether any incidence of money laundering or other criminal offence is related with the case, he added.

The BMW jeep was plying the roads with fake number plates and blue books. There was mismatch between model of the jeep and its documents.

"It will be investigated how the jeep owner took the registration or renewed its fitness from Bangladesh Road Transport Authority (BRTA)."

CI seized the BMW jeep, a four-door sedan, with chassis no-NBAFA52050LM49719, engine no- 27595077, registration number- Dhaka Metro-Gha-14-0343 and cylinder capacity of 2,979 cc, according to its fitness certificate and tax token.

But in the BRTA information, chassis no of the jeep is RDI-1099359, engine no-B20B-1129263 and cylinder capacity is 1,970 cc.

CI found the BMW jeep owner -- Kazi Rezaul Mostofa -- has renewed its fitness certificate from BRTA every year.

In the press briefing, the CIID DG made a call to the owners of such illegal luxury cars to hand over their vehicles immediately to the government to avoid stern actions.

"We are requesting the owners to surrender those cars immediately to the law-enforcing agencies to face less punitive actions," Dr Khan said.

The customs will just collect duty-taxes rather than taking any other stern actions, if they voluntarily surrender the cars, he added.

CI has so far seized seven luxury cars that were brought to the country evading duty-taxes. Of the cars, three were brought under car-net-de-passage facility.

Earlier, CI seized a Mercedes Benz 2008 model car, another BMW car and four luxury cars, imported on behalf of Dubai Aviation Corporation.

doulot_akter@yahoo.com

যুগান্তর
রোববার ১৬ আগস্ট ২০১৫
১ ভাদ্র ১৪২২

শাহজালালে ১৮টি সোনার বারসহ যাত্রী গ্রেফতার

যুগান্তর রিপোর্ট

হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১৮টি সোনার বারসহ এক যাত্রীকে গ্রেফতার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার সময় শনিবার সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া মো. সেলিম উদ্দিনের বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মঈনুল খান যুগান্তরকে জানান, সেলিম দুবাই থেকে ইকে-৫৯২ ফ্লাইটে করে শনিবার সকালে শাহজালাল বিমানবন্দরে এসে নামেন। তার পাসপোর্ট নম্বর এএফ ৫৬৮৪৭৪৭। তিনি দুটি পানির কলের মধ্যে স্কচটেপ ও গ্রিজ দিয়ে বিশেষ কৌশলে সোনার বারগুলো আনেন। ফলে স্ক্যান মেশিনে সেগুলো ধরা পড়েনি। গ্রিন চ্যানেল পার হয়ে বাইরে চলে যাওয়ার সময় তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে আটক করা হয়। পরে পানির কল দুটি ভেঙে প্রতিটির ভেতর ৯টি করে মোট ১৮টি সোনার বার পাওয়া যায়। সেলিমের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলা হয়েছে।

প্রথম আলো রোববার, ১৬ আগস্ট ২০১৫

পানির কলে দুই কেজি সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গতকাল শনিবার দুই কেজি সোনাসহ এক যাত্রীকে গ্রেপ্তার করেছেন গোয়েন্দা সদস্যরা।

গ্রেপ্তার হওয়া যাত্রীর নাম সেলিম উদ্দিন (৩০)। তাঁর গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে।

দুবাই থেকে আসা এমিরেটস এয়ারলাইনসের ওই যাত্রীর সুটকেসের থাকা দুটি পানির কলের মধ্যে ১৮টি সোনার বার পাওয়া যায়। প্রতিটি বারের ওজন ১০ তোলা।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান জানান, জব্দ করা সোনার মূল্য এক কোটি টাকা।

মইনুল খান প্রথম আলোকে বলেন, বেলা ১১টায় দুবাই থেকে ঢাকা আসেন সেলিম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিমানবন্দরে গ্রিন চ্যানেলের সামনে তাঁর সঙ্গে থাকা মালামাল তল্লাশি করা হয়। স্ক্যানারে পরীক্ষা করেও সোনার বারের সন্ধান মিলছিল না। পরে সেলিমের সুটকেসে থাকা দুটি কলের ভেতর সোনার বার পাওয়া যায়। কালো টেপের একটি প্যাকেটে সোনার বারগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। স্ক্যানে যেন ধরা না পড়ে, সে জন্য প্যাকেটের ওপর তরল কেমিক্যাল মেখে রাখা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সেলিম উদ্দিন গোয়েন্দাদের জানান, তিনি প্রায়ই দুবাই যাতায়াত করেন। ২০ হাজার টাকা ও দুবাই আসা-যাওয়ার বিমান টিকিটের বিনিময়ে সোনার চালানটি দেশে নিয়ে আসেন। তবে এর মালিকের নাম তিনি জানেন না।

এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় মামলা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ বৃহস্পতিবার
৮ বৈশাখ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

শাহজালালে ৪ কেজি গাঁজা জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চার কেজি গাঁজা জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা। বুধবার দুপুরে বিমানবন্দরের কাস্টমস হলের লস্ট এ্যান্ড ফাউন্ড শাখার কাছে একটি পরিত্যক্ত লাগেজে এ গাঁজা লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়। শুল্ক গোয়েন্দার সহকারী পরিচালক তারেক মাহমুদ জানান, কালো একটি ট্রলি ব্যাগের মাঝে স্কচ ট্যাপের মাধ্যমে লুকানো ছিল গাঁজার পুঁটলা।

প্রথম আলো
সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

অবৈধভাবে আনা সাড়ে আট হাজার ঘড়ি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাড়ে আট হাজার দামি ঘড়ি আটক করেছেন। এসএমআই নামের একটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই পণ্য আনা হয়েছে।

শুল্ক ও গোয়েন্দা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান প্রথম আলোকে বলেন, আটক করা ঘড়ির মধ্যে ৭ হাজার ৮৮০টি বাচ্চাদের ঘড়ি। বাকি ঘড়ির মধ্যে ৬৪৬টি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দামি ঘড়ি। ২৩টি কার্টনে ভর্তি করে এসব পণ্য আনা হয়েছে। ঘড়ি ছাড়াও এতে আরও আছে ব্যাটারি, বেল্ট ও বিভিন্ন সামগ্রী। আটক করা সামগ্রীর দাম ১০ কোটি টাকা বলে কাস্টমস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

শুল্ক কর্মকর্তারা জানান, এই একই কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করে এর আগে যুবলীগ নেতা বদরুল আলম চোরাই পণ্য নিয়ে আসেন। সম্প্রতি র‍্যাব তাঁকে আটক করে। এছাড়া আরও কয়েকজনকে পুলিশ আটক করেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বিমানবন্দর ব্যবহারকারী চোরাই পণ্য নিয়ে আসা চক্রের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ।

সমকাল
বৃহস্পতিবার
৩ মার্চ ২০১৬ ২০ ফাল্গুন ১৪২২

কার্টনে মিলল ১০০০ নকল এটিএম কার্ড

শাহজালাল বিমানবন্দর

■ সমকাল প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কুরিয়ার শাখা থেকে এক হাজার এটিএম কার্ড উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। গতকাল বুধবার সকালে কার্টনে থাকা কার্ডগুলো পাওয়া যায়। একই চালানে আসা অন্য চারটি কার্টনে ছিল গাড়ির যন্ত্রাংশ, ক্যাপসহ অন্যান্য সমাগ্রী। দেশে এটিএম কার্ড জালিয়াতির ঘটনা নিয়ে তোলপাড়ের মধ্যেই এ কার্ডগুলো পাওয়া গেল। গোয়েন্দারা বলছেন, জালিয়াতিতে ব্যবহারের জন্য মিথ্যা ঘোষণায় কার্ডগুলো আনা হয়েছিল। এটিএম কার্ড জব্দের ঘটনা

কার্টনে মিলল

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এটিএম কার্ডগুলো 'নকল' এবং অসাধু একটি চক্র বিমানবন্দরে এখনও সক্রিয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গোয়েন্দারা জানান, উদ্ধার হওয়া এটিএম কার্ডগুলো আনার সঙ্গে গ্রেফতার বিদেশি নাগরিক পিওটর সিজোফেন ও তার সহযোগীদের কোনো যোগসাজশ রয়েছে কি-না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একাধিক কর্মকর্তা জানান, থাই এয়ারওয়েজের একটি বিমানে (টিজি ৩২১) কার্টনগুলো ঢাকায় আসে। ব্যাংকক বিমানবন্দর থেকে কার্টনগুলো তোলা হয়। জব্দ করা কার্ডগুলো সাদা। প্রতিটি কার্ডের গায়ে একটি চিপ রয়েছে। এর মাধ্যমে এটিএম জালিয়াতি ছাড়াও যে কোনো সিকিউরিটি সিস্টেম ভাঙা সম্ভব। জব্দ করা কার্ডের গায়ে কোনো কান্ট্রি অরিজিন নেই। কী কারণে কার্ডগুলো আনা হয়েছে সেটার বিবরণও ছিল না। এই কার্ডের চালান আনার ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি ও এলসির কোনো বৈধ কাগজপত্রও নেই।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের যুগ্ম-পরিচালক শফিউর রহমান সমকালকে বলেন, উদ্ধার করা এটিএম কার্ডগুলো জালিয়াতির উদ্দেশ্যে আনা হতে পারে। এগুলোতে কোনো গ্রাহকের কার্ডের তথ্য ভরে সেটি ব্যবহার করে বুথ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল।

শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, বিমানবন্দরের কুরিয়ার শাখা থেকে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কোনো কাগজপত্র ছাড়াই পাঁচটি কার্টন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন এক যুবক। এ সময় তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কার্টনে কী রয়েছে? ওই যুবক কোনো জবাব না দিয়ে কার্টন ফেলে দৌড়ে পালায়। সন্দেহ হওয়ায় পরিত্যক্ত কার্টনগুলো খুলে ভেতরে এটিএম কার্ড পাওয়া যায়। ডিএইচএল কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আনা চালানটির প্রাপক ছিল 'পারটেক্স প্লাস্টিকস'। তাদের ঠিকানা লেখা ছিল-৭৪ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২। তবে অনেক সময় এসব ঠিকানা ভুয়া হয়ে থাকে। তাই গোয়েন্দারা সরেজমিনে ওই ঠিকানায় গিয়ে দেখবেন, আসলে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান রয়েছে কি-না। থাকলে তারা কী উদ্দেশ্যে কার্ডগুলো এনেছে, এর সপক্ষে তাদের বৈধ কাগজপত্র আছে কি-না তাও খতিয়ে দেখা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অসৎ উদ্দেশ্যেই অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) ব্যবহৃত কার্ডগুলো আনা হয়েছে। তা না হলে কার্ডের কার্টন ফেলে পালাতেন না চালান নিতে আসা যুবক। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিমানের কুরিয়ার শাখার কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশ রয়েছে। কুরিয়ার শাখা থেকে প্রায়ই আমদানি নিষিদ্ধ ও অবৈধভাবে আনা বিভিন্ন পণ্য এভাবে বের করা হয়।

সম্প্রতি তিনটি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএম বুথে 'স্কিমিং ডিভাইস' বসিয়ে গ্রাহকের কার্ডের তথ্য চুরির পর তা ব্যবহার করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এ ঘটনায় বিদেশি নাগরিক পিওটর সেজোফেন মাজুরেককে গ্রেফতার করে ডিবি। গ্রেফতার করা হয় সিটি ব্যাংকের তিন কর্মকর্তাকেও। পিওটরকে দ্বিতীয় দফায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।

মামলার তদন্ত-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, পিওটরের সঙ্গে নানা শ্রেণী-পেশার মানুষের যোগাযোগ ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত প্রভাবশালী। এরই মধ্যে পিওটরের জব্দ ল্যাপটপ পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে। পিওটরের ঘনিষ্ঠজনদের একটি তালিকা গোয়েন্দাদের হাতে রয়েছে। যাদের মধ্যে অনেকেই এটিএম জালিয়াতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া আরও কয়েকজন ব্যাংক কর্মকর্তা ও রিক্রুটিং এজেন্সির লোকজনকে গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

আমাদের সময়
বুধবার ৬ এপ্রিল ২০১৬
২৩ চৈত্র ১৪২২

শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ

গুলশানে তিন কোটি টাকার বিএমডব্লিউ এক্স-৫ জিপ জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কার্নেট ডি প্যাসেজ সুবিধার শুল্কমুক্ত একটি বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ এক্স-৫ জিপ (ঢাকা মেট্রো ঘ ১৪-০৩৪৩) অবৈধভাবে ব্যবহার করার অভিযোগে জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। গত সোমবার রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গাড়িটি জব্দ করা হয়। শুল্কসহ গাড়িটির মূল্য তিন কোটি টাকা। গাড়িটি গুলশান-২-এর ১০৪ নম্বর সড়কের ৫-জি বাড়িতে কাজী রেজাউল মোস্তফা নামে এক ব্যবসায়ীর হেফাজতে ছিল।

শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর বলছে, ২০১০-১২ সালে দেশে কার্নেট ডি প্যাসেজ এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

গুলশানে তিন কোটি টাকার বিএমডব্লিউ এক্স-৫

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) বা শুল্কমুক্ত ৩০০ গাড়ি আসে। নির্দিষ্ট সময় ব্যবহার শেষে গাড়িগুলো বিদেশে ফেরত যাওয়ার কথা। কিন্তু দেড়শ গাড়ি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে এখনো দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব গাড়ির বিরুদ্ধে শিগগিরই অভিযান শুরু হবে। গতকাল মঙ্গলবার শুল্ক গোয়েন্দা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাড়িটি আটক করা হয়েছে। এটি কার্নেট সুবিধায় আনা হলেও পরে জাল-জালিয়াতি করে এর বিপরীতে হোন্ডা সিআরভি মডেলের একটি তুলনামূলক কম দামের জিপের ভুয়া নম্বর প্লেট তৈরি করা হয়। বিআরটিএর সহায়তা নিয়ে গাড়িটির আমদানিকারকসহ ভুয়া নম্বর প্লেট তৈরিতে সহায়তাকারীদের বিষয়েও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। বাকি দেড়শ গাড়ি যারা এখনো অবৈধভাবে ব্যবহার করছে তাদের দ্রুত সময়ের মধ্যে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগে আবেদনের অনুরোধ জানান মইনুল।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১১ এপ্রিল ২০১৬। ২৮ চৈত্র ১৪২২

সিলেটে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা গাড়ি আটক

সিলেট অফিস ▷

সিলেটে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর। গত শনিবার রাতে নগরের আম্বরখানা এলাকার বিএম টাওয়ার থেকে গাড়িটি আটক করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সিলেটের সহকারী পরিচালক প্রভাত কুমার সিংহ জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে আম্বরখানা এলাকার বিএম টাওয়ারে গিয়ে বি-৩ ফ্ল্যাটের পার্কিংয়ে একটি 'মার্সিডিজ বেঞ্জ' গাড়ি (ঢাকা-৬১৪/৩) দেখতে পান তাঁরা। প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের ওই গাড়ির মালিক সম্পর্কে জানতে চাইলে সেখানে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মী হায়দার মিয়া টাওয়ারের বাসিন্দা তারা মিয়া, আয়শা খানম, আনিতা জান্নাত ও আব্দুল মালেক বলে জানান। তবে শেষ পর্যন্ত টিমের সদস্যরা নিশ্চিত হন টাওয়ারের দ্বাদশ তলার বাসিন্দা যুক্তরাজ্যপ্রবাসী আব্দুল মালেকই গাড়ির মালিক। ওই দিন শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা ওই গাড়িটির স্থিরচিত্র ও ভিডিও করে শুল্ক গোয়েন্দা টিম। পরদিন শুক্রবার দুপুর ১২টায় শুল্ক অধিদপ্তরের একটি টিম ও বিমানবন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. হানিফসহ একদল পুলিশ বিএম টাওয়ারে গেলে গাড়িটি পার্কিংয়ে পাওয়া যায়নি।

কালের কণ্ঠ

শনিবার । ১৪ নভেম্বর ২০১৫ । ৩০ কার্তিক ১৪২২

চট্টগ্রামে আড়াই লাখ টাকার বিদেশি মুদ্রাসহ আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রামের স্টেশন রোড এলাকায় একটি ভবনে অভিযান চালিয়ে ১০টি দেশের আড়াই লাখ টাকার বিদেশি মুদ্রাসহ জাফর আহমদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র‍্যাবসহ শুল্ক গোয়েন্দার একটি দল। গত বৃহস্পতিবার রাতে এ অভিযান চালানো হয়। মুদ্রার মধ্যে সৌদি আরব, ওমান, কাতার, ভারত, বাহরাইন, মরিশাস, মালয়েশিয়া ও ব্রিটিশ মুদ্রা রয়েছে। একই সময় তার কাছ থেকে সাড়ে ১৭ লাখ বাংলাদেশি টাকা পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ফ্রিজ খুলে সোনার বার রাখার খালি কেস পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আটক জাফর আহমদের বাড়ি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার বরমা ইউনিয়নে। চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজারে তার বিদেশি সিগারেটের দোকান রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সে সিগারেটের দোকানের আড়ালে সোনা ও মুদ্রা চোরাচালান ব্যবসা করে। তার কাছে যেসব কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে চোরাকারবারিচক্রের সক্রিয় সদস্য বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অভিযানে নেতৃত্বদানকারী শুল্ক গোয়েন্দা দলের উপপরিচালক জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জাফর আহমদের বাসা থেকে সৌদি আরব, ওমান, কাতার, ভারত, বাহরাইন, মরিশাস, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা পাওয়া গেছে। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ দুই লাখ ৫৭ হাজার টাকা। সেগুলো নকল কি না যাচাই করা যায়নি। একই সঙ্গে সাড়ে ১৭ লাখ বাংলাদেশি টাকা পাওয়া গেছে। আর সোনার বার রাখার কিছু খালি প্যাকেট মিললেও কোনো বার পাওয়া যায়নি। তার কাছে আরো বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থাকার তথ্য থাকলেও খোঁজ মেলেনি।'

জাকির হোসেন আরো বলেন, 'জাফর আহমদের নিজের নামে একটি এবং বিভিন্ন নামে আরো তিনটি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। সব জব্দ করে তাকে র‍্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে।'

অভিযানে উপস্থিত এক প্রত্যক্ষদর্শী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শোকেস ও খাটের নিচে একটি কাগজের প্যাকেটে বিদেশি মুদ্রাগুলো পাওয়া যায়। একপর্যায়ে ফ্রিজের মধ্য থেকে সোনার বারের খালি প্যাকেটের খোঁজ মেলে।'

নাম প্রকাশ না করে অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, অভিযানের সময় দ্বিতীয় তলায় একটি কক্ষের জানালা খোলা ছিল। অভিযানকারী দলের চোখে বিষয়টি পড়লে তৎক্ষণাৎ নিচতলায় দুই সদস্যকে পাঠানো হয়; কিন্তু কোনো খোঁজ মেলেনি। এই সুযোগে পরিবারের কেউ হয়তো সোনার বারগুলো নিচে ফেলে দেয়।

সোনার বার রাখার কেস উদ্ধার

অভিযানকারী দলের সদস্যরা জানান, জাফর আহমদের কাছ থেকে প্রচুর চেক বই পাওয়া গেছে। কিন্তু মুড়িতে কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, তা লেখা নেই। এ ছাড়া কাগজপত্রে সোনার বারসংক্রান্ত লেনদেনের তথ্য মিলেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া (ডলার অনডোর্সমেন্ট) কোনো ব্যক্তির বিদেশি মুদ্রা রাখা অবৈধ। কিন্তু আটককৃত ব্যক্তির কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রা থাকার কোনো প্রমাণ বা সপক্ষে কোনো কাগজপত্র মেলেনি।

প্রথম আলো

সোমবার, ২ নভেম্বর ২০১৫

চট্টগ্রাম বন্দরে ১২ কনটেইনার পণ্য জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম বন্দরে ১২টি কনটেইনার পণ্য জব্দ করেছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। আমদানিতে অনিয়মের অভিযোগে দুটি পৃথক চালানে আনা এসব কনটেইনার জব্দ করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, ঢাকার নোহা এন্টারপ্রাইজ চীন থেকে ১৫ হাজার ৭৫০ পিস মোবাইল সেট আমদানি করে। মোবাইল সেট আমদানির জন্য এই প্রতিষ্ঠানের বৈধ অনুমতিপত্র ছিল না। গতকাল রোববার কায়িক পরীক্ষা শেষে কনটেইনারটিসহ এসব মোবাইল সেট জব্দ করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের উপপরিচালক জাকির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, 'মোবাইল সেট আমদানি করতে হলে বিটিআরসির অনুমতি নিতে হয়। প্রতিষ্ঠানটি এসব মোবাইল সেট খালাসের জন্য বিটিআরসির অনাপত্তিপত্র জমা দেয়। তবে অনাপত্তিপত্রটির মেয়াদ গত সেপ্টেম্বরে শেষ হয়ে যায়। তারা এই অনাপত্তিপত্র ঘষামাজা করে তারিখ পরিবর্তন করে। বিটিআরসি থেকে এ ধরনের কোনো অনাপত্তিপত্র দেওয়া হয়নি, নিশ্চিত হওয়ার পরই এসব সেট জব্দ করা হয়।'

পৃথক চালানে নারায়ণগঞ্জের ফেডারেল করপোরেশন ১১ কনটেইনারে ২৭৫ টন ওজনের আর্ট পেপার আমদানি করে। ঘোষণা অনুযায়ী এসব আর্ট পেপারের জিএসএম বা প্রতি বর্গমিটারের ওজন ৩০০ এবং ৩৫০ গ্রাম। এসব পণ্য তৈরি পোশাকের রপ্তানির সময় ব্যবহারের কথা বলে শুল্কমুক্ত সুবিধাও নেওয়া হয়। তবে গতকাল কনটেইনার খালাসের সময় ১১টি কনটেইনারের মধ্যে চারটি কনটেইনার খুলে এসব পেপারের জিএসএস পান ২২৫।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫
১০ পৌষ ১৪২২

শাহজালালে ২০ কেজি সোনাসহ আটক ৬

যুগান্তর রিপোর্ট

হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বুধবার দুই দফায় ২০ কেজি স্বর্ণ জব্দ করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে দুই চীনা নাগরিকসহ ছয়জনকে। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের মূল্য আনুমানিক ১০ কোটি টাকা। আটককৃতরা হল চীনা নাগরিক—সনকক ওয়াই (২৪) ও চেনসিন স্যাপ এবং আনোয়ারা বেগম (৩০), নাহিদা ফারজানা মনি (২৫), আনোয়ার পারভেজ (২৫) ও ওসমান সোহেল (২৯)। দুপুরে বিমানবন্দর থেকে সাড়ে ১৪ কেজি স্বর্ণসহ চারজনকে আটক করে শুল্ক, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান বলেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এক ফ্লাইটে কুয়েত থেকে চট্টগ্রাম হয়ে দুপুরে ঢাকায় আসে। চট্টগ্রাম থেকে আনোয়ারা বেগম ও নাহিদা ফারজানা মনি ওই বিমানে ওঠে। আনোয়ার পারভেজ ও ওসমান সোহেল কুয়েত থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসে। তারা চারজনই আন্তর্জাতিক স্বর্ণ চোরাচালানির সদস্য। আনোয়ারা বেগম ও নাহিদা ফারজানা মনির কোমর থেকে কালো রংয়ের কাপড়ের দুটি বেল্টের ভেতর থেকে ১২৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের মূল্য ৭ কোটি টাকা।

ঢাকা কাস্টম হাউসের সহকারী কমিশনার (প্রিভেন্টিভ) শহিদুজ্জামান সরকার জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের এমএইচ-১১২ নম্বর ফ্লাইটে আটককৃত সনকক ওয়াই ও চেনসিন স্যাপ ঢাকায় আসে। প্রায় ৪ মাস আগেও তারা বাংলাদেশে এসেছিল। তাদের কোমরে বিশেষভাবে তৈরি বেল্টের ভেতরে লুকানো ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। যার ওজন ৬ কেজি। মূল্য তিন কোটি টাকা।

কালের কণ্ঠ

বুধবার । ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ । ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২

মিথ্যা ঘোষণায় আনা

মংলায় জব্দ ৪৭১টি মোটর ও বাইসাইকেল

মংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি ▷

মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আমদানি করা ৬০ মোটরসাইকেল ও ৪১১টি বাইসাইকেল জব্দ করা হয়েছে মংলা বন্দরে। ঢাকার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান টেনস ক্লাব খেলনা ও ওয়াকার আনার পাশাপাশি এগুলো এনেছে। গত সপ্তাহে কায়িক পরীক্ষার পর মিথ্যা ঘোষণায় আনা এই পণ্য আটক করে কাস্টমস শুল্ক ও গোয়েন্দা বিভাগ।

মংলা কাস্টমসের সহকারী কমিশনার এম এস আরেফিন জাহেদী জানান, কাস্টমস শুল্ক ও গোয়েন্দা বিভাগ মংলা বন্দরে খালাস হওয়া বেশ কিছু সন্দেহভাজন কনটেইনার পরীক্ষা করে। এর মধ্যে ঢাকার ৬৯/২ নয়াপল্টন সোপ-৩ এফ ১০ পলওয়েল সুপার মার্কেটের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান টেনস ক্লাবের তিনটি কনটেইনার রয়েছে। কনটেইনার তিনটিতে এক হাজার ছয় কার্টন বিভিন্ন প্রকার শিশু খেলনা ও ওয়াকার আমদানির ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট (সিঅ্যান্ডএফ) অ্যালায়েন্স লজিস্টিক লিমিটেড পণ্যগুলো ছাড় করানোর প্রক্রিয়া শুরু করার পর কাস্টমস গোয়েন্দা দলের সন্দেহ হয়। তখন তাঁরা সরেজমিন পরীক্ষা করেন। কনটেইনার তিনটিতে ঘোষণাবহির্ভূত ৬০টি টু হুইলার ব্যাটারিচালিত মোটরসাইকেল (স্কুটি) এবং ৩০২টি ১২ ইঞ্চি, ৩৬টি ১৬ ইঞ্চি, ৪৬টি ১৮ ইঞ্চি ও ২৭টি ২০ ইঞ্চি মাপের বাইসাইকেল পাওয়া যায়।

কালের কণ্ঠ

শুক্রবার । ২০ নভেম্বর ২০১৫ । ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২২

৭ কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি কাপড় উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জের পাগলা কোস্ট গার্ড স্টেশন ধলেশ্বরী নদীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, থ্রিপিস ও চাদর উদ্ধার এবং ট্রাক ও বাল্কহেড জব্দ করেছে। শাড়ি কাপড়ের আনুমানিক মূল্য প্রায় সাত কোটি টাকা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে স্টেশন কমান্ডার সাব-লেফটেন্যান্ট হাসানুর রহমান জানান, কোস্ট গার্ড এবং শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের যৌথ টিম দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ধলেশ্বরী নদীর কুইক্ষামারা এলাকায় গতকাল ভোরে অভিযান চালায়। এ সময় নদীতে নোঙর করা একটি বাল্কহেড থেকে ট্রাকে ভারতীয় কাপড় ভরা হচ্ছিল। কোস্ট গার্ড ও শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের দেখে কাপড়ের সঙ্গে থাকা লোকজন পালিয়ে যায়। পরে ট্রাক ও বাল্কহেড থেকে ভারতীয় কাপড়ের বান্ডিল উদ্ধার করা হয়। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শাড়ি কাপড়গুলোর গণনা চলছিল।

অভিযানে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহকারী কমিশনার ইমাম গাজ্জালী উপস্থিত ছিলেন।

The Daily Star

DHAKA TUESDAY DECEMBER 8, 2015

18kg gold recovered from Malaysian flight

Staff Correspondent

Customs intelligence recovered 160 gold bars weighing about 18.65 kilogrammes and worth Tk 9 crore from a Malaysia Airlines flight at Hazrat Shahjalal International Airport in the capital yesterday.

The gold bars were found in eight packets, fully wrapped with black duct tape, under two unbooked seats, said the intelligence DG.

যুগান্তর

মঙ্গলবার ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫
১ পৌষ ১৪২২

দুবাই থেকে আসা কনটেইনার থেকে এয়ারগান উদ্ধার

ভুয়া কাগজপত্রে রফতানির সময় পণ্যভর্তি দুটি কনটেইনার জব্দ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

রোববার মধ্যরাতে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দুবাই থেকে আসা একটি কনটেইনার থেকে একটি এয়ারগান উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের কর্মকর্তারা। এছাড়া একই সময় সোমবার দুপুরে বন্দর থেকে পণ্যভর্তি দুটি কনটেইনার জব্দ করেছে। ব্যাংকের জাল ডকুমেন্টে অবৈধভাবে পোশাক রফতানির সময় কনটেইনারগুলো জব্দ করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালায় শুল্ক গোয়েন্দারা।

শুল্ক গোয়েন্দা অধিদফতরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপপরিচালক জাকির হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ঢাকা মিরপুরের সেনপাড়া এলাকার মেসার্স এমএম ডিজাইন নামে একটি প্রতিষ্ঠান ৮ হাজার ৫৪ ডজন পণ্য রফতানি করছিল। এর মূল্য দেখানো হয়েছে ৫২ হাজার ৮৩৪ ইউএস ডলার। চালানটি পাঠানো হচ্ছিল আমেরিকার টিএমবি সুপ্রিমের ঠিকানায়। সোনালী ব্যাংকের জাল ডকুমেন্ট তৈরি করে ফিলিপিন্সের মালিকার একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে এই চালানটি রফতানি করা হচ্ছিল।

জাকির হোসেন জানান, কাপড় রফতানি করা হলেও সেই টাকা জাল ডকুমেন্টের কারণে দেশে আসবে না। রফতানিকারকের হয়ে কেউ বিদেশে এই চালানের বিপরীতে আসা টাকা গ্রহণ করবে। এ কারণে ধারণা করা হচ্ছে টাকা পাচারের জন্যই রফতানিকারক ব্যাংকের ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে দুই কনটেইনার কাপড় রফতানি করছিল। মেসার্স এমএম ডিজাইন নামে প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩ বছরে মোট ৯১টি চালান রফতানি করেছে। এসব চালানেও জাল ডকুমেন্ট পাঠানো হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান এই শুল্ক কর্মকর্তা।

রোববার রাত ১২টার দিকে চট্টগ্রাম বন্দরে দুবাই থেকে আসা একটি কনটেইনার থেকে একটি এয়ারগান উদ্ধার করেছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের কর্মকর্তারা। তারা জানান, জাহাজ থেকে পণ্য নামিয়ে ৭ নম্বর শেডে রাখার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় এয়ারগানটি উদ্ধার করা হয়। কনটেইনারটি সিলগালা করে বন্দরে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়েছে। কনটেইনারটিতে আরও তল্লাশি চালানো হবে।

সমকাল

বুধবার
৯ ডিসেম্বর ২০১৫ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২

মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি

তিন কোটি টাকার বিএমডব্লিউ জব্দ

■ সমকাল প্রতিবেদক

বৈধ কাগজপত্র ছাড়া মিথ্যা ঘোষণায় আনা বিএমডব্লিউ গাড়ি জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। গতকাল মঙ্গলবার রাতে গুলশান-২ নম্বরের একটি বাসার গ্যারেজ থেকে গাড়িটি জব্দ করা হয়। গাড়ির মালিক ব্যবসায়ী জাফর সিদ্দিক চৌধুরীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে রয়েছেন।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান সমকালকে জানান, ভুয়া বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে ২০১৪ সালের ১১ মার্চ গাড়িটি কমলাপুর আইসিডি থেকে খালাস করা হয়। এরপর জাল তথ্য ব্যবহার করে বিআরটিএ থেকে লাইসেন্স নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন গোয়েন্দা নজরদারির পর মঙ্গলবার গাড়িটি জব্দ করা হলো।

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ৫ মে ২০১৬। ২২ বৈশাখ ১৪২৩

বিলাসবহুল গাড়ির বিনাশী বাণিজ্য

পার্থ সারথি দাস ও
ফারজানা লাবনী ▷

চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর এবং প্রবাসীবহুল সিলেটের ভারতীয় সীমান্ত হয়ে দেশে ঢুকেছে কমপক্ষে আড়াই শ বিলাসবহুল দামি গাড়ি। ভুয়া নিবন্ধন বা নিবন্ধন ছাড়াই সেগুলো চলাচল করছে সড়কে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে মার্সিডিজ, বিএমডাব্লিউ, ল্যান্ডরোভার, জাগুয়ার ফেরারিসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসব গাড়ি এ দেশে ঢুকেছে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে। পর্যটক সেজে বা বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলে আবার সংসদ সদস্যরা তাঁদের কোটায় এসব শুল্কমুক্ত গাড়ি দেশে আনছেন। পরে সুযোগ বুঝে সেসব গাড়ি হাত বদল হয়ে চলে যাচ্ছে বিত্তশালীদের গ্যারেজে। অবৈধ গাড়ি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের কেউ আইনের চোখ এড়িয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে গাড়ি আনছে আবার কেউ তা ব্যবহার করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআরের তদন্তে বের হয়ে এসেছে—তিন বছরে ১৯১টি গাড়ি এনে ১৩৪৪ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা ঘটেছে। দুই হাজার থেকে চার হাজার সিসির বিভিন্ন মডেলের এসব গাড়ির চলতি বাজার মূল্য দুই কোটি থেকে ২২ কোটি টাকা পর্যন্ত। কোনোটির দাম এর চেয়েও বেশি। এসব গাড়ি আমদানিতে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্কসহ মোট শুল্ক-কর পরিশোধ করতে হয় ৮৪০ শতাংশ হারে। এতে গাড়ি

▶▶ পৃষ্ঠা ২১ ক. ১

- বিআরটিএ থেকে ভুয়া নিবন্ধনে চলছে ২৫০ গাড়ি
- তিন বছরে রাজস্ব ফাঁকি ১৩৪৪ কোটি টাকা
- অভিযান চলছে ঢাকা ও সিলেটে
- ৬৫ জনের চক্র জড়িত

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২২ বৈশাখ ১৪২৩
৫ মে ২০১৬

এগার কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে জব্দ বিলাসবহুল গাড়িটি

বিলাসবহুল রেসিং কার জব্দ

১১ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

এগার কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে বনানীর একটি গ্যারেজ থেকে বিলাসবহুল 'ওডি আর ৮' (গাড়িটি বিশ্বখ্যাত রেসিংকার) গাড়ি জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ। গতকাল বুধবার বনানী জি ব্লকের ৭ নম্বর সড়কের ভার্সেটাইল অটোমোবাইলের গ্যারেজ থেকে সাদা রঙের এ গাড়িটি জব্দ করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শুল্ক গোয়েন্দা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মঈনুল খান।

তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে শুল্ক গোয়েন্দারা ওই গাড়ির উপর নজর রাখছিলেন। নিবন্ধনহীন এ গাড়িটি যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করার ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ শুল্ক ফাঁকি দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে মংলা বন্দর দিয়ে গাড়িটি ছাড় করানো হয়েছে আউডি টিটি-২৫০০ সিসি হিসেবে। অথচ এটি ৫২০০ সিসির গাড়ি। সিসি, মডেল ও মূল তথ্য গোপন করে এ গাড়ির ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি টাকা।

গাড়ি কেনাবেচার প্রতিষ্ঠান অটো ওয়ান এ গাড়ি আমদানি করে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান মহাপরিচালক। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

বিলাসবহুল রেসিং

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর আগে গত মাসে তিনি জানিয়েছিলেন, পর্যটকদের বিশেষ সুবিধার সুযোগ নিয়ে কর ফাঁকি দিয়ে বিলাসবহুল শতাধিক গাড়ি বাংলাদেশে চলছে।

বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ বেঞ্জের মতো নামি ব্র্যান্ডের বেশ কয়েকটি দামি গাড়ি সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে জব্দ করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা।

শনিবার ৩০ এপ্রিল ২০১৬ ■ ১৭ বৈশাখ ১৪২৩ | আমাদেরসময়

নিশ্চিত হয়ে অভিযান

সাংসদ স্টিকারযুক্ত শুল্ক ফাঁকির গাড়ি উধাও, মিলল মদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সাংসদের স্টিকার লাগানো 'কার্নেট ডি প্যাসেজ' বা শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা বিলাসবহুল রেঞ্জ রোভার ব্র্যান্ডের একটি গাড়ি অবৈধভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। গোপনে এমন তথ্য পেয়ে এবং তা নিশ্চিত হয়ে রাজধানীর খিলক্ষেতের 'ঢাকা রিজেন্সি' হোটেলে অভিযান চালায় শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। কিন্তু অভিযানের আগেই 'উধাও' হয়ে যায় গাড়িটি। পরে রাতের সহায়তায় ওই হোটেলে অভিযান চালিয়ে ২০০ বোতল অবৈধ বিদেশি মদ ও বিপুল পরিমাণ বিয়ার জব্দ করে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। গত বৃহস্পতিবার এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

সাংসদ স্টিকারযুক্ত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) রাত ১০টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সূত্র জানায়, 'সংসদ সদস্য' স্টিকারযুক্ত গাড়িটি ব্যবহার করছিলেন আরিফ মোতাহার নামে ঢাকা রিজেন্সি হোটেলের এক পরিচালক। তিনি কোনো কালেই সংসদ সদস্য ছিলেন না। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের এই গাড়িটি শুল্কমুক্ত সুবিধায় এ দেশে আনা হয় বেশ কয়েক বছর আগে। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে এটি সরিয়ে ফেলা হয়। তবে হোটেলের ভিডিও ফুটেজ জব্দ করা হয়েছে। ফুটেজে দেখা গেছে, গাড়িটিতে ভুয়া নম্বর প্লেট (ঢাকা মেট্রো-গ ৩৩-৩৫১) লাগানো। পরে হোটেলের বারে অভিযান চালিয়ে ২০০ বোতল মদ ও বিপুল পরিমাণ বিয়ার জব্দ করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক বছর আগে দেশে 'কার্নেট ডি প্যাসেজ' বা শুল্কমুক্ত সুবিধায় তিন শতাধিক বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করা হয়। শর্ত ছিল নির্দিষ্ট সময় পর গাড়িগুলো বিদেশে ফিরে যাবে। এর মধ্যে সেরূপ গাড়ি বিদেশে ফিরে গেলেও বাকি অর্ধেক এখনো অবৈধভাবে দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এসব গাড়ি জব্দে জোরদার অভিযান শুরু করে। ইতোমধ্যে কয়েকটি গাড়ি উদ্ধারও করা হয়। এর মধ্যে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানীর গুলশান থেকে একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি জব্দ করে শুল্ক গোয়েন্দারা, যেটির দাম প্রায় তিন কোটি টাকা। এরপর ১৯ এপ্রিল রাতে সিলেটে শুল্ক গোয়েন্দা কার্যালয়ের সামনে দেড় কোটি টাকা দামের লেক্সাস ২০০৭ মডেলের একটি গাড়ি ফেলে যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। এ ছাড়া গতবছর গুলশান এলাকা থেকে একটি বিএমডব্লিউ এবং ধানমন্ডি থেকে একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ জব্দ করা হয়েছিল।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান বলেন, এর আগে গত ২৩ এপ্রিল রাতেও গাড়িটি আটক করতে অভিযান চালানো হয়েছিল। সেদিনও কৌশলে হোটেল থেকে গাড়িটি সরিয়ে ফেলা হয়। গত বৃহস্পতিবারও গাড়িটি জব্দ করা যায়নি। এরপর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে এসব মদ ও বিয়ার জব্দ করা হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ এসব মদ ও বিয়ারের বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা এবং গাড়িটি আটকের জোর চেষ্টা চলছে।

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আমদানিতে খরচ বেড়ে যায় বলে কারনেট সুবিধার আওতায় পর্যটকবেশে গাড়ি আনা হচ্ছে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব গাড়ি চলাচল করছে রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম ও প্রবাসীবহুল সিলেটে।

কারনেট সুবিধার নামে বিদেশ থেকে বিলাসী গাড়ির বেশির ভাগ দেশে নিয়ে আসছে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী সিলেটিরা। এনবিআর এ ধরনের বহু গাড়ির হদিসই পাচ্ছে না। তবে মাসখানেক ধরে ঢাকা ও সিলেটে শুল্ক গোয়েন্দারা অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল গাড়ি আটক করেছেন। ধরা পড়েছে ভুয়া নিবন্ধনে কিংবা নিবন্ধন ছাড়াই এগুলো চলছিল।

এদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক অনুসন্ধান করে দেখতে পেয়েছে, ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে শুধু চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই ১২১টি গাড়ি কারনেট সুবিধার নামে আনা হয়েছে। গাড়ি বাণিজ্যে জড়িত চারজন যুক্তরাজ্যপ্রবাসীরও খোঁজ পেয়েছে দুদক।

পর্যটকদের গাড়ি নিয়ে যেকোনো দেশে ঢোকার ক্ষেত্রে 'দ্য কাস্টম কনভেনশন অন দ্য টেম্পোরারি ইমপোর্টেশন অব প্রাইভেট ভেহিকলস (১৯৫৪) অ্যান্ড কমার্শিয়াল রোড ভেহিকলস (১৯৫৬)' নামে আন্তর্জাতিক আইন আছে। বিভিন্ন দেশে 'কারনেট দ্য প্যাসেজ' নামে এই আইনটি পরিচিত। কোনো পর্যটক ইচ্ছা করলে গাড়ি নিয়ে শুল্ক ছাড়াই কোনো দেশে যেতে পারেন। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িটিও সঙ্গে নিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ কারনেট সুবিধা না দেওয়া দেশগুলোর একটি।

পর্যটকবেশে শুল্কমুক্ত সুবিধায় গাড়ি আনার পর এ নিয়ে বাণিজ্য চলছে। পর্যটকরা ফিরে যাওয়ার আগে বাংলাদেশে গাড়ি হারিয়ে গেছে বা চুরি গেছে বলে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে জিডির কপি দেখিয়ে জামানতের (গাড়ি দেশে ঢোকার সময় যে জামানত দিতে হয়) অর্থ তুলে নেন। এ সুবিধায় আনা যানবাহনের মেয়াদ তিন মাস। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাড়ি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম না হলে যৌক্তিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থানকাল বাড়িয়ে নেওয়া যায়। গাড়ি হারিয়ে গেছে দেখিয়ে সেগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিআরটিএর লোকজনকে ঘুষ দিয়ে নিবন্ধনও নেওয়া হয়। যদিও এসব নিবন্ধনের বৈধতা নেই।

এনবিআরের শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা বিলাসবহুল গাড়ি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন কয়েক দিন আগে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমানের কাছে জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২০১০, ২০১১, ২০১২—এ তিন বছরে কারনেট সুবিধায় শুল্কমুক্তভাবে বিএমডাব্লিউ, টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার, স্টেশন ওয়াগন, প্রাডো টিএক্স, ডিজেলচালিত ভিএক্স, হ্যামার, পোরশে, মার্সিডিজ বেঞ্জসহ বিভিন্ন বিলাসবহুল উচ্চমূল্যের ৩১৫টি গাড়ি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে দেশে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। ৩১৫টি গাড়ির মধ্যে ১৪৮টি গাড়ি বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেওয়া হয়নি। বড় প্রকল্প এবং কূটনীতিকদের জন্য ব্যবহারের নামে ৪৩টি বিলাসবহুল গাড়ি শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯১টি বিলাসবহুল গাড়ি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে দেশেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব গাড়ি খাতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি প্রায় এক হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। ফেরত না যাওয়া গাড়ির অনুসন্ধান চলছে।

এনবিআর চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, কারনেট সুবিধায় আনা বেশ কিছু গাড়ি দেশের মধ্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এসব গাড়ির প্রবেশকারী, ব্যবহারকারী উভয়েই অপরাধী। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কারনেট সুবিধায় আনা গাড়ি ধরতে এনবিআর থেকে অনুসন্ধান চলছে।

শুল্ক গোয়েন্দার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্যটক পরিচয়ে কারনেট সুবিধার অপব্যবহার হয়েছে। কারনেট সুবিধার বাইরে সরকার কয়েকটি খাতের বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত বিলাসবহুল গাড়ি আনার সুযোগ দিয়েছে। সংসদ সদস্যরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য স্থায়ীভাবে শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ পান।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০১০ সাল থেকে তিন বছর কারনেট সুবিধায় উচ্চ শুল্কের গাড়ি প্রবেশে যেসব অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

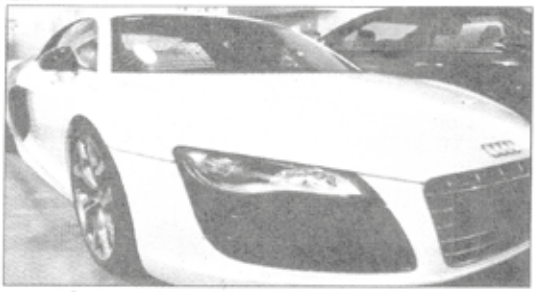

দুদকের অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে, ২০১৩ সালের শুরুর দিকে দুদকও কারনেট সুবিধায় গাড়ি আনার বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। তদন্তকারীরা পরে জানতে পারেন এই গাড়ি বাণিজ্যে জড়িত আছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চার ব্রিটিশ নাগরিকসহ ৬৫ ব্যক্তি। আমদানিকারক, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও গাড়ির মালিকরা এই চক্রে যুক্ত আছেন। চার যুক্তরাজ্যপ্রবাসীর বাড়ি সিলেট সদরে। এর মধ্যে মামুন মিয়ার দুটো অডি কিউ সেভেন কারের ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে বিআরটিএ থেকে নিবন্ধন নেওয়া হয়েছিল।

ধরা পড়ছে, কেউ ভয়ে রাস্তায় ফেলে রাখছে : গতকাল বুধবার জব্দ করা হয়েছে মিথ্যা ঘোষণায় সাড়ে আট কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা বিশ্বখ্যাত রেসিং কার আওডি আর-৮। বনানীর একটি গ্যারেজ থেকে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর গাড়িটি জব্দ করে। এই গাড়ির কোনো নিবন্ধন ছিল না। ২০১৩ সালে মংলা বন্দর দিয়ে আওডি ২৫০০ সিসি হিসেবে গাড়িটি ছাড় করা হয়। যদিও গাড়িটি 'আওডি আর৮' ৫২০০ সিসি মডেলের। দুই দরজার সাদা রঙের গাড়িটি বিশ্বে রেসিং খেলায় ব্যবহৃত হয়।

২৪ এপ্রিল এমপি কোটায় আমদানিকৃত একটি পোরশে জিপ গুলশান এলাকা থেকে আটক করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। জিপ গাড়িটি গুলশানের একটি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় জব্দ করা হয়। চার হাজার ৫০০ সিসির গাড়িটি ২০০৬ সালে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন আমদানি করেন। ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য এটি আমদানি করা হলেও সাবেক মন্ত্রী গাড়িটি একজন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন।

৪ এপ্রিল রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে তিন কোটি টাকা দামের বিএমডাব্লিউ এক্স ফাইভ গাড়িটি জব্দ করেন শুল্ক গোয়েন্দারা। অবৈধ গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগে জেনারেটর ও এলিভেটর ব্যবসায়ী কাজী রেজাউল মোস্তফাকে আটক করা হয়। লন্ডনপ্রবাসী সিলেটে বাড়ি এমন এক ব্যক্তি কারনেট সুবিধায় গাড়িটি এনে কাজী রেজাউল মোস্তফার কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করেন। আটক গাড়িটি অন্য একটি কম দামি গাড়ির (ইঞ্জিন নম্বর ২৭৫৯৫০৭৭) নামে বিআরটিএ থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

গত বছরও গুলশান থেকে আরো একটি বিএমডাব্লিউ ও ধানমণ্ডি থেকে একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ জব্দ করেছিলেন শুল্ক গোয়েন্দারা।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানীর গুলশান থেকে মডেল ও সাবেক মিস বাংলাদেশি জাকিয়া মুন, ব্যবসায়ী প্যাসিফিক গ্রুপের কর্ণধার শফিউল আজম মহসিনের কাছ থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা দামের পোরশে মডেলের এসএফ ০৫ এইউএম ব্রিটিশ নম্বরের হলুদ গাড়িটি জব্দ করা হয়। দুই কোটি টাকার বেশি শুল্কসহ জিপটির মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকার বেশি। রাজধানীর গুলশান-১-এর টার্কিশ হোপ স্কুলের পাশে প্লট ৩৩, ১০ নম্বর বাসার গ্যারেজ থেকে জিপটি জব্দ করা হয়।

সিলেটে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা দুই কোটি টাকা মূল্যের একটি 'মার্সিডিজ বেঞ্জ' গাড়ি আটক করা হয় ১০ এপ্রিল মহানগরীর আম্বরখানার বিএম টাওয়ারের পার্কিং এলাকা থেকে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিএম টাওয়ারের বি-৩ ফ্ল্যাটের পার্কিংয়ে থাকা গাড়িটি আটক করা হয়।

বিআরটিএর চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ঘটনা ধরা পড়ার পর এনবিআর সহযোগিতা চাইলে আমরা তা দেব। তবে কেউ ভুয়া নথিপত্রে নিবন্ধন করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১ ডিসেম্বর ২০১৫
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২২

কেরানীগঞ্জে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক কেমিক্যাল উদ্ধার

নাশকতার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার আশংকা

সোমবার কেরানীগঞ্জে শুল্ক গোয়েন্দাদের অভিযানে উদ্ধার করা বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য — যুগান্তর

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

দেশকে অস্থিতিশীল করতে যখন বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখন রাজধানীর পাশে কেরানীগঞ্জ থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক কেমিক্যাল উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন গোডাউন থেকে ৫২৯ ড্রাম রাসায়নিক কেমিক্যাল উদ্ধার করে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ। বিষয়টি আইনশৃংখলা বাহিনীকেও ভাবিয়ে তুলেছে। আশংকা করা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব নাশকতার ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে এই কেমিক্যাল মজুদ করার মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র থাকতে পারে। এসব কেমিক্যাল ব্যবহার করে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনের সময় বড় ধরনের নাশকতামূলক সন্ত্রাসী হামলার বিষয়টিও তারা উড়িয়ে দিতে চান না।

গোডাউন সিলগালা

শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন, এসব ড্রামে ভয়ংকর রাসায়নিক কেমিক্যাল রয়েছে।

প্রতিটি ড্রামে যে পরিমাণ দ্রব্য রয়েছে তা বিস্ফোরিত হলে ওই এলাকা নিমেষেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। এছাড়া এগুলো বছরের পর বছর রাসায়নিক কেমিক্যাল বাতাসে ছড়িয়ে আশপাশের পরিবেশকেও দূষণ করছে।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ ছাড়াও আইনশৃংখলা বাহিনী ইতিমধ্যে এর পেছনে জড়িত মূল হোতাদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুর এলাকায় অবস্থিত গোডাউনটি সিলগালা করে দেয়া হয়েছে। জব্দ করা বিস্ফোরকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মিথাইলিন ক্লোরাইড ২২ ড্রাম, গ্লিসারিন ৫২ ড্রাম, ট্রাই ইথাইল মু ক্লাইড ৫৬ ড্রাম, ডাইক্লো মিথেন ৩২১ ড্রাম, অন্যান্য রাসায়নিক কেমিক্যাল ৭৮ ড্রাম।

এ প্রসঙ্গে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকার সহকারী পরিচালক মো. তারেক মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা মেসার্স সাইফু এন্টারপ্রাইজ নামের প্রতিষ্ঠানটির গোডাউনে অভিযান চালান। এরপর সেখান থেকে মজুদ করে রাখা বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক কেমিক্যাল জব্দ করা হয়। জব্দ করা রাসায়নিকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলো দ্রুত পরীক্ষা করা হবে। তিনি জানান, গোডাউনটি সিলগালা করার পাশাপাশি এসব রাসায়নিক কেমিক্যালের মালিককে আমদানি ডকুমেন্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এসব কেমিক্যাল ভারত, চীন ও কোরিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে। তবে যে কেমিক্যালের নাম দিয়ে এগুলো আমদানি করা হয়েছে বাস্তবে ড্রামে সেই কেমিক্যাল আছে কিনা তা পরীক্ষা করে উদ্ধার : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

উদ্ধার : বিস্ফোরক কেমিক্যাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

[illegible]

প্রথম আলো
বুধবার, ৯ ডিসেম্বর ২০১৫

ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করা বিএমডব্লিউ গাড়ি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর গুলশানের একটি বাড়ি থেকে তিন কোটি টাকা মূল্যের বিএমডব্লিউ কার জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। গতকাল মঙ্গলবার গাড়িটি জব্দ করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান প্রথম আলোকে বলেন, গোপন সূত্রে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানতে পারেন গুলশানের একটি বাড়িতে ভুয়া কাগজপত্র নিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা বিএমডব্লিউ কার রয়েছে। এরপর গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সেখানে অভিযান চালিয়ে গাড়িটি জব্দ করেন। তাঁরা দেখতে পান, জাফর সাদিক চৌধুরী নামের এক ব্যবসায়ী গাড়িটির মালিক। তিনি ভুয়া কাগজপত্র নিয়ে পিরোজপুর [illegible]

সমকাল
বৃহস্পতিবার
২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ ১০ পৌষ ১৪২২

শাহজালালে গ্রেফতার ৪

দুই বিউটিশিয়ানকে দিয়ে ১৪ কেজি স্বর্ণ পাচারের চেষ্টা

সমকাল প্রতিবেদক

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিউটিশিয়ানকে ব্যবহার করে স্বর্ণ পাচারের ঘটনা ঘটছে। একটি চক্র অভ্যন্তরীণ রুটে বিভিন্ন সময় বিউটিশিয়ানদের মাধ্যমে চোরাই স্বর্ণ আনা-নেওয়া করছিল। গতকাল বুধবার বিমানবন্দর থেকে সাড়ে ১৪ কেজি স্বর্ণসহ আনোয়ারা বেগম ও নাহিদা ফারজানা নামে দুই বিউটিশিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী উদ্ধার করা স্বর্ণের দাম প্রায় সাত কোটি টাকা। এরপর তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে স্বর্ণ চোরাকারবারি চক্রের আরও দুই সদস্য আনোয়ার পারভেজ ও ওসমান সোহেলকে গ্রেফতার করে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান সমকালকে জানান, বুধবার দুপুরে দুই নারীর শরীরে লুকিয়ে রাখা সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের ১২৫টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। কুয়েত থেকে আসা দুই যুবক আনোয়ার ও ওসমান স্বর্ণের বারগুলো নিয়ে এসেছিল। পরে পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা চট্টগ্রাম থেকে পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

দুই বিউটিশিয়ানকে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিমানে ওঠা দুই নারী আনোয়ারা ও নাহিদার কাছে স্বর্ণের বারগুলো হস্তান্তর করে। ওই দুই নারী স্বর্ণের বারগুলো তাদের কোমরে লুকিয়ে রেখেছিল। আটক চারজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, আনোয়ার পারভেজ ও ওসমান সোহেল বাংলাদেশ বিমানের বিজি-০৪৬ ফ্লাইটে কুয়েত থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসে। ওই দুই নারী চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে একই বিমানে ঢাকায় আসে। সব যাত্রীর দেহ তল্লাশি করে প্রথমে চোরাই স্বর্ণসহ দুই নারীকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আনোয়ার ও সোহেল নামে দু'জনকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় নেওয়া হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আনোয়ারা ও নাহিদা জানান, তারা চট্টগ্রামের একটি বিউটি পার্লারের বিউটিশিয়ান। এর আগেও একাধিকবার তারা চোরাই স্বর্ণ বহন করে। এবার উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের চালানটি ঢাকায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। তবে স্বর্ণের মূল মালিকের বিষয়ে তারা কিছুই জানে না বলে দাবি করে।

চোরাই স্বর্ণসহ দুই মালয়েশিয়ার নাগরিক গ্রেফতার : গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে শাহজালালে ছয় কেজি স্বর্ণসহ দুই মালয়েশিয়ার নাগরিককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা কাস্টমস হাউস। তারা হলো চানকক ওয়াই (২৪) ও চান সিম স্যাপ (৫৮)। তারা মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে কুয়ালালামপুর থেকে ঢাকা আসেন।

The Daily Star
DHAKA TUESDAY DECEMBER 15, 2015

Garment containers seized over forgery

STAFF CORRESPONDENT, Ctg

Customs officials yesterday confiscated two export containers of garment products after being tipped off about forged bank documents on them.

SN Design, with the registered address of 38 Senpara, Parbata in Dhaka, was the exporter.

READ MORE ON B3

Garment containers seized over forgery

FROM PAGE B1

The company was carrying 8,034 dozens of garment products worth $52,874 for DMD Boutique in Manila, according to the submitted documents.

However, officials are yet to complete a physical evaluation and suspect the real volume of goods is much higher.

When contacted, Md Shahidul Islam, managing director of SN Design, said his company stopped exporting at least two years ago. "I do have a small garment factory, but I don't export anymore. I sell to some local customers."

"Someone has used my licence number without my knowledge. This happened a few years ago as well," he said, adding that he will file complaints with the customs officials so they take punitive action against the wrongdoers.

Islam also said his company was initially registered with the Parbata address but has since relocated to Uttara.

The containers were seized from the private inland container depot Esac Brothers in Bandar area after finding forged signatures of an official of Sonali Bank on the documents, said Zakir Hossain, deputy director of the Customs Intelligence and Investigation Directorate's Chittagong office.

The exporter intended to launder money by using fake documents, according to Hossain.

The directorate will now investigate 91 similar consignments exported by the same firm over the last three years, he added.

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১০ পৌষ ১৪২২
২৪ ডিসেম্বর ২০১৫

ছয় কেজি সোনাসহ দুই চীনা নাগরিক আটক

ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছয় কেজি সোনাসহ চীনের দুই নাগরিককে গ্রেফতার করেছেন শুল্ক কর্মকর্তারা। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- চ্যানকক ওয়াই (২৪) ও চেন সিম শ্যাপ (৫৮)। মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় তারা ঢাকা পৌঁছান বলে কাস্টমসের সহকারী কমিশনার শহীদুজ্জামান সরকার জানান। তাদের কোমরের বেল্ট থেকে ছয়টি সোনার বার জব্দ করা হয় বলে জানান তিনি। এসব সোনার আনুমানিক মূল্য তিন কোটি টাকা। শহীদুজ্জামান বলেন, 'দুই চীনা নাগরিক এর আগেও বাংলাদেশে এসেছিলেন; কিন্তু তখন তারা ধরা পড়েননি।' তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এর আগে বেলা একটার দিকে এই বিমানবন্দর থেকে সাড়ে ১৪ কেজি সোনা উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এসব সোনা পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা ওই সোনার বাজারমূল্য সাত কোটি টাকার মতো।

The Daily Star
DHAKA THURSDAY DECEMBER 24, 2015

20.5kg gold seized

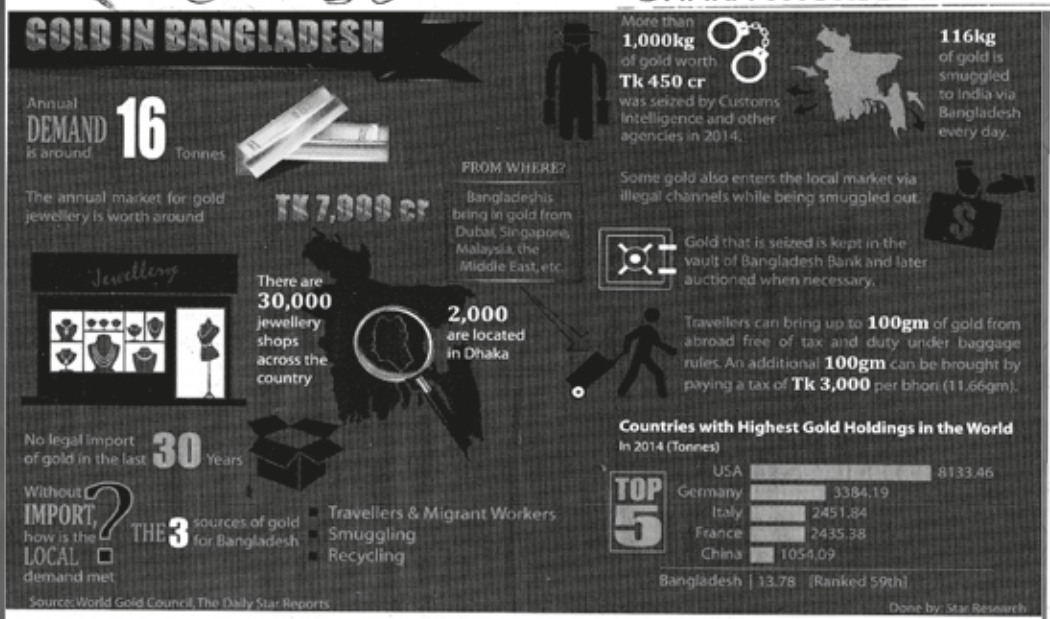

STAFF CORRESPONDENT

Customs Intelligence officials seized 20.5kgs of gold worth around Tk 10 crore and detained six people, including two Malaysians, in two separate incidents at Hazrat Shahjalal International Airport yesterday.

Of the gold, 14.5kgs were seized from the possession of two female passengers who travelled from Chittagong to Dhaka

SEE PAGE 2 COL.

20.5kg gold

FROM PAGE 1

on Biman Bangladesh Airlines' Kuwait-Chittagong-Dhaka flight, customs officials said.

Moinul Khan, director general of customs intelligence, said on information they intercepted Anwara Begum and Nahida Farzana Moni at the domestic terminal.

The officials recovered 125 pieces of gold bars, worth around Tk 7 crore, frisking them, he said.

After knowing that the gold was handed over to them by two men inside the aircraft, the officials took them to identify the two men.

On their information, the officials detained Anwar Parvez and Osman Sohel from customs house area moments before their departure, he said, adding that the two men were frequent flyers.

Moinul said the two men smuggled the gold into the country from Kuwait while the females, who worked at a beauty parlour in Chittagong, carried those from Chittagong to Dhaka. They exchanged the gold bars inside the aircraft toilet.

In a separate incident, Malaysians Chankok Wai, 24, and Chen Sim Sapp, 58, of Chinese decent were detained with 6kgs of gold at the airport.

The two arrived in Dhaka on a Malaysian Airlines flight which landed at 9:30pm.

Shahiduzzaman Sarkar, assistant commissioner of customs, said they searched the bodies of the two and found six gold bars, worth around Tk 3 crore, in their waist belts.

Legal actions were being taken against the duo, said the official, adding that the two had visited Bangladesh before.

"Although there are instructions from the authorities to scan passengers and all baggage, there's always something lacking," said a security officer at the airport, wishing anonymity.

"We strengthened vigilance at the domestic terminal too," DG Moinul added.

Biman Bangladesh Airlines is the only airline that allows domestic passengers from Sylhet and Chittagong to fly to Dhaka on its international flights.

The domestic passengers get their exits through the domestic terminal.

With the latest seizure, customs intelligence officials seized 209kgs of gold at different airports this year.

সমকাল
মঙ্গলবার
৮ ডিসেম্বর ২০১৫ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২২

শাহজালালে সাড়ে ১৮ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার

■ সমকাল প্রতিবেদক

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কুয়ালালামপুর থেকে আসা একটি উড়োজাহাজ থেকে ১৬০টি স্বর্ণবার উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের এমএইচ ১৯৬ ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করার পর স্বর্ণের বারগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান সমকালকে জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে উড়োজাহাজটির দুটি আসনের নিচ থেকে ১৮ কেজি ৬৫০ গ্রাম স্বর্ণ পাওয়া যায়। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৯ কোটি টাকা। এই ঘটনায় জড়িত কাউকে এখনও আটক করা যায়নি।

যুগান্তর
শনিবার ৩০ এপ্রিল ২০১৬
১৭ বৈশাখ ১৪২৩

ঢাকা রিজেন্সি হোটেল থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ বিদেশী মদ
যুগান্তর

রিজেন্সিতে গাড়ি জব্দ করতে গিয়ে মিলল মদ-বিয়ার

যুগান্তর রিপোর্ট

সংসদ সদস্যের স্টিকার লাগানো রেঞ্জ রোভার ব্র্যান্ডের গাড়ি জব্দ করতে গিয়ে মিলেছে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মদ-বিয়ার। শুক্রবার ভোররাতে ঢাকা রিজেন্সি হোটেল থেকে এসব মদ-বিয়ার উদ্ধার করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর।

গাড়িটি জানায়, সংসদ সদস্যের স্টিকার ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

রিজেন্সিতে গাড়ি জব্দ করতে গিয়ে মিলল মদ-বিয়ার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

লাগানো গাড়িটি ব্যবহার করছিলেন 'ঢাকা রিজেন্সি' হোটেলের একজন পরিচালক। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা দামের গাড়িটি আটক করতে গেলে তা আগেই সরিয়ে নেয়া হয়। তবে হোটেলের ভেতর থেকে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ ও বিয়ার।

রেঞ্জ রোভার ব্র্যান্ডের গাড়িটি শুল্কমুক্ত সুবিধায় বেশ কয়েক বছর আগে আনা হয়। গাড়িটিতে সংসদ সদস্যের স্টিকার যুক্ত অবস্থায় আরিফ মোতাহার নামে রিজেন্সি হোটেলের এক পরিচালক তা ব্যবহার করছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযানের বিষয় টের পেয়ে গাড়িটি সরিয়ে নেয়া হয়। তবে হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ জব্দ করা হয়েছে।

ফুটেজে দেখা গেছে, গাড়িটিতে ভুয়া নম্বর প্লেট লাগানো ছিল। পরে হোটেলের বারে অভিযান চালিয়ে 'কয়েকশ' বোতল ব্ল্যাক লেভেল ও রেড লেভেল, ১০০ 'স্যাইপার্স', টিচার্স হুইস্কি জাতীয় মদ এবং 'কয়েকশ' বোতল বিদেশী বিয়ার জব্দ করা হয়েছে।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান যুগান্তরকে বলেন, ২৩ এপ্রিল রাতেও গাড়িটি আটক করতে অভিযান চালানো হয়। সেদিনও কৌশলে হোটেল থেকে গাড়িটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে গাড়িটি আটকের চেষ্টা চলছে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে এসব মদ ও বিয়ার জব্দ করা হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ এসব মদ ও বিয়ার রাখার পক্ষে বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে রিজেন্সি হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হয়নি।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

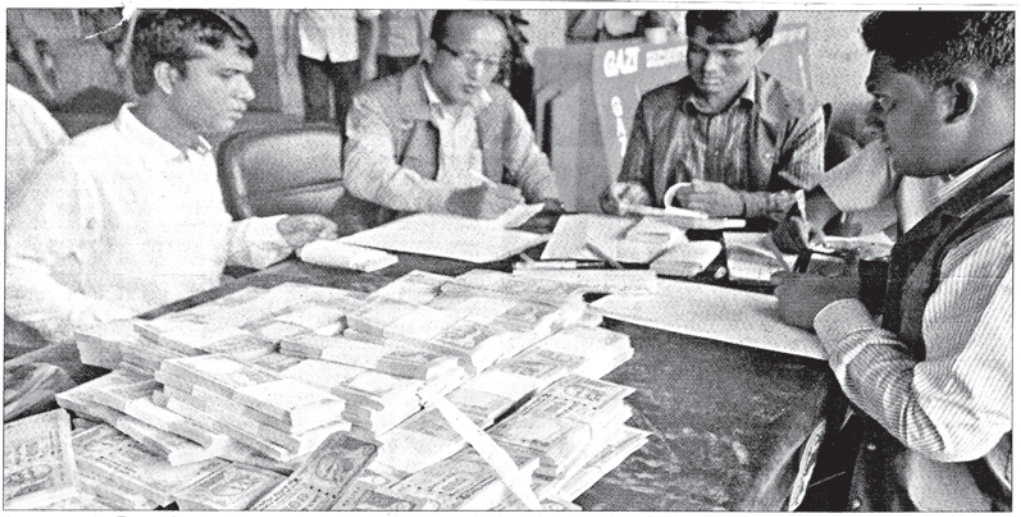

জব্দ করা ভারতীয় রুপি গণনার কাজ চলছে। গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দর চত্বর থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

বাক্স খুলে মিলল পৌনে তিন কোটি রুপি, আটক ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম বন্দরে জব্দ করা পণ্যের চালানের একটি কনটেইনারে ২ কোটি ৭১ লাখ ৭৬ হাজার ৫০০ ভারতীয় রুপি পাওয়া গেছে। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য পণ্যের ঘোষণা দিয়ে কনটেইনারটি দুবাই থেকে আনা হয়। চারটি কার্টনের ভেতরে (বাক্সে) রুপিগুলো রাখা ছিল। এ ঘটনায় কনটেইনার খালাসের দায়িত্বে নিয়োজিত সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।

পণ্যের চালানটি এনেছেন চট্টগ্রামের হাটহাজারীর বাসিন্দা শাহেদুজ্জামান। তাঁকে আটক করা যায়নি। গতকাল সোমবার শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা যে পাঁচজনকে আটক করেছেন, তাঁদের একজন পণ্য খালাসকারী সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠান ফ্লাশ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসাদ উল্লাহ। তাঁর বাবা মোবারক হোসেন মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। আটক অন্য চারজন হলেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আবু শাহাদাৎ মোহাম্মদ সায়েম ওরফে শামীম, আহাম্মদ উল্লাহ তালুকদার, কাওসার আলম ও পণ্যের চালান আনা শাহেদুজ্জামানের ভাই তৌহিদুল আলম।

এর আগে গত জুন মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে সূর্যমুখী তেলের চালানের একটি কনটেইনারে তরল কোকেন শনাক্ত হয়।

গত রোববার সন্ধ্যায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুল্ক গোয়েন্দারা বন্দর চত্বরে কনটেইনারটি জব্দ করেন। তখন ভেতরে থাকা কার্টন খুলে তাতে ভারতীয় মুদ্রা দেখতে পান গোয়েন্দারা। পরে কনটেইনারটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। গতকাল সোমবার দুপুরে বন্দর, কাস্টমস ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাসহ সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে কনটেইনারটি খোলা হয়। কনটেইনারে থাকা ১৬৫টি কার্টনের মধ্যে চারটিতে ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া যায়।

কনটেইনারে করে ভারতীয় রুপি আনার বিষয়ে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান গতকাল দুপুরে বন্দর চত্বরে সাংবাদিকদের বলেন, শাহেদুজ্জামান যেসব পণ্য এনেছেন, তা ব্যক্তিগত ব্যবহার্য পণ্য নয়। চালানটি এসেছে দুবাই থেকে। ভারতীয় রুপি বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য আনা হয়নি। এটি অন্য দেশে যেত। বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহারের জন্যই এই রুপি আনা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে ভারতীয় রুপিগুলো জাল। কারণ, একই নম্বরের একাধিক রুপি পাওয়া গেছে।

তবে বন্দর চত্বরে গতকাল দুপুরে রুপি গণনার সময় উপস্থিত থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'টাকা গণনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তিনটি যন্ত্র আনা হয়েছে। বিদেশি মুদ্রা জাল কি না তা তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করার প্রযুক্তিগত সুবিধা আমাদের কাছে নেই।'

গতকাল দুপুরে বন্দরে গিয়ে দেখা যায়, কনটেইনারটি বন্দরের ৪ নম্বর ফটকের পাশে রাখা হয়েছে। যে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

শেষ পৃষ্ঠার পর

চারটি কার্টনে ভারতীয় রুপি রয়েছে, তা বের করে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে গণনা শুরু করেন শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন। একই সঙ্গে বাকি কার্টনে অন্য কোনো অবৈধ পণ্য আছে কি না, তাও যাচাই-বাছাই করা হয়। রুপি গণনার জন্য বেলা দেড়টার দিকে একটি মুদ্রা গণনার যন্ত্র আনা হয়। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আরও তিনটি মুদ্রা গণনার যন্ত্র আনা হয়।

মুদ্রা গণনা শেষে রাত আটটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সৈয়দ মোকাদ্দেস হোসেন বলেন, '২ কোটি ৭১ লাখ ৭৬ হাজার ৫০০ রুপি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অন্য একটি কার্টন থেকে পাঁচটি সোনার চেইনও জব্দ করা হয়েছে।'

শুল্ক গোয়েন্দা সূত্র জানায়, আটক সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শামীমের বাড়ি সন্দ্বীপের গাছুয়া ইউনিয়নে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতিষ্ঠানটির ওপর নজরদারি থেকে কনটেইনারটি থেকে ভারতীয় রুপি জব্দ করা করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান।

যোগাযোগ করা হলে বন্দর থানার ওসি এ কে এম মহিউদ্দিন সেলিম বলেন, 'মুদ্রা জব্দের ঘটনায় গতকাল রাত নয়টা পর্যন্ত মামলা হয়নি।

যেভাবে কনটেইনারটি আনা হয়: দুবাইপ্রবাসী শাহেদুজ্জামান ব্যক্তিগত ব্যবহার্য পণ্যের ঘোষণা দিয়ে চালানটি এনেছেন। শুল্ক গোয়েন্দারা বলেন, বিমানবন্দরে শাহেদুজ্জামান গত ৩ জুন বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে দুবাই থেকে দেশে আসেন। বিমানবন্দরের ব্যাগেজ ঘোষণায় তিনি উল্লেখ করেন, তার সঙ্গে আনা হয়নি এমন ১৬৫টি কার্টন দুবাইয়ে রয়ে গেছে। এসব কার্টনে থাকা পণ্যের ওজন ৪ হাজার ৭২৫ কেজি। তবে এই ঘোষণা ফরমে দেওয়া স্বাক্ষরের সঙ্গে তাঁর পাসপোর্টে থাকা স্বাক্ষরের মিল পাওয়া যায়নি।

শুল্ক গোয়েন্দারা বলেন, শাহেদুজ্জামান দেশে আসার পর দুবাইয়ের জেবেল আলী বন্দর থেকে কনটেইনারে করে ১৬৫ কার্টন পণ্য জাহাজে তুলে দেওয়া হয়। দুবাই থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ আসা-যাওয়া করে না। এ কারণে প্রথমে জাহাজে করে কনটেইনারটি শ্রীলঙ্কার কলম্বো বন্দরে আনা হয়। সেখান থেকে গত ১৬ সেপ্টেম্বর কনটেইনার জাহাজটি বন্দরে ভেড়ে। এই পণ্য খালাসের জন্য সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠান ফ্লাশ ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে নিয়োগ দেয় শাহেদুজ্জামান। এই পণ্যের ডেলিভারি এজেন্ট ছিল চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের ফরচুন ফ্রেইট লিমিটেড নামের একটি ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার প্রতিষ্ঠান।

জব্দ আরও তিন কনটেইনার: ব্যক্তিগত ব্যবহার্য পণ্য আমদানির ঘোষণায় আনা আরও তিনটি কনটেইনারের খালাস প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান বলেন, 'এসব কনটেইনারের পণ্য খুলে দেখা হবে। এই তিনটি কনটেইনারের পণ্য খালাসকারী এজেন্টও ফ্লাশ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল।

সমকাল
সোমবার
৭ ডিসেম্বর ২০১৫ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২২

শাহজালালে বৈদেশিক মুদ্রাসহ আটক ১

■ সমকাল প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রোববার আনোয়ার মো. মহিউদ্দিন নামে এক যাত্রীর কাছ থেকে ৪৫ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা। মহিউদ্দিন রাত ৮টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে কুয়ালালামপুর থেকে ঢাকায় আসেন। তার শরীর, জুতা ও লাগেজ থেকে মুদ্রাগুলো জব্দ করা হয়। তার কাছে পাওয়া গেছে এক লাখ ৮০ হাজার সৌদি রিয়াল, আট হাজার ৫০০ ইউরো ও ৬৪৪ রিঙ্গিত।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৯ নভেম্বর ২০১৫
৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২

শাহ আমানতে ৮২ সোনার বার উদ্ধার যাত্রী আটক

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে এক যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে সাড়ে ৯ কেজি ওজনের ৮২ পিস সোনার বার উদ্ধার করেছে শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদফতর। বৃহবার সন্ধ্যা ৬টায় ওমান থেকে আসা মো. সাইফুল আলম নামে এক যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে এই সোনা পাওয়া যায়। সাইফুলকে আটক করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা। উদ্ধারকৃত সোনার বাজার মূল্য ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। জানা গেছে, শাহ আমানতে মাসকাট থেকে আসা বিমান ভিটি ওয়াই-৩১১ ফ্লাইটের যাত্রী সাইফুল আলম গ্রিন সিগন্যাল অতিক্রম করার সময় সন্দেহজনকভাবে তার দুটি লাগেজ তল্লাশি করা হয়। সেখানে ৮২ পিস সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

আমাদের সময়
মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ■ ৭ আশ্বিন ১৪২২

চট্টগ্রাম বন্দরে ২ কোটি ৭১ লাখ ভারতীয় জাল রুপি জব্দ, গ্রেপ্তার ৫

চট্টগ্রাম ব্যুরো ●

চট্টগ্রাম বন্দরে জব্দ করা হয়েছে ২. কোটি ৭১ লাখ ৭৬ হাজার ৫০ ভারতীয় জাল রুপি। গতকাল রাত ৮টার দিকে এ ঘোষণা দেন শুল্ক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। গত রোববার ৪টি কার্টন শনাক্ত হওয়ার পর গতকাল নতুন করে কোনো কার্টনে ভারতীয় রুপি পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৫ জনকে আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। তারা হলেন— পণ্যের আমদানিকারক শাহেদুজ্জামানের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

চট্টগ্রাম বন্দরে ২ কোটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ভাই তৌহিদুল আলম, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ফ্ল্যাশ ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান আবু শাহাদা মোহাম্মদ সায়েম ওরফে শামীম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসাদ উলাহ, নাহার ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের মালিক আহাম্মদ উল্লাহ তালুকদার ও গাড়িচালক কাওসার আলম।

এ ছাড়া মো. ছাবের নামে আরেকজনকে সাংবাদিকদের সামনে আনা হলেও তাকে আটক দেখানো হয়নি। ঘটনার সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে বলে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান। ছাবের কাস্টম হাউসে চা-পানি আনা-নেওয়ার কাজ করে।

ভারতীয় মুদ্রার আমদানিকারক শাহেদুজ্জামানকে এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি। গত জুনে তিনি উড়োজাহাজে করে দেশে আসেন। হাটহাজারীর বাসিন্দা শাহেদুজ্জামানকে গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে বলে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান।

ব্যক্তিগত ব্যবহার্য পণ্য আনার ঘোষণা দিয়ে এসব মুদ্রা নিয়ে আসেন হাটহাজারীর শাহেদুজ্জামান। গত রোববার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বন্দর চত্বরে কনটেইনারটি খুলে ৪টি কার্টনে ভারতীয় মুদ্রা জব্দ করা হয়। গতকাল সোমবার দুপুরে কনটেইনারটি খুলে টাকাভর্তি কার্টন ও ব্যবহার্য পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা গণনা শুরু করে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

মুদ্রা গণনার জন্য যন্ত্রও আনা হয়। এরপরও শেষ হয়নি। মুদ্রা গণনার পাশাপাশি ১৬১টি কার্টনও খুলে যাচাই-বাছাই করা হয়। তবে গতকাল বিকাল পর্যন্ত এসব কার্টনে নিষিদ্ধ পণ্য পাওয়া যায়নি। বিকাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্যের কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে বলে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা জানান।

মুদ্রা গণনার সময় বিকালে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান সাংবাদিকদের বলেন, শাহেদুজ্জামান যেসব পণ্য এনেছেন এগুলো কোনোরকম ব্যক্তিগত ব্যবহার্য পণ্য নয়। এই চালানটি এসেছে দুবাই থেকে। ভারতীয় রুপি বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য আনা হয়নি। বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহারের জন্যই আনা হয়েছে। এতে একাধিক দেশ ও একাধিক ব্যক্তি জড়িত। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে ভারতীয় রুপিগুলো জাল। কারণ একই নাম্বারের একাধিক রুপি পাওয়া গেছে।

আটকদের সম্পর্কে মইনুল খান জানান, সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠানটি কালো তালিকাভুক্ত। এ ঘটনায় মূলত ৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

শুল্ক গোয়েন্দা সূত্র জানায়, দুবাইয়ের জেবেল আলী বন্দর থেকে কনটেইনারটি কলম্বো বন্দর হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয় গত ১৬ সেপ্টেম্বর। এমভি প্রসপার জাহাজে করে কনটেইনারটি এ বন্দরে আনা হয়। এরপর গত রোববার সন্ধ্যায় কনটেইনারটি খুলে বিদেশি মুদ্রা পাওয়ার পর জব্দ করে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

The Daily Star

DHAKA **TUESDAY SEPTEMBER 22, 2015**

...an currency notes, suspected to be fake, seized from a container at the Chittagong port yesterday. Customs intelligence officials detained six people in connection with the seizure. *Inset*, a customs official opens a carton to count the notes.

PHOTO: ANURUP KANTI DAS

Major haul of 'fake rupees'

Ctg Port customs seizes Indian Rs 2.71cr from container

STAFF CORRESPONDENT, Ctg

Customs intelligence officials in Chittagong Port seized 2.71 crore Indian rupees packed inside a container Sunday evening and detained six persons in overnight raids.

The rupees are suspected to be counterfeit.

The detainees were ASM Sayem Shamim, chairman of clearing & forwarding (C&F) agent Flash International Ltd; his partner Asad Ullah; Kawsar Alam, driver of Flash International; Ahammad Ullah Talukder; proprietor of another C&F firm Nahar Trading Company; Towhidul Alam, brother of the container's consignee Shaheduzzaman; and Saber, a tea boy at the port.

SEE PAGE 10 COL 4

Major haul

FROM PAGE 16

Asad Ullah, one of the detainees, is the son of war criminal Mobarak Hossain, sources said.

Towhid's brother UAE expatriate Shaheduzzaman was the consignee and recipient of the goods declared as "used household items".

The container arrived at the port on September 16 from UAE via Colombo and the cash, all 500 rupee notes, was hidden in boxes inside the container.

The container was kept sealed for the night and was opened yesterday afternoon so that all the packages inside the container could be inspected.

"All the packages of the container have been checked. Indian money was recovered from four of the packages. The money was kept in four hidden chambers in each of the packages," said Moinul Khan, director general of Customs Intelligence and Investigation Directorate. The total amount was 2 crore 71 lakh 76 thousand and 5 hundred rupees.

He said it was an attempt to smuggle currencies using Bangladesh as transit.

Moinul said they believe the notes were fakes and they were yet to thoroughly examine them.

"All Indian currencies seized in previous drives were found to be counterfeit. We think these currencies could be the same," he said.

Moinul told journalists Flash International Ltd was a blacklisted firm and it had previous records of irregularities.

The customs DG also said the signature of Shaheduzzaman in the baggage declaration form did not match with the one in his passport.

Customs officials said Shaheduzzaman travelled from UAE to Chittagong three to four times between January and July.

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর ২০১৫

বিমানবন্দরে এক কোটি টাকার বেআইনি ওষুধ জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গতকাল সোমবার এক কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি ওষুধ জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। শুল্ক গোয়েন্দা সূত্র জানায়, জব্দ করা ওষুধের ওজন প্রায় ৩০ কেজি।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান *প্রথম আলো*কে বলেন, বেলা ১১টার দিকে বিমানবন্দরে কার্গো গুদাম থেকে ওষুধগুলো জব্দ করা হয়। চারটি কার্টনের মধ্যে ওষুধগুলো পাওয়া যায়। জব্দ করা ওষুধের বেশির ভাগই ক্যানসার ও প্রজনন চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাজ এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আমদানি-নীতি ভঙ্গ করে এসব ওষুধ তুরস্ক থেকে বাংলাদেশে এনেছে। চয়েস এক্সপ্রেস কুরিয়ারের মাধ্যমে তুর্কি এয়ারলাইনসের একটি বিমানে করে ওষুধের চালানটি গত ৬ জুন ঢাকায় আসে। ওষুধগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও নীতিমালা ভঙ্গ করে আনা হয়েছে। এ কারণে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আর্জিনা খাতুনকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১৯ নভেম্বর ২০১৫
৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২

শাহ আমানতে ৮২ সোনার বার উদ্ধার যাত্রী আটক

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে এক যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে সাড়ে ৯ কেজি ওজনের ৮২ পিস সোনার বার উদ্ধার করেছে শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদফতর। বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় ওমান থেকে আসা মো. সাইফুল আলম নামে এক যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে এই সোনা পাওয়া যায়। সাইফুলকে আটক করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা। উদ্ধারকৃত সোনার বাজার মূল্য ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। জানা গেছে, শাহ আমানতে মাসকাট থেকে আসা বিমান ডব্লিউ ওয়াই-৩১১ ফ্লাইটের যাত্রী সাইফুল আলম গ্রিন সিগন্যাল অতিক্রম করার সময় সন্দেহজনকভাবে তার দুটি লাগেজ তল্লাশি করা হয়। সেখানে ৮২ পিস সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

পান করিয়ে, কাস্টমস হলে হাটানো হয়। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা পর ১ নম্বর বেল্টের টয়লেটে গিয়ে নূর আলম তিনটি সবুজ প্যাকেটে মোড়ানো ছয়টি সোনার বার গোয়েন্দাদের বুঝিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, এর বাইরে তার কাছে আরও একশ' গ্রাম সোনার অলঙ্কার ছিল। এ নিয়ে নূর আলমের কাছ থেকে মোট ৭০০ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০ লাখ টাকা।

আমাদের সময়

www.dainikamadershomoy.com

বুধবার ৪ মে ২০১৬ ■ ২১ বৈশাখ ১৪২৩

শাহজালাল বিমানবন্দর

পানি থেরাপিতে যাত্রীর পেট থেকে বের হলো ৬টি সোনার বার

নিজস্ব প্রতিবেদক

সোমবার রাত সাড়ে ১২টা। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস হলের ৬ নম্বর বেল্টের কাছাকাছি ভাবলেশহীনভাবে হাঁটছিলেন মালয়েশিয়া ফেরত যাত্রী নূরে আলম। তার গতিবিধি সন্দেহ হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের চেষ্টা চালান শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। কিন্তু 'আত্মবিশ্বাসী' ভাব দেখিয়ে উল্টো ধমক দেন নূর আলম। এতে সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। পানি থেরাপি পদ্ধতি প্রয়োগ করে বেশ কয়েক গ্লাস পানি পান করানোর পর টয়লেটে নিয়ে গেলে তার মলদ্বারে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা ১০০ গ্রাম ওজনের ৬টি সোনার বার বেরিয়ে আসে। পরে হাতে করে সেগুলো টেবিলে রেখে শুল্ক কর্মকর্তাদের দম্ভোক্তি করে নূরে আলম বলেন, 'এই নিন আপনাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ।'

শুল্ক কর্মকর্তারা জানান, নূরে আলমের কাছ থেকে পাওয়া মোট সোনার পরিমাণ ৭০০ গ্রাম। যার আনুমানিক মূল্য ৩০ লাখ টাকা। এ ছাড়া তার কাছ থেকে ১ হাজার এমএল যৌন উত্তেজক জেলও জব্দ করে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

পানি থেরাপিতে যাত্রীর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

গতকাল দুপুরে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান জানান, সোমবার রাতে মালয়েশিয়া থেকে ওডি ১৬২ উড়োজাহাজে শাহজালাল বিমানবন্দরে নামেন নূরে আলম। রাত সাড়ে ১২টার দিকে ছয় নম্বর বেল্ট থেকে ব্যাগ নিয়ে বের হওয়ার সময় শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের নজরে পড়েন। প্রথমে সোনা লুকিয়ে আনার কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন তিনি। হুমকিও দেন। পরে বুঝতে পারেন উপায় নেই। একপর্যায়ে সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে সেগুলো বের করার জন্য নূরে আলমকে চাপ দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারেরও ভয় দেখানো হয়। শরীরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুকানো আছে– এ কথাও বোঝান কর্মকর্তারা।

Luxury car seized over tax dodging

STAFF CORRESPONDENT

Customs intelligence yesterday seized from capital's Banani area a luxury sports utility car brought into the country dodging over Tk 8 crore in taxes.

Acting on a tip-off, a Customs Intelligence team raided the office of Versatile Automobile located at block-G in Banani and seized the white AUDI R8, Moinul Khan, director general of customs intelligence, told The Daily Star.

The officials had been keeping a close watch on movement of the car since last Saturday, he added.

With the yesterday's seizure, Customs intelligence seized 14 luxury vehicles over last couple of months that had dodged taxes.

Moinul said the car was brought in

Luxury car

FROM PAGE 16

through Mongla Port in 2013 declaring it as a 2500cc Audi TT. However, the officials found that it was actually an Audi R8 with a 5200cc engine.

The car was imported from UK for Auto One car showroom in Turag in the capital. The importers paid 451 percent taxes on a falsely claimed price of $32,441.

The actual price of the R8 was $162,000 and its tax should have been 841 percent of the price.

"The owner evaded around Tk 8.5 crore in tax with the false declaration," he said, adding that the car was yet to be registered.

Moniul Khan said the owner of the Auto One Sajedur Rahman Sumon had sold it to a person but the person recently returned it to Sumon amidst the Customs Intelligence drive against illegally imported cars.

Sumon was trying to sell the car again.

The official said they would take legal action against the importers and user of the car and also wrote to the NBR to take action against the Mongla Port officials concerned who helped the unscrupulous businessman import the car.

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার । ১৯ নভেম্বর ২০১৫ । ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২

শাহ আমানতে ১০ কেজি সোনাসহ যাত্রী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় ১০ কেজি ওজনের ৮২ পিস সোনার বারসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে কাস্টমসের গোয়েন্দা বিভাগ। যার আনুমানিক মূল্য সাড়ে চার কোটি টাকা। আটক ব্যক্তির নাম সাইফুল আলম (৪৬)। তার বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজানে। জানা গেছে, ওমানের রাজধানী মাস্কাট ছেড়ে আসা একটি বিমানে করে তিনি শাহ আমানত বিমানবন্দরে আসেন। গতকাল সন্ধ্যা ৬টার দিকে সাইফুল আলম লাগেজ ও ব্যাগ নিয়ে বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার সময় তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয় কর্তব্যরত কর্মকর্তাদের। পরে তার ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১০ কেজি ওজনের ৮২ পিস অবৈধভাবে আনা সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY APRIL 6, 2016

Customs intelligence cracks down on illegally imported cars

STAR BUSINESS REPORT

Customs intelligence officials have revved up their efforts to trace about 150 vehicles that were temporarily brought in under a zero-duty import privilege extended to tourists but are yet to be shipped back.

Called the Carnet de Passage, the facility allows tourists to bring in their vehicles without payment of customs duties provided they take them back when they leave the country.

Moinul Khan, director general of the Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID), said nearly 300 cars were allowed entry to Bangladesh under the privilege.

Of the 300 vehicles, about 150 cars were not taken back, depriving the state of revenue.

"So far, we have detained three such cars that were brought without duty payment under the Carnet de Passage. We are chasing the rest of the cars for duty evasion."

Khan's comments came at a press briefing after the seizure of a BMW X-5, a luxury sports utility vehicle, on April 4 from the residence of Kazi Rezaul Mustafa at Gulshan 2 on allegations of duty evasion.

The CIID said it has received allegations that the cars that were brought under the Carnet de Passage and have been in use with fake documents.

"The latest seizure of the vehicle is based on one such allegation," Khan said.

Customs intelligence officials said the car was imported through false declaration and its registration was obtained with fake documents.

The registration of the car, Dhaka Metro Gha-14-0343, has also been renewed every year, according to the customs intelligence directorate.

"We will enquire with the BRTA how the car was registered," Khan said, adding that his office did not find documents that matched the physical condition of the car and its model.

For example, the registration of the car was obtained by claiming its engine number was B20B-1129263. But various documents related to the vehicle show that the engine number is 27595077, according to the CIID.

It shows that the car was imported ille- gally without payment of duty and taxes the CIID said, adding that the value of the car, including duty and taxes, would be Tk 3 crore.

Khan said the vehicle was imported by a person from Sylhet and was later sold on.

Contacted, Mustafa said in a text message that they purchased the car from Rukuh Miah of Sylhet, who deceived them by saying that all documents were okay.

"It was in our garage and was not used as its registration was not okay."

Previously, the CIID detained on Mercedes Benz and a BMW on allegation of illegal import.

In addition, it seized four cars importe by the local office of budget carrie Flydubai on allegations of duty evasion.

READ MORE ON B

FROM PAGE B1

Saiful Haque, chairman of Sky Aviation Services, the general sales agent of Flydubai, said the cars were taken away for the sake of a proper investigation. He said he now wants to send the cars out of Bangladesh.

Khan said those who are using illegally imported cars should surrender to the customs intelligence to avoid stern legal measures.

"We have taken steps to seize the cars that are yet to be taken back. We encourage people to surrender the vehicles voluntarily. If we seize the cars we will take stern legal action."

FE The Financial Express
Monday, April 11, 2016

Customs seizes Mercedes car from Sylhet

FE Report

Customs Intelligence (CI) in its 36-hour drive seized a luxury Mercedes car from the possession of London expatriate Abdul Malek in Sylhet at midnight on Sunday.

The car has been missing since Friday night after the car owner came to know about a search warrant issued by CI. An alert was also issued in Sylhet to seize the car.

The car worth Tk 50 million was brought in 2012 under the carnet facility without paying customs duty. But it was not sent back within the stipulated time. The person was driving the car without its registration.

The CI team on Friday morning raided his residence on Airport Road in Sylhet to seize the car. The team also conducted several raids in different places to seize the car.

An announcement was made along with the photo of that vehicle through the media to get information about the car 2006-Model CDI Elegance, CC 1980 and chassis WDC 2030072R228110. It was finally recovered from his possession.

A legal action is underway. The carnet number is M70NS number do

আমাদের সময়
সোমবার ১১ এপ্রিল ২০১৬ ■ ২৮ চৈত্র ১৪২২

সিলেটে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবহার করা 'মার্সিডিজ বেঞ্জ' আটক

সজল ছত্রী, সিলেট ●

দুইদিন অভিযানের পর অবশেষে সিলেট নগরীর আম্বরখানাস্থ বিএম টাওয়ারের চেয়ারম্যান আব্দুল মালেকের মালিকানাধীন ৫ কোটি টাকা মূল্যের 'মার্সিডিজ বেঞ্জ' গাড়িটি (ঢাকা-৬১৪/ও) আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিএম টাওয়ারের সামনে থেকে গাড়িটি আটক করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের একটি টিম। গত শুক্রবার টাওয়ারের বি-৩ ফ্লাটের পার্কিং থেকে গাড়িটি হঠাৎ করেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সিলেটের সহকারী পরিচালক প্রভাত কুমার সিংহ জানান, গত বৃহস্পতিবার (৭ এপ্রিল) বিকালে আম্বরখানাস্থ বিএম টাওয়ারের গিয়ে বি-৩ ফ্লাটের পার্কিংয়ে একটি 'মার্সিডিজ বেঞ্জ' গাড়ি (ঢাকা-৬১৪/ও) দেখতে পায় শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের একটি টিম। টিমের সদস্যরা নিশ্চিত হন টাওয়ারের দ্বাদশ তলার বাসিন্দা প্রবাসী আব্দুল মালেকই গাড়ির মালিক। এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

সিলেটে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) এ সময় শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা এবং জালিয়াতির মাধ্যমে কাস্টমস দলিলাদি প্রস্তুত করে বিআরটিএ'র রেজিস্ট্রেশন করা ওই গাড়িটির স্থিরচিত্র ও ভিডিও করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের

The Daily Star 5 DHAKA WEDNESDAY APRIL 13, 2016

BMW with fake papers seized in capital

STAFF CORRESPONDENT

A black BMW manufactured in 2003 and costing around Tk 5 crore was seized from a house in Block F of the capital's Banani around 6:00pm during a raid, said customs intelligence.

The vehicle's registration number and fitness certificate are fake, said sources in customs intelligence, adding that the owner bought it three years back.

Moinul Khan, director general of customs intelligence, said they acted on a tip-off and a deed showed that it was sold by a man from Sylhet.

Dhaka Metropolitan Police Assistant Commissioner (Gulshan zone) Rafiqul Islam said he was unaware of the incident.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১২ বৈশাখ ১৪২৩
২৫ এপ্রিল ২০১৬

এমপি কোটায় আনা পোরশে গাড়ি আটক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সংসদ সদস্যদের (এমপি) কোটায় আনা একটি দামি গাড়ি বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগে আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা দল। ২০০৬ সালের ১৬ অক্টোবর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম আব্দুল মতিন পোরশে মডেলের ওই গাড়িটি এমপি কোটায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করেন। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মঈনুল খান জানান, গাড়িটি আনার তিন মাসের মাথায় তা অন্য আরেকটি কোম্পানির কাছে বিক্রি করা হয়। যা এনবিআরের আদেশের লঙ্ঘন। কেননা এ ধরনের শুল্কমুক্ত সুবিধার গাড়ি ৪ বছরের আগে হস্তান্তর করা যায় না। ৯২ লাখ টাকা মূল্য ঘোষণায় আনা ওই গাড়ির শুল্ক-করের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। গুলশানের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ওই গাড়ি আটক করা হয়।

FE The Financial Express
Monday, April 25, 2016

CI seizes Porsche jeep in city

A team of Customs Intelligence (CI) seized a luxury Porsche jeep by raiding a house at Gulshan in the capital on Sunday for allegedly importing it misusing MP quota. Former home minister Abdul Matin of Narayanganj-1 imported the 4,500 cc jeep in 2006. Later, he sold it to a businessman, violating the SRO condition without paying applicable customs duty amounting to about Tk 50 million. — FE Report

FE The Financial Express | Wednesday, April 13, 201

CI seizes another BMW from Banan

FE Report

Customs Intelligence (CI) seized another BMW X5 car worth Tk 50 million from Banani in the city on Tuesday on charge of misusing carnet facility.

The owner of the car has been using a fake registration number Dhaka Metro Gha 13-1957. The black-coloured car was manufactured in 2003.

Under the carnet facility, a foreign tourist can import a vehicle to the country without customs duty for a certain time. There are nearly 150 luxurious cars that were brought to the country using the facility, and were not sent back afterwards.

CI officials said the BMW car has not been sent back within the stipulated time.

Name of the owner of the recently seized car is Zahid Hossain, an owner of Boishakhi TV Bhaban. He is involved in construction business.

Mr Hossain bought the car three years back from one Zafor Ahmed of Sylhet under a deed agreement. The vehicle was recovered from House 112, Road Block F, Banani.

A CI team verified its ness and blue-book Bangladesh Road Trans Authority (BRTA), found them fake.

Earlier, CI seized more BMW cars that also brought under c facility.

Meanwhile, on Tu midnight, CI off detained an outgoing pa ger with 0.1 million riyal at Hazrat Sha International Airport departing for Singapor

doulot_akter@yah

বুধবার ১৩ এপ্রিল ২০১৬ | ৩০ চৈত্র ১৪২২ | যুগান্তর

বনানী থেকে বিএমডব্লিউ গাড়ি জব্দ

যুগান্তর রিপোর্ট

কার্নেট সুবিধায় আনা একটি বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ গাড়ি রাজধানীর বনানী থেকে জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। মঙ্গলবার বিকালে বনানীর এফ ব্লকের ৩ নম্বর সড়কের ১১২ নম্বর বাড়ি থেকে গাড়িটি জব্দ করা হয়। এর মালিক জাহিদ হোসেন। তিনি বৈশাখী টিভি ভবনের মালিক বলে শুল্ক গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান যুগান্তরকে জানান, কার্নেট সুবিধায় আনা বিএমডব্লিউ গাড়িটি ফেরত না পাঠিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়। বিআরটিএ থেকে রেজিস্ট্রেশন না নিয়ে ভুয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করছিল। গাড়িটির নম্বর দেখানো হয়েছে ঢাকা মেট্রো গ ১৩-১৯৫৭। কালো রঙের গাড়িটি বিএমডব্লিউ এক্স-৫ ২০০৩ মডেলের। জাহিদ হোসেন তিন বছর আগে সিলেটের জাফর আহম্মেদ নামে ব্যক্তির কাছ থেকে গাড়িটি ক্রয় করেন বলে জানিয়েছেন। তিনি গাড়িটির যে ব্লু-বুক, ফিটনেসসহ অন্যান্য কাগজপত্র দেখিয়েছেন সেগুলোও ছিল ভুয়া।

রিয়ালসহ গ্রেফতার ১ : হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক লাখ সৌদি রিয়ালসহ মো. আনিস নামে এক যাত্রীকে আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও অধিদফতর। সিঙ্গাপুর থেকে আসা আনিস ময়মনসিংহের নুরুল ইসলামের ছেলে। সৌদি রিয়াল ছাড়াও তার লাগেজ থেকে ৬০২ সিঙ্গাপুর ডলার...

আমাদের সময় | রোববার ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ■ ২২ ভাদ্র ১৪২২

শাহজালালে টয়লেট থেকে ১৬ কেজি স্বর্ণ জব্দ, একজনের দণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১৬ কেজি স্বর্ণ জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এ সময় এসএম নুরুল ইসলাম নামে একজনকে আটক করা হয়। পাস ছাড়া বিমানবন্দরে ঢোকার অপরাধে তাকে এক মাসের কারাদণ্ড দেন বিমানবন্দরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুফ। গত শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ইমিগ্রেশনের টয়লেট থেকে এ স্বর্ণ জব্দ করা হয়।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মঈনুল খান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশনের টয়লেট থেকে ১৬ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। ভিডিও এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

শাহজালালে টয়লেট থেকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ফুটেজে নুরুল ইসলাম নামে একজনকে টয়লেটের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। পরে সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করা হয়। বিমানবন্দরের বেসরকারি বর্জ্য পরিচ্ছন্নকারী প্রতিষ্ঠান নাহি... পরিচালক তিনি। স্বর্ণের চালান আটকের অদূরে ছিলে... বিমানবন্দরের পাস ছিল না। পরে নিরাপত্তা পাস ছাড়া সংর... অপরাধে তাকে এক মাসের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত... সময়ে মামলার তদন্তে নুরুল ইসলামের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া... নেওয়া হবে। এদিকে ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে সিভিল... বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বেশ কয়েকজন কর্মচারীর গতিবি... তাদের ওপরও নজর রাখছে গোয়েন্দারা। এদের ম... আমিনুলউল্লাহ ভূইয়া অন্যতম। ভিডিওচিত্রে রহস্যময় চলাফের... তালিকায় রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ● সোমবার ২৫ এপ্রিল ২০১৬ । ১২ বৈশাখ ১৪২৩

এমপি কোটায় আনা পোরশে গাড়ি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে সংসদ সদস্য কোটায় শুল্কমুক্ত আমদানি করা বিলাসবহুল একটি পোরশে গাড়ি জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ। তবে ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি।

কাস্টমস গোয়েন্দা সূত্র জানায়, গতকাল বেলা ১১টার দিকে গুলশান-২ নম্বরের আজাদ মসজিদের পাশের ২৪ নম্বর সড়কের ১১ নম্বর বাসায় অভিযান চালিয়ে ৪৫০০ সিসির একটি পোরশে জিপ জব্দ করা হয়। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মতিন চৌধুরী এমপি কোটায় ওই গাড়িটি আমদানি করেছিলেন। ২০০৬ সালের ১৬ আগস্ট গাড়িটি বাংলাদেশে আনা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ৪ বছর ব্যবহারের পর এসব গাড়ি অন্য কারও মালিকানায় বিক্রি করা যায়। কিন্তু আবদুল মতিন কেনার ৩ মাসের মাথায় ২০০৭ সালের ২১ জানুয়ারি গাড়িটি প্রেস্টিজ মটরসের কাছে ৮০ লাখ টাকায় বেচে দেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি এটি এবিকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কাছে ৯২ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়। গাড়িটিতে প্রায় ৫ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়েছে বলে জানান কাস্টম গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

যুগান্তর | রোববার ৩ এপ্রিল ২০১৬ | ২০ চৈত্র ১৪২২

শাহজালালে ৮৭৫ গ্রাম সোনাসহ আটক ১

যুগান্তর রিপোর্ট

হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৮৭৫ গ্রাম সোনাসহ মোক্তার হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদফতর। শনিবার সন্ধ্যায় তাকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক মূল্য ২০ লাখ টাকা।

জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে আসা বিজি-০১৮৭ ফ্লাইট তল্লাশি চালিয়ে ওই সোনার বার উদ্ধার করা হয়। আটক মোক্তারের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ।

বুলেটিন
বোর্ড

আর্ন্তজাতিক শুল্ক দিবস (২০১৬) উপলক্ষ্যে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্তকালীন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে অন্যান্যদের মধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান এবং এই দপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে IPR (Intellectual Property Rights) সংক্রান্ত সেমিনারে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ এ আইডিইবি ভবনের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ‘চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধে করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

এমপি এর

বক্তব্য রাখছেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

সেমিনারে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন ব্যবসায়ী

সেমিনারে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে
মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি এর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের
সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি এই দপ্তরের কর্মকর্তাদের
নিকট থেকে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত পুণর্গঠিত চোরাচালান নিরোধ কেন্দ্রিয় টাস্কফোর্সের প্রথম সভা

“Strengthening Regional Co-operation For Wild Life Protection” প্রজেক্টের আওতায় **United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)** এর **Criminal Intelligence Specialist Mr. Miroslav Prljevic** ২৩ জুন ২০১৬ এ এই দপ্তর পরিদর্শন ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন

আগস্ট ২০১৫ এ 'গোয়েন্দা কার্যক্রমে কাস্টমস কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত বাণিজ্যভিত্তিক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখছেন এই দপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

বাণিজ্যভিত্তিক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

ইন্দোনেশিয়ার জোগিকার্তায় রাইলো এপি এর বাৎসরিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এই দপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

মার্চ ২০১৬ এ সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া হতে আগত রাইলো এপি'র সদস্যগণ
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর পরিদর্শন কালে

প্রতিনিধি দলকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে প্রতিনিধি দল

ভুটানের থিম্পুতে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে অনুষ্ঠিত **First Joint Working Group Meeting For Customs Officials Program** এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মোঃ ফিরোজ শাহ আলম ও এই দপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

মে ২০১৬ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষনঃ
FBI (Federal Bureau of Investigation), ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসেস
এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের সাথে এই দপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

ডিসেম্বর ২০১৫ এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সভায় শুল্ক গোয়েন্দার ভারতীয় পক্ষ **DRI (Directorate of Revenue Intelligence)** এর মহাপরিচালক নজীব শাহ এর কাছ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন এই দপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

জুলাই ২০১৬ এ শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত **6th Interpol Counter Nuclear Smuggling Workshop** শীর্ষক কর্মশালায় এই দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক খালেদ মোহাম্মাদ আবু হোসেন

নভেম্বর ২০১৫ এ সিউল, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত **Regional Green Customs Workshop in Asia and Pacific** শীর্ষক কর্মশালায় এই দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক খালেদ মোহাম্মাদ আবু হোসেন

নভেম্বর ২০১৫ এ চিওনান, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত Seminar on Customs Modernization for Bangladesh Customs Officials বিষয়ক সেমিনারে এই দপ্তরের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ সফিউর রহমান

জানুয়ারি ২০১৬ এ মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত **Regional Workshop on the Revenue Package and Advance Rulings** শীর্ষক কর্মশালায় এই দপ্তরের উপ-পরিচালক এস.এম শামীমুর রহমান

মে ২০১৬ এ স্পেনে অনুষ্ঠিত **Invitation to Visit Spain for Per-shipment Inspection for 18 Unit Various Type Diesel Generator Set at Spain Factory of Himoinsa** শীর্ষক পরিদর্শন কার্যক্রমে এই দপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকির হোসেন

জুলাই ২০১৬ এ সিউল, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত রাইলো এপি'র Capacity Building Program এ এই দপ্তরের ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন

মে ২০১৬ এ ভারতের ফরিদাবাদে অনুষ্ঠিত Combating Counterfeiting and Piracy শীর্ষক অঞ্চলিক কর্মশালায় এই দপ্তরের সহকারী পরিচালক ইমাম গাজ্জালী

অক্টোবর ২০১৫ এ থাইল্যান্ডের ফুকেটে অনুষ্ঠিত Interpol Radiological Nuclear Table Top Exercise
শীর্ষক কর্মশালায় এই দপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ তারেক মাহামুদ

হংকং এ অনুষ্ঠিত Post-operational Workshop Under Project CADS
শীর্ষক কর্মশালায় এই দপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ জাকারিয়া

চোরাচালান প্রতিরোধ ও রাজস্ব সুরক্ষায় কাস্টমস গোয়েন্দার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি

মাদকদ্রব্য ও নেশা বিরোধী কাউন্সিল

Manobik Madok Drabya-O-Nesha Birodhi Council
Reg. No. Dha-06342

সূত্র: মানবিক/২০১৬/১৫, ২৪ মে ২০১৬

বরাবর,
ড. মইনুল খান
মহাপরিচালক
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর
আইভিইবি ভবন, কাকরাইল
ঢাকা।

বিষয়: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২০ লক্ষ টাকার বিদেশী সিগারেট জব্দ করায় অভিনন্দন জ্ঞাপন।

মহোদয়,

গত ১৯ মে ও ২১ মে ২০১৬ তারিখে যথাক্রমে দৈনিক বনিক বার্তা ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মাধ্যমে অবগত হয়েছি যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক ২০ লক্ষ টাকার বিদেশী সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং রাজস্ব উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম ও মংলা স্থল বন্দর দিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে একটি চোরাই সিন্ডিকেট এ সকল সিগারেট বাংলাদেশে প্রবেশে কাজ করে থাকে। এ সকল চোরাই সিগারেট বন্ধে বা আটক করতে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরণের সফল কার্যক্রমের জন্য মানবিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

উল্লেখ্য, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সরকার ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) প্রনয়ন করেছে। এই আইনের ১০ ও ১১ ধারায় বিদেশ হতে আমদানীকৃত সিগারেটে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বাংলা ভাষায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া বিদেশী সিগারেটের উপর ৪৫০% কর আরোপের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে একটি কুচক্রীমহল বিভিন্ন দেশের নকল সিগারেট এবং বিদেশী সিগারেট চোরাই পথে আমদানী করে ব্যাপকভাবে বাজারজাত করছে। ফলে বিদেশী সিগারেট সস্তা হওয়ায় যুবসমাজ বিদেশী সিগারেটের উপরে আসক্তি হয়ে পড়ছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য যেমন মারাত্মক হুমকি তেমনি রাজস্ব বৃদ্ধিতেও এক ধরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। একইসাথে ব্যাহত হচ্ছে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩) এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সরকারি পর্যায়ে কঠোরভাবে এ চোরাচালানকৃত সিগারেট বাজারজাত বন্ধ করা না হলে আগামীতে সিগারেটের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, সরকারের জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে সম্প্রতি শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক চোরাচালানকৃত সিগারেট জব্দ করায় মানবিকের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে মানবিক আশা করে। পরিশেষে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের আগামী কার্যক্রম আরোও সফলভাবে সম্পন্ন হবে মানবিক এই প্রত্যাশা করে।

ধন্যবাদসহ

Parvin

এডভোকেট পারভীন আক্তার
নির্বাহী পরিচালক

সংযুক্তি: পত্রিকার কাটিং

অনুলিপি:
১. সচিব ও সভাপতি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সমন্বয়কারী ও যুগ্মসচিব, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, আনসারী ভবন (৫ম তলা), ১৪/২, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৩. সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

Present Address:
11, Purana Polton, Ibrahim Mansion
(4th Floor), Room-508, Dhaka-1000

~~Secretariat: R-4/A, H-49, (Ground Floor) Dhanmondi, Dhaka-1209, Reg-Office: 8/A-B, Gausul Azam Supper Market (1st Floor), Nilkhet, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh~~
~~GPO Box: 102, Phone: +88029674256,~~ E-mail: manobik@btcl.net.bd, Web: www.manobik.net

www.dainikamadershomoy.com

আমাদের সময়

বুধবার ১ জুন ২০১৬ ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

সাক্ষাৎকারে এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান

আমাদের সময় : চোরাচালান রোধে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কাজ করছে। তবে তাদের জনবল সংকট রয়েছে; সে বিষয়ে আপনার ভাবনা কী?

নজিবুর রহমান : এনবিআরের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুল্ক গোয়েন্দার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। চোরাচালান দমন, অবৈধ সোনা আটক, গাড়ি আটক, অন্য অবৈধ পণ্য আটকের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। আমাদের অফিসারদের সক্ষমতা বা মেধার কোনো অভাব নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। আমরা সেটাই করার চেষ্টা করছি। তবে জনবল এবং রিসোর্সের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তা সমাধানে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সীমিত জনবল নিয়েই তারা দৃশ্যমান কাজ করছে। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। তবে উন্নত বিশ্বে অনুসৃত নীতি 'Doing more with the less'-এর আদলে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

- ফেরদৌসী মাহবুব

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নাই-এটা সর্বজন স্বীকৃত। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের জন্য শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। অফিসে যোগদানের সাথেই কাজে নামানোর গতানুগতিক ধারায় না চলে কর্মকর্তাদের জন্য যোগদান পরবর্তী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে শুল্ক গোয়েন্দা। আমরা কী করি, কেন করি, কিভাবে করি, কোথায় আমাদের কাজের অধিক্ষেত্র ও গুরুত্ব ইত্যাদি অর্থাৎ শুল্ক গোয়েন্দার সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি কাস্টমস, গোয়েন্দা ও তদন্ত সম্পর্কিত সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। শুল্ক গোয়েন্দা তার কাজের ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ও বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মশালার সফল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। এসব প্রশিক্ষণে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন কাস্টম হাউসের কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

❖ চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধে করণীয় শীর্ষক সেমিনার

- স্থান ও তারিখঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ আইডিইবি ভবনের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তন
- সভাপতিঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
- প্রধান অতিথিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এম.পি
- বিশেষ অতিথিঃ অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এম.পি., স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ড. মো: মোজাম্মেল হক খান এবং এফবিসিসিআই এর সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমাদ।
- দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে রাজস্ব আহরণসহ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন, এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম এবং চোরাচালান প্রতিরোধে কাস্টমস এর ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ক উক্ত সেমিনারে শুল্ক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন, ব্যবসায়ীবৃন্দ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

❖ গোয়েন্দা কার্যক্রমে কাস্টমস কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- স্থান ও তারিখঃ ৩০-৩১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুম।
- মোট প্রশিক্ষণার্থীঃ শুল্ক গোয়েন্দাসহ বিভিন্ন দপ্তরের ৪৪ জন কর্মকর্তা।
- প্রশিক্ষকঃ বাংলাদেশ ব্যাংক বিএফআইইউ, দুর্নীতি দমন কমিশন, সিআইডি, ডিজিএফআই, এনএস আই, র‍্যাব, বিজিবি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ
- আলোচিত বিষয়ঃ গোয়েন্দা কার্যক্রমের মূলনীতি ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধে গোয়েন্দা কার্যক্রমের ভূমিকা, কাস্টমস অপরাধের বিভিন্ন দিক ও কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান, এন্টি মানিলন্ডারিং আইন ২০১২, মানি লন্ডারিং মামলায় অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে বিভিন্ন ফোর্সের সহায়তা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

❖ বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

- সম্প্রতি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন ২০১৫- এ মানিলন্ডারিং সহ ০৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে কাস্টমসকে। এ বিষয়ে সক্ষমতা অর্জনের জন্য আইনটি পাশের পরই শুল্ক গোয়েন্দা বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

- মোট প্রশিক্ষণঃ বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে তিনটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
- স্থান ও তারিখঃ ২০-২১ জানুয়ারি, ২৪-২৫ মে ও ১৫-১৬ জুন/২০১৬ তারিখে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুম।
- মোট প্রশিক্ষণার্থীঃ কাস্টমস গোয়েন্দাসহ বিভিন্ন দপ্তরের ১৫৩ জন কর্মকর্তা।
- প্রশিক্ষকঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ, দুর্নীতি দমন কমিশন, সিআইডি এবং বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ।
- আলোচিত বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান, মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি, মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলা দায়ের, চার্জশিট, চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি, মানিলন্ডারিংসংক্রান্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মামলা কার্যক্রম উপস্থাপন পদ্ধতি, মানিলন্ডারিং অভিযোগ দায়ের পরবর্তী প্রসিকিউশন পদ্ধতি, মনিটরিং, মামলা দায়েরের বিভিন্ন স্তর এবং পরবর্তী ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির এসব প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। সময়োপযোগী এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তুখোড় সব গোয়েন্দা কর্মকর্তা বেরিয়ে আসবে, যা গোয়েন্দা কার্যক্রমকে আরো শানিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এসব কর্মকর্তাদের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে শুল্ক গোয়েন্দা।

- **ফেরদৌসী মাহবুব,** সহকারী পরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

নিরাপদ বানিজ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
শুল্ক গোয়েন্দা
গোয়েন্দা কাহিনি ও প্রবন্ধ

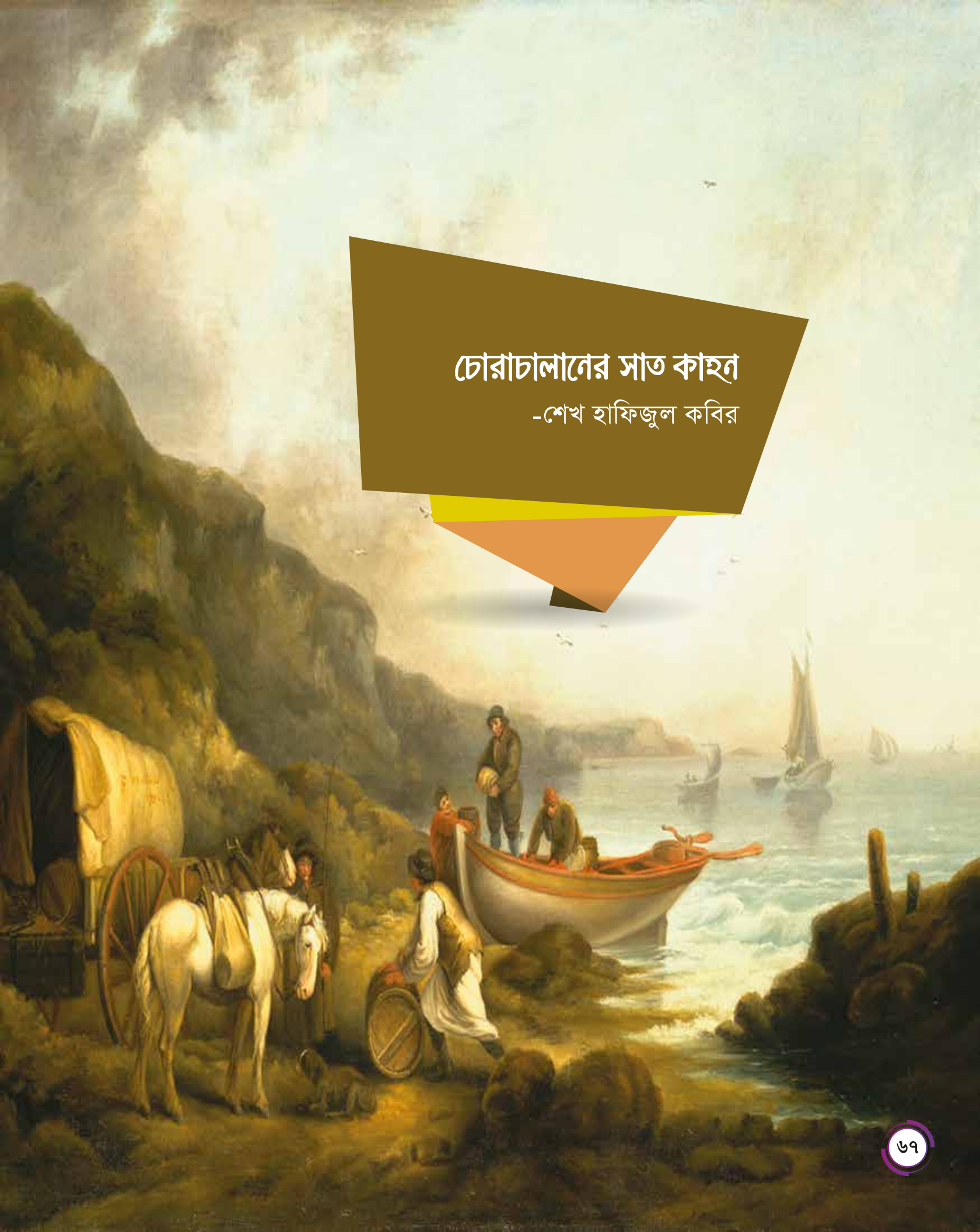

চোরাচালানের সাত কাহন

-শেখ হাফিজুল কবির

চোরাচালান আদিম কার্যকলাপ নয়। আধুনিক রাষ্ট্র সংজ্ঞা সৃষ্টি, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অধিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং হরেক রকম নতুন পণ্য উৎপাদনের ফলে ধীরে ধীরে চোরাচালানের উদ্ভব। বৃটিশ ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চোরাচালান বা 'ব্লাকের মাল' বলে একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই চোরাচালান আর আজকের চোরাচালান এক না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধজনিত কারণে উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় বৃটিশ রাজকে তখন খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হয়। বিশেষ করে 'মাখন' রেশনের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে খোদ বৃটেনে চোরাপথে রেশনের মাখন বাজারে বিক্রি শুরু হয় আর তখনই চোরাচালান বা 'ব্লাকের মাল' শব্দটি বাজারে চালু হয়। তখন ভারতে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং 'মন্বন্তর' নামে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তখন ভারতেও খাদ্য রেশনিং চালু করা হয়। এই রেশনিং এর ওপর আবুল মনসুর আহমেদ সাহেবের একটি বিখ্যাত উপন্যাসও আছে। তখন এই রেশনের চাল গুদামজাত করে বেশি দামে বিক্রি করে অনেকে বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক হন। দানবীর রনদা প্রসাদ সাহাও এইভাবে বিত্তবান হয়ে কুমুদ্বিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করেন এবং মির্জাপুরে হাসপাতাল ও মেয়েদের স্কুল নির্মাণ করে দানবীর উপাধি পান। 'কুমুদ্বিনী' তার মায়ের নাম। তখনই ভারতে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি না করে ফুড ডিপার্টমেন্ট হয়। বর্তমানে চোরাচালান হলো একদেশ থেকে অন্যদেশে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে পণ্যচালান পাঠান এবং তা বিক্রির মাধ্যমে বিত্তশালী হওয়া। যখন যে দেশে যে পণ্যের ঘাটতি থাকে তা-ই চোরাচালান হয়। আবার বাজারে নতুন কোনো পণ্য আসলে তাও চোরাচালান হয়। একসময় ভি.সি.আর, ভি.ডি.ও, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন আমাদের দেশে প্রচুর চোরাচালান হয়েছে। বর্তমানে দেশে চোরাচালানের তালিকায় প্রথম দিকে আছে ভারতীয় পোশাক, সিগারেট, ফেন্সিডিল, মাদকদ্রব্য ও গবাদি পশু। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, গবাদি পশু আমদানিতে কোনো শুল্ক-কর না থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গবাদি পশু চোরাচালান হয়। তার কারণ ভারত থেকে গরু রপ্তানি নিষিদ্ধ। ফলে বৈধ পথে ভারত থেকে গরু আসার কোন উপায় না থাকায় গরু চোরাচালান হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে সূতি শাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ভারত থেকে সূতির শাড়ি চোরাচালান হয়। ভারতীয় শাড়ির মান উন্নত না হলেও ছাপা ও কারুকাজ বৈচিত্র্যময় হওয়ায় তার চাহিদা বেশি। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে এদেশে প্রচুর সোনা চোরাচালান হয়। এই সোনা চোরাচালানের মূল কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলো আসে অস্ত্র ও মাদকদব্যের মূল্য পরিশোধের জন্য। এই দুই পণ্য বেচাকেনায় কোনো দেশের মুদ্রা ব্যবহৃত হয় না দুই কারণে-পরিমাণগত ব্যপকতা এবং জাল মুদ্রার ভয়ে।

সমস্ত বিশ্বে চোরাচালান এখন একটি সাধারণ কিন্তু সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগজনক ঘটনা। সমস্ত বিশ্ব দুটি পণ্য চোরাচালান রোধে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে, আর তা হলো মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র। মাদকদ্রব্য চোরাচালানের ভয়াবহতা এতখানি যে, চোরাচালানিরা নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে এবং সরকারকে তার প্রতিদমন ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। পুতুলের মধ্যে ভরে, পেটের মধ্যে পলিথিনের প্যাকেটে ভরে মাদক আনা এখন পুরনো হয়ে গেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে তেলের সাথে কোকেন মিশিয়ে আনার ঘটনা প্রমাণ করে যে, চোরাচালানিরা থেমে নেই। এক্ষেত্রে আমাদের শুল্ক গোয়েন্দা দপ্তর অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ধন্যবাদ শুল্ক গোয়েন্দা দপ্তর। পাম অয়েল ড্রামের মধ্যে ভরে মটর পার্টস আনা, পুরনো কাপড়ের গাইটের মধ্যে করে শাড়ি আনা অনেক পুরনো ব্যাপার কিন্তু তা যে থেমে গেছে তা নয়। এগুলো এখনো চলছে। তাই সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

যাক, এখন সামান্য কয়েকটা সাধারণ চোরাচালানের গল্প বলে (গল্প হলেও সত্যি) শেষ করি। আমেরিকা কানাডার বর্ডারের শহরগুলোর লোকেরা অভিনব চোরাচালান করে থাকে। জি.এল.টি থাকার কারণে টুথপেস্ট, সাবান, ডিটারজেন্ট ইত্যাদির দাম আমেরিকার তুলনায় কানাডায় বেশি। ফলে সীমান্তবর্তী কানাডার লোকেরা গাড়ি করে পার্শ্ববর্তী আমেরিকার শহরে চলে যায় এবং ঐ সমস্ত নিত্যপণ্য কিনে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাদের কোনো শুল্ক-কর দিতে হয় না। আপাতদৃষ্টিতে এটি সামান্য ঘটনা হলেও বস্তুত এটা ছিঁচকে চোরাচালান-যা ক্যানাডার অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। ব্রাসেলস ও জার্মানি সীমান্ত দিয়ে একজন বেলজিয়াম নাগরিক প্রতিদিন দশ পনের বার তার গাধার গাড়িতে করে খড় জার্মানিতে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর বেলজিয়ামের শুল্ক অফিসার ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল- জার্মানিতে কি খড়ের খুব অভাব? লোকটি বলল- আমি তো খড় ফেলে দিই। তাহলে তুমি খড় নিয়ে যাও কেন? প্রশ্ন করল শুল্ক কর্মকর্তা। তখন লোকটি বলল-তুমি খেয়াল করনি যে, আমি খড় বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার সময় খড় আটকানোর খাচি সহ নিয়ে যাই কিন্তু খাচিটা আর ফেরত আনি না। ওটা জার্মানিতে বেচে দিই। ফলে প্রতি খাচিতে আমি তিন মার্ক বেশি দাম পাই। এটা অতি সূক্ষ্ম একটা চোরাচালান, যা ঐ লোকটি না বললে শুল্ক কর্মকর্তার পক্ষে ধরা সম্ভব হতো না।

সর্বশেষ গল্পটা বাংলাদেশ দিয়েই করি। আমার জানা একজন ব্যবসায়ী সিঙ্গাপুর থেকে ফিরছেন। বিমানবন্দরের কিছু শুল্ক কর্মকর্তার সাথেও তার সখ্য আছে। তিনি গ্রিন চ্যানেল পার হওয়ার সময় তার বন্ধু শুল্ক কর্মকর্তা বললেন, আপনিতো কিছুই আনেননি, তাহলে আমাকে থাকতে বললেন কেন? তখন ব্যবসায়ী বললেন, কাউকে বলবেন না, এই যে আমার দুপাটি দাঁত দেখছেন তা সম্পূর্ণ সোনার। আমি সোনার দাঁতের পাটি বানিয়েছি। তাই আপনাকে থাকতে বলেছিলাম। তিনি না বললে এটা অজানাই থেকে যেত কিন্তু কথায় বলে না, চোরের মন পুলিশ পুলিশ।

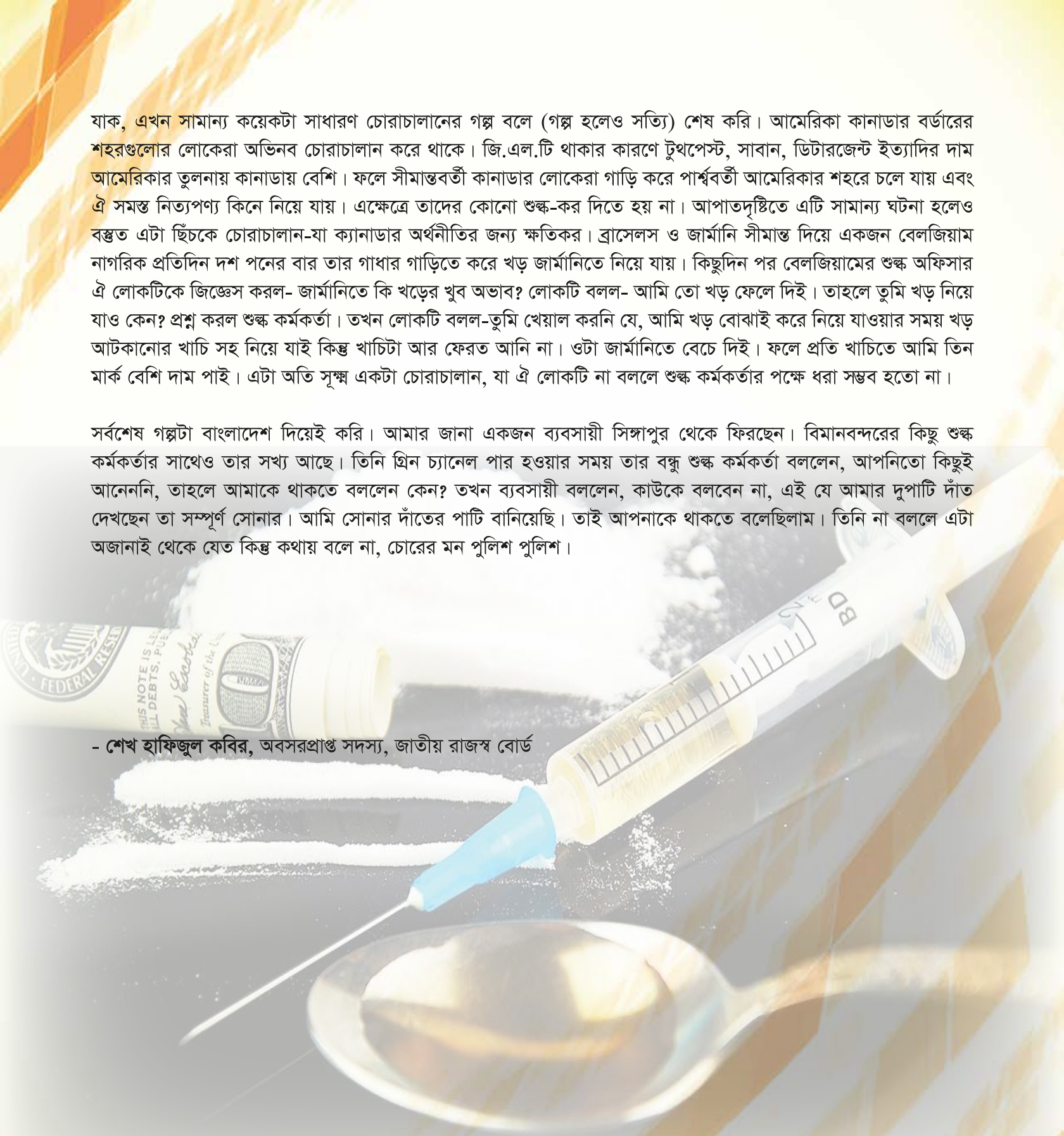

- শেখ হাফিজুল কবির, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

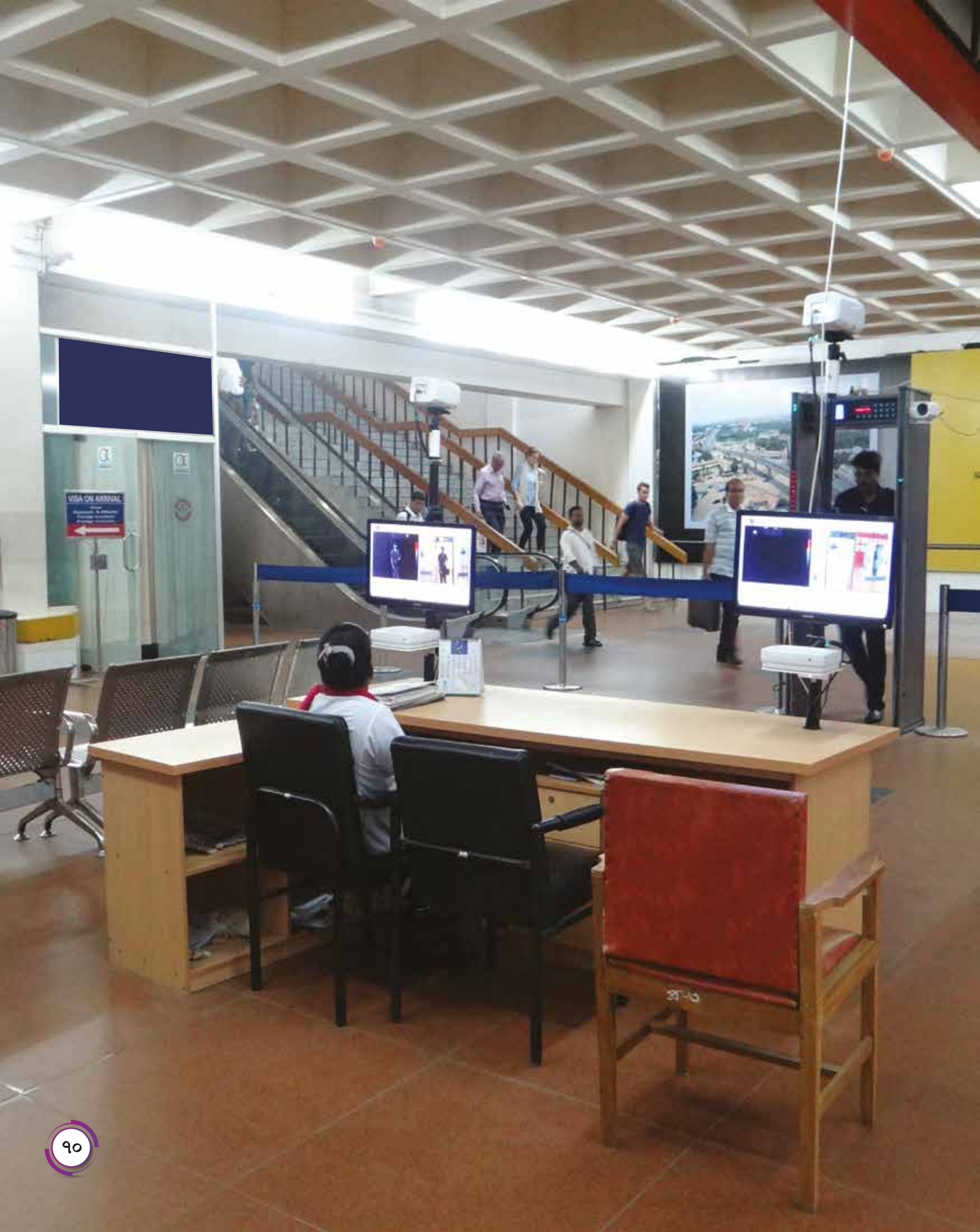
VISA ON ARRIVAL

চোরাচালানি জাহাজ ‘এমভি আলবা’ জব্দকরণের ইতিকথা

-আবদুল লতিফ সিকদার

চট্টগ্রাম কাস্টস হাউসে কালেক্টর অব কাস্টমস পদে দায়িত্ব পালনের প্রথম বছর ১৯৮৫ সালে পণ্য চোরাচালানের অভিযোগে তিনটি বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজ জব্দকরণের চাঞ্চল্যকর অনন্য ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের ইতিহাসে অনুরূপ অভিযোগে অন্য কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ আটকের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই। আগস্ট মাসে 'এমভি চায়নাভি এন্টারপ্রাইজ' নামক থাইল্যান্ডের সমুদ্রগামী মাছ ধরা জাহাজ এবং ডিসেম্বর মাসে 'এমভি আলবা' ও 'এমভি মিঙ হন' নামক দুটি সিঙ্গাপুরের সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজ জব্দকরণের দুঃসাহসিক কাজ করার পেছনে অনেক অজানা কথা রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গানবোটের সহায়তায় রীতিমতো এক কামান যুদ্ধের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ চোরাচালানকৃত পণ্যসহ ধৃত জাহাজ 'এমভি আলবা' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৮৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর । একটি নির্ভরযোগ্য গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টম হাউসের জয়েন্ট কালেক্টর মঞ্জুর মান্নানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং এসপিএস (সুপারিনটেনডেন্ট) মজিবর রহমানের নেতৃত্বে চোরাচালান নিরোধ কাজে একদল অভিজ্ঞ সিনিয়র প্রিভেন্টিভ অফিসার ও প্রিভেন্টিভ অফিসার সমন্বয়ে গঠিত একটি চোরাচালান নিরোধ টিম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গানবোট "বি এন হরমুজ" যোগে বাংলাদেশ কাস্টমস জলসীমায় সমুদ্রবক্ষে এক দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনায় নেমে পড়ে। কুতুবদিয়া পার হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গোপন সংবাদে চিহ্নিত জায়গার কাছাকাছি পৌঁছেই চোরাচালান নিরোধ টিম নোঙর করা অবস্থায় একটি জাহাজ এবং তার দুই পাশে কয়েকটি দেশি এঞ্জিন বোটের অস্তিত্ব দেখতে পায়। গানবোটের উপস্থিতি টের পেয়ে একটি বাদে অন্যসব এঞ্জিন বোট সটকে পড়তে সক্ষম হয়। জাহাজটিও নোঙর তুলে দ্রুতগতিতে কেটে পড়ার চেষ্টা চালায়। থামানোর জন্য বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করেও জাহাজটি থামাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পদক্ষেপ হিসেবে কাস্টমস অ্যাক্টের ১৬৪ (২) (ক) ধারার বিধান প্রয়োগ করা হয়। সর্বশেষ সংকেত হিসেবে গানবোটের কামান থেকে ব্লাংক ফায়ার করা হয়। থামানোর পরিবর্তে জাহাজটি তখন তার গতিবেগ আরো বাড়িয়ে দেয়। এই পর্যায়ে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে পলায়নপর জাহাজটি লক্ষ্য করে কামানের গোলার আঘাত হানা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি না থামিয়ে পালানোর গতি অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত জাহাজের মাস্টার ব্রিজে ক্যাপ্টেনকে লক্ষ্য করে মেশিনগানের আঘাত হানা হয়। এবার মাস্টার ও চিফ অফিসার আহত হলে জাহাজটি থেমে যেতে বাধ্য হয়। জাহাজ ভর্তি প্রচুর পণ্যের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেসব পণ্যের বৈধভাবে আমদানির সমর্থনে কোনো দালিলিক প্রমাণ না থাকায় ও পালানোর প্রচেষ্টার জন্য জাহাজটি সন্দেহাতীতভাবে চোরাচালানের কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে "এমভি আলবা" নামের জাহাজটি আটক করে চট্টগ্রাম বন্দরের তিন নম্বর জেটিতে এনে নোঙর করা হয়। কাস্টম হাউসের মেনিফেস্ট রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখা যায় যে "এমভি আলবা"নামক জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আগমনের জন্য কোনো মেনিফেস্ট ঘোষণা প্রদান করেনি। এ থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে এটি একটি অঘোষিত জাহাজ যা গোপনে চোরাচালানকৃত পণ্য নিয়ে বাংলাদেশ কাস্টমস জলসীমায় প্রবেশ করে অবৈধ পন্থায় চোরাচালানের উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রবক্ষে পণ্য খালাস শুরু করে। ফলে চোরাচালানকৃত পণ্যসহ জাহাজটি বাজেয়াপ্তযোগ্য হয়ে যায়। কাজেই জাহাজটি পরিবহনকৃত সমুদয় পণ্যসহ জব্দ করার আদেশ দেয়া হয়।

এরপর অভিযানে অংশগ্রহণকারী কাস্টমস ও নৌবাহিনী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে পণ্য জব্দকরণ প্রক্রিয়ায় জাহাজ থেকে পণ্য খালাস, ইনভেনটরি প্রস্তুত, পরিবহন ও পোর্ট অভ্যন্তরের ৭ ও ৮ নম্বর শেডের পেছনে অবস্থিত সল্টগোলায় কাস্টমস নিলাম স্টেট ওয়্যারহাউসে গুদামজাতকরণের সপ্তাহব্যাপী এক বিশাল কর্মযজ্ঞ চলতে থাকে। জাহাজে প্রায় পনেরো কোটি টাকা মূল্যের প্রচুর পরিমাণ চিনি, নারিকেল তৈল, সিগারেট, কাপড়, তৈরি পোশাক, ভিসিআর ও অন্যান্য ইলেকট্রনিকশসহ শতাধিক বর্ণনার পণ্য পাওয়া যায়। জাহাজের সাথে আটক দেশি এঞ্জিন বোটে জাহাজ থেকে নামানো চিনি ও সিগারেট পাওয়া যায় এবং এসব পণ্য বোটসহ জব্দ করা হয়। পনেরো কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসহ একটি বিদেশি মালিকানাধীন সমুদ্রগামী জাহাজ ও একটি দেশি এঞ্জিন বোট জব্দ করার সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব ও প্রভাবের কথা, পণ্যসহ জাহাজ ও বোটের বিভাগীয় কেস ও গ্রেফতারকৃত নাবিকদের বিরুদ্ধে কোর্ট কেসের আইনগত জটিল দিকসমূহ এবং সর্বোপরি কাস্টম হাউসের দখলে নেয়া জব্দকৃত জাহাজ ও বোটের পোর্ট এলাকার অন্তর্গত কর্ণফুলী নদীবক্ষে সংরক্ষণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের স্পর্শকাতর বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে এই কেসের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত করতে বাধ্য হই। এই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে ডিসেম্বর

মাসের শেষ সপ্তাহের সমগ্র দিবস রজনী আমি তখন ভীষণ এক ব্যস্ত সময় পার করছি। এমন ব্যস্ততার মধ্যে চট্টগ্রামের জিওসি ও জেডএমএলএ (আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক) মেজর জেনারেল নূরুদ্দিন খান এবং চট্টগ্রাম নৌবাহিনী ঘাঁটির কমোডোর কমান্ডিং ও এসজেডএমএলএ কমোডোর নূরুল ইসলাম বন্দরের তিন নম্বর জেটিতে 'এমভি আলবা' পরিদর্শনে উপস্থিত হলে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে এবং পণ্য খালাসসহ জব্দকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে হয়। জিওসি ও জেডএমএলএ মেজর জেনারেল নূরুদ্দিন খান কর্তৃক পরিদর্শনের ফলে এই কেস অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে এবং জাতীয় গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পায়।

জব্দকৃত 'এমভি আলবা' জাহাজ পরিদর্শনে আগত চট্টগ্রামের জিওসি ও জেডএমএলএ মেজর জেনারেল নূরুদ্দিন খানকে স্বাগত জানাচ্ছেন লেখক, মাঝখানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রাম ঘাঁটির কমোডোর কমান্ডিং নূরুল ইসলাম

পণ্য খালাস শেষ হলে 'এমভি আলবা'র সকল কেবিন, টয়লেট, স্টোর রুম, এঞ্জিন রুম, মাস্টার ব্রিজসহ সমগ্র এলাকার ব্যাপক তল্লাশি (rummage) করার জন্য সহকারী কালেক্টর ফরিদউদ্দিনের নেতৃত্বে একদল চৌকস সিনিয়র প্রিভেন্টিভ অফিসার নিয়োগ করা হয়। জাহাজের অভ্যন্তরে গোপন স্থানে স্বর্ণ ও মাদকদ্রব্য লুকানো থাকার সম্ভাবনা তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য দায়িত্বশীল সহকারী কালেক্টরের নেতৃত্বে rummage সম্পন্ন হলে তিন নম্বর জেটি থেকে জাহাজটি সরিয়ে নেয়ার তাগিদ আসে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। বাধ্য হয়ে 'এমভি আলবা' সদরঘাটস্থ ওল্ড কাস্টম হাউস বরাবর কর্ণফুলী নদীর বক্ষে নোঙর করে রাখার ব্যবস্থা করে জাহাজ থেকে সকল নাবিক, অফিসার ও ক্রু সদস্যদের গ্রেফতার করে বন্দর থানায় প্রেরণ করা হয়। ইতঃপূর্বে আহত মাস্টার ও চিফ অফিসারকে গ্রেফতার দেখিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়েছিল। দেশি এঞ্জিন বোটের মাঝিমাল্লাদেরও গ্রেফতার করে বন্দর থানার দায়িত্বে প্রেরণ করা হয়। এরই মধ্যে ঢাকার শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএম আকরামের নেতৃত্বে গঠিত এক তদন্ত দল চট্টগ্রাম

কাস্টম হাউসে উপস্থিত। আমার ১৯৬৫ সালের ব্যাচমেট এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে আমার পূর্বসূরি আকরাম সাহেব আমাকে একান্তে জানান যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সিএমএলএ (প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) কর্তৃক এ তদন্ত দল গঠিত হয়েছে। এ তদন্ত দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিধি (terms of reference) সম্পর্কে জানতে চাইলে এসএম আকরাম বন্ধুসুলভ অর্থবহ নীরবতা বজায় রাখেন। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এ কেসে কাস্টম হাউসকে তদন্তে সহায়তা প্রদানের জন্য ঢাকা থেকে তদন্ত দলের শুভ আগমন ঘটেনি। কিছুটা ক্ষব্ধ হয়ে যখন জানতে চাইলাম যে কাস্টম হাউস ও চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানের ফসল 'এমভি আলবা' কেসের তদন্তানুষ্ঠানে কাস্টম হাউসের প্রতিনিধি কোথায় তখন তদন্ত দলের টনক নড়ে। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জানানো হলে কাস্টম হাউস থেকে একজন সদস্য কো–অপট (co-opt) করে তদন্ত দলে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ আসে। কাস্টম হাউসকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জয়েন্ট কালেক্টর মঞ্জুর মান্নানকে তদন্ত কমিটিতে সহযোগিতা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তবে আমার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন এবং কর্মপরিধিবিহীন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন কাস্টম হাউসের কেস প্রস্তুতকরণে কোনো কাজে আসবে না। পরবর্তীকালে তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব চট্টগ্রাম কাস্টমস ও এক্সাইজ কালেক্টরেটের জয়েন্ট কালেক্টর আবুল কাসেমের সৌজন্যে প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদনের খসড়াটি থেকে আমার অনুমানের সত্যতা খুঁজে পাই।

চট্টগ্রাম বন্দরের ৩নং শেডের সামনে 'এমভি আলবা' জাহাজের দিকে তাকিয়ে মেজর জেনারেল নূরুদ্দিন খান পাশে বামদিকে দণ্ডায়মান লেখক ও কমোডোর ইসলাম

যাই হোক, 'এমভি আলবা' জাহাজ জব্দকরণের চোরাচালানকৃত পণ্যসহ কেসটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চলে। তারমধ্যে নারিকেল তেল ও কাপড়ের আমদানিকারক বলে কথিত দুইজন আমদানিকারকের খোঁজ মেলে।

নারিকেল তেল আমদানিকারক কোর্টের শরণাপন্ন হয়। কাপড়ের আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে রফতানীর উদ্দেশ্যে তৈরি পোশাকে ব্যবহারের অজুহাত তোলে এবং কাপড়ের খালাস দাবি করে। সিগারেট ও চিনির জন্য একজন সিংহলী দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে। 'দৈনিক ইনকিলাব' নামক সদ্য প্রকাশিত একটি দৈনিকে 'আলবা রহস্য' নামে এক সিরিজ প্রকাশের মাধ্যমে কাস্টমসের দোষত্রুটি খোঁজার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় এবং চোরাচালানীদের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এসব কল্পকাহিনীভিত্তিক প্রতিবেদন আমলে নিয়ে কাস্টম হাউসের বক্তব্য জানতে চাইলে আমাকে এসব ভিত্তিহীন বস্তুনিষ্ঠবিহীন প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি খণ্ডন করতে হয়। এসব থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চোরাচালানীরা অত্যন্ত তৎপর রয়েছে। বিভিন্ন ধূম্রজাল সৃষ্টির মাধ্যমে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে কাজ হাসিল করাই যার লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনে শেষ পর্যন্ত তারা সফলতা লাভ করে নারিকেল তেল খালাস করিয়ে নিয়ে।

নারিকেল তেলের ব্যাপারে দাবিদার আমদানিকারক প্রথমেই এ পণ্যের খালাসের জন্য জজ কোর্টে একটি কেস দায়ের করে। এ কেসে কাস্টম হাউস সঙ্গত কারণেই জিতে যায়। পরে তারা হাইকোর্টে আপিল দাখিল করলে মহামান্য কোর্ট 'এমভি আলবা' যে 'এমভি আল সারাহ' এর পরিবর্তিত নাম সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু পণ্য খালাসের জন্য কোনো আবেদন না থাকায় সেজন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হতে আদালত নির্দেশ দেন। পরে আবার জজ কোর্টে তারা পণ্য খালাসের আদেশ প্রার্থনা করে এবং মাননীয় আদালত কতিপয় শর্তসাপেক্ষে আবেদনকারীর অনুকূলে পণ্য খালাসের আদেশ দেন। এই আদেশের ফলে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশক্রমে কাস্টম হাউস শুল্ক-কর আদায়পূর্বক এবং মূল্যের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়ে জব্দকৃত এ বিপুল পরিমাণের পণ্য খালাস দিয়ে দেয়।

জব্দকৃত বিচারাধীন পণ্য বিচারকার্য নিষ্পত্তির পূর্বে এরূপ খালাস দেয়া কতখানি আইনসিদ্ধ তা প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল। জব্দকৃত পণ্য অন্তবর্তীকালীন ছাড় দেয়ার কোনো বিধান নেই। শুধুমাত্র জব্দকৃত যানবাহন বিচারসাপেক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টি নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন খালাস দেয়ার একটি বিধিমালা রয়েছে। ১৯৮৪–৮৬ আমদানি নীতিতে নারিকেল তেলের কোনো বাণিজ্যিক আমদানি বৈধ ছিল না। অর্থাৎ নারিকেল তেল শুধু পাশ বইয়ে লিপিবদ্ধ স্বত্ব অনুসারে শিল্পক্ষেত্রেই আমদানিযোগ্য ছিল। কিন্তু আলোচ্য জব্দকৃত চালানটি একজন বাণিজ্যিক আমদানিকারক আমদানি করেন বলে দাবি করেন এবং সে হিসেবে আমদানি কাগজপত্র পেশ করেন। বাণিজ্যিক আমদানি নিষিদ্ধ এ পণ্য একজন বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক দাবি করা এবং তা খালাস দেয়া কতটা আইনসিদ্ধ হয়েছিল তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় ছিল।

'এমভি আলবা' জাহাজ থেকে ট্রাকে পণ্য খালাস করা হচ্ছে

জব্দকৃত পণ্য খালাসের এ ঘটনা সমগ্র কেসটির গুরুত্ব গুরুতরভাবে হাল্কা করে দিয়েছিল এবং এর ভবিষ্যত গভীর হুমকির মুখোমুখি করেছিল। এরপর অন্যান্য দাবিদারগণ একই যুক্তিতে যখন তাদের আটক পণ্য খালাসের জন্য আবেদন করতে থাকেন তখন তা নাকচ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য ও দুরূহ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বিভাগীয় মামলা ও কোর্টের মামলার ক্ষেত্রেও বিবাদীগণ এ খালাসের ঘটনাকে একটা বড় ধরনের দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের পক্ষে দাঁড় করতে সচেষ্ট হন ।

বাংলাদেশ কাস্টমস ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এক দুঃসাহসী অভিযানে পণ্য চোরাচালানের অভিযোগে ধৃত 'এমভি আলবা' কেসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ জারীর মাধ্যমে শুরু করা হয়। কিন্তু ফৌজদারী মামলার তদন্ত কার্যক্রম বন্দর থানায় রুটিন পন্থায় শ্লথ গতিতে চলতে থাকে। ফলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কেসের অভিযোগপত্র দাখিল না করা সম্ভবপর হয়নি। এরূপ বিলম্বের প্রেক্ষিতে ফৌজদারী মামলার তদন্তভার সিআইডির কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'এমভি আলবা' জাহাজের ডেকে দণ্ডয়মান জেনারেল নূরুদ্দিন খান, লেখক ও কমোডোর ইসলাম

ইতোমধ্যে জাহাজটি 'এমভি আলবা' নয়, অন্য নামে সিঙ্গাপুর বন্দর থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পথিমধ্যে নাম পাল্টিয়ে লাইবেরিয়া কিংবা মেক্সিকো থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দাখিলের মাধ্যমে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চলে। তবে 'এমভি আলবা' এর আগে 'আল সারাহ', 'আল ফালাহ', 'আজিম–১' ইত্যাদি নামে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পরিবহন করেছে বলে সিআইডির তদন্তে বেরিয়ে আসে। অবশ্য বিভাগীয় মামলায় এসব বিষয় আমলে নেয়া হয়নি। জাহাজটি যে নামে পণ্য চোরাচালানরত অবস্থায় আটক করা হয় সেই নামেই জব্দ করে আইনগত কার্যধারা সম্পন্ন করে কালেক্টর কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার আপিল আদেশে কালেক্টরের বাজেয়াপ্তি আদেশ বাতিল করে জাহাজটি খালাস প্রদান করে। এই আপিল আদেশের বিরুদ্ধে কালেক্টর সে সময়ে বিদ্যমান কাস্টমস অ্যাক্টের ১৯৬বি ধারায় আপিল আদেশটি পর্যালোচনাপূর্বক বোর্ডের ভুল সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন পেশ করে। সরকার কর্তৃক আপিল আদেশটি পর্যালোচিত হয় এবং আপিল আদেশে দৃশ্যমান ভুল সংশোধনের আদেশ দ্বারা বোর্ডের আপিল আদেশটি বাতিল করা হয় এবং কালেক্টরের বাজোয়াপ্তি আদেশটি বহাল থাকে। ফলে জাহাজটি কাস্টমস অ্যাক্টের

১৮২ ধারায় সরকারি মালিকানায় অর্পিত হয় এবং বিদ্যমান সরকারি নির্দেশ অনুসারে এটি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হওয়ার কথা। এই নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করার আগেই জাহাজের সিঙ্গাপুরবাসী মালিক দাবিদারের পক্ষে তার বাংলাদেশের এজেন্ট জাহাজ বাজেয়াপ্তি আদেশ চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি মামলা দায়ের করে। কোনো স্থগিতাদেশ না থাকলেও হাইকোর্ট বিভাগে মামলাটি নিষ্পন্নাধীন থাকায় জাহাজটির নিলামে বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। মাত্র কয়েকজন গার্ডের পাহারায় নদীবক্ষে থাকা জাহাজটি হতে রাতের আঁধারে আসবাবপত্র, খুচরা যন্ত্রাংশ, এমনকি এঞ্জিন পার্টস চুরি হতে থাকে এবং এক সময়ে এটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটি বন্দরের জন্য নিরাপত্তা হুমকির সৃষ্টি করে। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগে জাহাজের মালিকানা দাবি করে দায়েরকৃত কেসটি অনিষ্পন্ন থাকায় কাস্টমস অ্যাক্টের ১৬৯ (৪) ধারার বিধান অনুসারে জাহাজটি দ্রুত অবনতিশীল গণ্য করে ২০১ ধারার বিধান প্রয়োগ করে এটি নিলামে বিক্রয়পূর্বক বিক্রয়লব্ধ অর্থ মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিলিবণ্টনের উদ্দেশ্যে জমা রাখাই হত সঠিক আইনানুগ পদক্ষেপ। কিন্তু সেইরূপ আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১৯৮৯ সালের জুন মাসের দিকে সরকারের মৌলিক ক্ষমতাবলে প্রদত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাত্র ষাট লক্ষ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টির জামানতে দাবিদার মালিকের কাছে জাহাজটি হস্তান্তর করা হয়। বাজেয়াপ্তকৃত কয়েক কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি তার পূর্বতন মালিকের কাছে জামানতের বিনিময়ে হস্তান্তর করার কোনো আইনগত বিধান নেই। আটককৃত বা জব্দকৃত থাকা অবস্থায় যে কোনো যানবাহন তার মালিকের কাছে যথোপযুক্ত জামানতের বিপরীতে অন্তর্বর্তীকালীন ফেরত প্রদানের আইনগত বিধান থাকলেও বাজেয়াপ্তকৃত কোনো যানবাহনের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য নয়। যাই হোক, কাস্টম হাউস সরকারি আদেশ পরিপালন করে ঝামেলামুক্ত হয়। এভাবেই 'এমভি আলবা' কেসের আইন বহির্ভূত অসহায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাদটিকা ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের 'ম্যান ছেরু মিয়া' কেস থেকে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের 'এমভি আলবা' কেসের এক দশক সময়ের ব্যবধানে দুটি চোরাচালান কেস উদ্‌ঘাটন ও আটকের আলাদা ঘটনারই এককভাবে আমি সাক্ষী। ব্যবধান শুধু সময়ের নয়, পরিবেশ ও পরিস্থিতিরও। বাংলাদেশ তখন 'ইত্তেফাকে'র যুগ পার হয়ে 'ইনকিলাবের' যুগে পৌঁছে গেছে ; এক উদার গণতান্ত্রিক যুগের আইনের শাসনের পরিবেশ থেকে সামরিক শাসনের বৈরী পরিবেশে প্রবেশ করেছে। চোরাচালানের মতো গুরুতর অপরাধ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে দেশে তখন সরকারি উচ্চপর্যায়ের সমর্থনের অনুকূল অবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পর্যায়ের অসমর্থনের প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছে। সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্তনের বিষয়টি আমলে না নিয়ে আইনের কঠোর প্রয়োগ কতটা অবাস্তব ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ছিল তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে যখন 'ম্যান ছেরু মিয়া' কেসে আইন প্রয়োগের সফল পরিসমাপ্তি শেষে আর্থিক পুরস্কারসহ সরকারি প্রশংসাপত্র প্রাপ্তির সাথে 'এমভি আলবা' কেসে আইন প্রয়োগের অসফল পরিসমাপ্তি ও পুরস্কারের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় তিরস্কার প্রাপ্তির তুলনা করা হয়। বাংলাদেশ তখন একটি বৈরী পরিবেশে নষ্ট সময় অতিক্রম করছে। সেই সময়কালে

কামানের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ 'এমভি আলবা'র একাংশ

ঢাকা এয়ারপোর্টে চোরাচালানকৃত একটি ঘড়ির চালান আটক করতে গিয়ে কাস্টমসের একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টকে তার জীবন উৎসর্গ করতে হয়। সেই সময়কে বোঝার জন্য এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যখন একটি চোরাচালান কেসের ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তখন এই কেসের ফলে যে সব প্রভাবশালী মহলের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে তারা, যে তৎপর রয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই এ ঘটনার পর এক বছর অতিক্রম না হতেই যখন জীবন থেকে অপসারিত না হলেও কাস্টম হাউস থেকে অপসারিত হতে হয় তখন অবাক হওয়ার বা দুঃখ বোধ করার কোনো কারণই থাকে না। দুঃখ বোধ শুধু এটাই যে কাস্টমসের ইতিহাসের একটি বড় চোরাচালান কেসকে কিভাবে গুরুত্বহীন করে দেয়া হয়েছিল এবং কেমন করে আইনের ভ্রান্ত পদক্ষেপের ফাঁক বেয়ে চোরাচালানিদের স্বার্থ সার্বিক সুরক্ষা পেয়েছিল। 'এমভি আলবা'র অজানা কথা তারই ইতিকথা।

কামানের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ 'এমভি আলবা' জাহাজের মাস্টার ব্রিজে মেশিনগানের গোলায় আঘাতের চিহ্ন দেখাচ্ছেন কমোডোর ইসলাম। পেছনে দাঁড়ানো লেখক, জেনারেল নূরুদ্দিন খান, জয়েন্ট কালেক্টর মঞ্জুর মান্নান ও জিওসির স্টাফ অফিসার

- আবদুল লতিফ সিকদার, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অবাক করা গোয়েন্দাগিরি

-শাহাবুদ্দীন নাগরী

আজ থেকে ২৮ বছর আগের কথা। আমি তখন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে সহকারী কালেক্টর হিসেবে কর্মরত। কালেক্টর খাজা গোলাম সারওয়ার স্যার একদিন সকালে আমাকে ডেকে বললেন, 'কাল সকালে আপনি ঢাকা চলে যান। আপনাকে ইন্ডিয়ায় একটি ট্রেনিংয়ে যেতে হবে। এনবিআর'এ গিয়ে কাগজপত্র তেরি করে দিয়ে আসেন'। আমি প্রথমত: অবাক হলাম, দ্বিতীয়ত অসম্ভব আনন্দিত। ট্রেনিংটা হোক না রাতে, পাশের দেশে, তবুও চাকুরিজীবনে এটাই হবে আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। তাই ভীষণ আনন্দিত আমি। আর অবাক হবার কারণটি হচ্ছে, এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যতো ধরনের ট্রেনিংয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশে পাঠাতে পারে বা পাঠানোর সুযোগ আছে, তখন তেমন ছিল না। বছরে সাকুল্যে মাত্র কয়েকজন কর্মকর্তা বিদেশ যাবার সুযোগ পেতেন। কাস্টমস একাডেমীতে এক বছরের ট্রেনিং শেষ করে আমি তিন বছর চট্টগ্রাম কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ কালেক্টরেটে চাকুরি করে মাত্র পদস্থ হয়েছি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে, কাজ করি জেটি এবং নিলামের সহকারী কালেক্টরের। আমার সিনিয়র এবং ব্যাচের সিনিয়র বন্ধুরা থাকার পরও আমার নাম কীভাবে মনোনয়ন পেলো সেটাই ছিলো আমার কাছে অবাক হবার মতো।

'গোয়েন্দার চোখ' এর জন্য লেখা লিখতে বসে কেন এই ভারত ট্রেনিংয়ের অবতারনা করলাম, তার একটা কারণ অবশ্যই আছে। জীবনে বেশ কয়েকবার ট্রেনিংয়ে বিদেশে যাবার সুযোগ আমার হয়েছে। অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা এখনও মনকে নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু ভারতের সেই ট্রেনিংটির কথা কখনও ভুলতে পারবো না যা আমাকে আমার চাকুরিজীবনে এবং এখনও চমকিত করেছে এবং করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে গিয়ে জানতে পারলাম এটি নারকোটিক্স বা মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত একটি ট্রেনিং। ট্রেনিংয়ের স্থানটি মুম্বাই (তখন বলতো বোম্বে) হলেও এটির আয়োজক আমেরিকান কাস্টমস। আমেরিকায় তখন কাস্টমস মিনিস্ট্রি অব জাস্টিসের অধীনে কাজ করতো, বর্ডার সিকিউরিটির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়নি। ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক্স কন্ট্রোল কর্মসূচীর আওতায় আঞ্চলিক পর্যায়ের এই ট্রেনিংয়ের আবাসন ও স্থান বরাদ্দ করেছে ভারত কাস্টমস। এশীয় ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো থেকে আগত নবীন ও মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের এই ট্রেনিংয়ের সব খরচের জোগান দেবে মার্কিন কাস্টমস তথা মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস। তৎকালীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (বর্তমানে হযরত শাহজালাল রহ: আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) যুগ্ম কালেক্টর সাখাওয়াত হোসেন এবং আমি এই ট্রেনিংয়ের জন্য মনোনীত হয়েছি। তখন তো যোগাযোগের এতো সুযোগ ছিলো না, ল্যান্ডফোনে ঢাকা/চট্টগ্রাম লাইন পাওয়া ছিলো যুদ্ধ জয়ের মতো। সব কাগজপত্র ও পাসপোর্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা দিয়ে ফিরে এলাম চট্টগ্রামে। দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক প্রশাসন) - কে অনুরোধ করে এলাম, খবর-টবর হলে যেন আমাকে বা আমার কালেক্টর স্যারকে আগে জানানো হয়।

যাই হোক, এর পরের কাজগুলো দ্রুতই হয়েছে, ঠেকেছি, শিখেছি এবং এগিয়ে গেছি। মতিঝিলে যেতে হলো একদিন, ওখানেই তখন মার্কিন দূতাবাস। নারকোটিক্স -এর ওপর একজন দু'তিন মিনিট কথা বলতে বললো। আমি বললাম। তারপর আধা ঘন্টার ভেতরে যাবতীয় কাগজপত্র টিকেট, ডলার এবং পাসপোর্ট বুঝিয়ে দিয়ে বললো, ভারতীয় ভিসা তোমাকেই করে নিতে হবে।

সাখাওয়াত স্যার আর আমি ছুটলাম ধানমন্ডি দুই নম্বর সড়কে। তখন ওখানেই ভারতীয় দূতাবাস, এখন যেখানে সিটি কলেজ। আমরা কাগজপত্র দিয়ে ভিসা পাচ্ছি এই আশায় মুখে হাসি ফোটাতেই ভিসা অফিসার জিজ্ঞেস করলো, 'নোট ভারবাল কই?' শব্দটির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় আমার, সরকারিভাবে প্রথম বিদেশযাত্রী বলেই হয়তো।
স্যারকে বললাম,
'স্যার, নোট ভারবাল কি?'
স্যার মুখে এক ধরনের হাসি এনে বললেন, 'তাইতো-তাইতো, ওটার কথা তো আমার মনেই ছিলো না। ওটা ফরেন মিনিস্ট্রির একটা রিকোয়েস্ট লেটারের মতো, যেন ভিসা দেয়া হয়, সেরকম একটা চিঠি।'
সে কাজটাও করে দিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সহকারী সচিব তৌহিদ হোসেন ভাই (পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়েছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে অবসর নিয়েছেন) অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। আমাদের ভিসাও হয়ে গেলো। আমরা দু'জন ১৯৮৮ সালের ২০ মার্চ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে কলকাতা হয়ে পৌঁছে গেলাম বোম্বে রাত ১১ টার দিকে।

মার্কিন কাস্টমস-এর একজন মহিলা কর্মকর্তা, যিনি আমাদের ট্রেইনারও ছিলেন, আমাদের বোম্বে অভ্যন্তরীণ এয়ারপোর্ট সান্তাক্রুজ থেকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিলেন বোম্বে নগরী থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে ভারতের কাস্টমস ও সেন্ট্রাল এক্সাইজের আঞ্চলিক একাডেমি ভানদুপ এর ডরমিটরীতে ঠিক মধ্যরাতে। মূল শহর থেকে দুরে বলেই হয়তো কেমন অন্ধকার জড়ো হয়ে ছিলো ভানদুপ এলাকায়। একাডেমিটাও বড়ো নীরব মনে হচ্ছিল। কেমন করে থাকবো এখানে ১৫ দিন? এমন একটা প্রশ্ন বার বার ভিড় করছিল মনে।

সাখাওয়াত স্যার বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়েন, সকালে দেখা যাবে।'

ট্রেনিংয়ের ফাঁকে লেখক ও ট্রেইনার

আমরা প্রায় ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন দেশের কাস্টমস বিভাগ থেকে এসেছি মাদকদ্রব্য চেনা, পরিবহনের নানা অপকৌশল বুঝে তার আটক করার পদ্ধতি শিখতে। প্রশিক্ষক তিনজনই মার্কিন কাস্টমস-এর কর্মকর্তা, দুজন পুরুষ, একজন, মহিলা। বেশ জমজমাট হয়ে উঠলো ট্রেনিং। স্লাইডের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো ওরা, সঙ্গে নানা ধরনের লিটারেচার। পৃথিবীতে তখন ভালোভাবে শুরু হয়ে গেছে কন্টেইনারের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির কাজ। বাংলাদেশে কিছু কিছু কন্টেইনারে পণ্য আমদানি শুরু হয়েছে। ওরা শেখালো, কী ধরনের কন্টেইনারে অবৈধ পণ্য বা মাদক পাচার হতে পারে। কন্টেইনার নম্বর, সীল ইত্যাদি থেকে কীভাবে সেগুলোকে সনাক্ত করা যায়, ওদের দেশ থেকে ওরা ফটো তুলে স্লাইড বানিয়ে এনেছে, আমাদের বড় পর্দায় দেখালো। একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মাদক শরীরের কী কী ক্ষতি করে, নিঃশেষ করে দেয় জীবনশক্তি, তার কাগজপত্র দিলো। ঐসময়ের জন্য প্রযুক্তিগত যা যা সুবিধা সহজলভ্য ছিলো তা কীভাবে ব্যবহার করে ঐ মাদক আটক করা যায় তাও সবিস্তারে শিখিয়েছিলো আমাদের। বিকেল ৫টার পর ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে অথবা ছুটির দিনগুলোতে আমি আর সাখাওয়াত স্যার ঘুরে ঘুরে দেখতাম মুম্বাই শহর। প্রধান রেল স্টেশন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল, জুহু সমুদ্র সৈকত, দাদার পশ এরিয়া, ইন্ডিয়া গেট, হোটেল তাজসহ নানা এলাকা কখনও ট্যাক্সিতে, কখনও বাসে, আবার কখনো বা পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে

বেড়াতাম। মন্দ লাগছিলো না। একদিন ট্রেনিংয়ের অংশ হিসেবে ওরা আমাদের নিয়ে গিয়েছিলো 'এলিফ্যান্টা আইল্যান্ড'। ইন্ডিয়া গেট থেকে প্রায় দেড় ঘন্টা নৌপথে ঐ দ্বীপে গিয়ে সারাদিন কাটিয়েছিলাম আমরা। বিশাল বিশাল হাতীর মূর্তি আছে ওখানে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ওখানে গিয়ে পূজা-অর্চনা করে থাকে। প্রতিদিন বহু মানুষ ঐ দ্বীপে যায় বলে জেনেছিলাম। কাস্টমস বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'রামেজ' একটি অন্যতম কাজ। 'রামেজ' মানে অনুসন্ধান বা তন্ন তন্ন করে খোঁজা। মার্কিন প্রশিক্ষক দল আমাদের জানালো ওরা আমাদের রামেজিং দেখবে। আমরা কেমন পারদর্শী তা ওরা যাচাই করতে চায়। প্রথম দিন বিশাল বিশাল দুটো ট্রাক এবং একটা বাস এনে একাডেমির সামনে রাখা হলো। আমাদের প্রশিক্ষণার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করে ওরা জানালা এই বাস ও ট্রাকের কোনো একটিতে এক কিলো হেরোইন লুকোনো আছে। বলা হলো, ধরা যাক স্থল শুল্ক স্টেশন দিয়ে অন্য দেশে পাচার করার জন্য। একেকটি দল একেকটি বাহন রামেজিং করে যদি ঐ এক কিলো হেরোইন বের করতে পারে তবেই বোঝা যাবে আমরা রামেজিং জানি। আমরা কাজে নেমে পড়লাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার করা গেলো লুকিয়ে রাখা হেরোইন। পরদিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো মুম্বাই বন্দরে। বিশাল আকারের একটি পণ্যবাহী জাহাজ নির্বাচন করে ঐ জাহাজের অভ্যন্তরে একই কায়দায় লুকিয়ে রাখা হলো ঐ হেরোইন। আমরা সবাই কেডস, হাফপ্যান্ট এবং টি-শার্ট পরে বন্দরে উপস্থিত হয়েছি। জাহাজের রামেজিং তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। পুরো জাহাজ তিনভাগে ভাগ করে তিন দলকে উঠিয়ে নেয়া হলো জাহাজে। ইঞ্জিন, কেবিন, ডেকসহ নানা জায়গা আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজছি। কিন্তু হেরোইনের পাত্তা নেই। ঘন্টা দুয়েক গলদঘর্ম হয়ে খোঁজার পর শেষ পর্যন্ত সেটাও খুঁজে পেলাম আমরা। খুশি হলো মার্কিন প্রশিক্ষকরা। তাদের চেহারাতেই সেটা স্পষ্ট হলো। জাহাজে বসে সুস্বাদু সব খাবার খেয়ে আমরা পুরো দল বাসে ফিরে এলাম একাডেমিতে। আমাদের শেষ রামেজিং হবে বিমানে, মানে উড়োজাহাজে। মুম্বাইতে তখন দু'টো এয়ারপোর্ট। অভ্যন্তরীণ এয়ারপোর্ট সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট নামে পরিচিত। যেই এয়ারপোর্টে আমরা কলকাতা থেকে এসে নেমেছিলাম। আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টকে ওরা 'সাহার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট' নামে ডাকতো। এখন অবশ্য দু'টো এয়াপোর্টকে সংযুক্ত করে নাম রাখা হয়েছে 'ছত্রপতি শিবাজি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট'। এই এয়ারপোর্টের একদিকে অভ্যন্তরীণ রুটের বিমানগুলো ওঠানামা করে এবং যাত্রীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে আলাদা অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল।

মুম্বাইয়ে ইন্ডিয়া গেটের সামনে লেখক

তো আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো সাহার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে । বাস থেকে নেমে আমরা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। এই সময়ে আমাদের মার্কিন প্রশিক্ষক দল এয়রপোর্টের ভেতর দিয়ে হ্যাঙ্গারে গিয়ে একটা বড় বোয়িং বাছাই করে হেরোইন লুকিয়ে রাখলো আমাদের রামেজিংয়ের জন্য। আমাদের শুধু বিমানের অভ্যন্তরভাগ নয় (অর্থাৎ যাত্রীরা যেখানে বসে শুধু সে জায়গাটুকু নয়) রামেজিং করতে হবে লাগেজ হোল্ড, ককপিট, ইঞ্জিন সহ প্রত্যেকটি জায়গা। আমাদের বলে দেয়া হয়েছিলো, যে কোনো জায়গার নাট, বলটু, তার, যন্ত্রপাতি আমরা সরিয়ে সরিয়ে দেখতে পারবো। কাস্টমস একাডেমি কর্তৃপক্ষ খুবই যত্নের সাথে উড়োজাহাজ রামেজিং করার ব্যবস্থা করে দেয়ায় আমাদের প্রশিক্ষক দল উৎফুল্ল। নানা কারণে এসব ম্যানেজ করেছিলো। এই রামেজিংয়ের সুবাদে আমার বিমানের লাগেজ হোল্ডে ঢোকার সুযোগ হয়েছিলো এবং সেখান থেকেই আমরা খুঁজে বের করেছিলাম লুকিয়ে রাখা এক কিলো হেরোইন।

যে কথাটি বলার জন্য এই প্রশিক্ষণের এতো কথা বললাম এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক। আশা করি কাস্টমস গোয়েন্দা টিম এখান থেকে কিছু ভাবনার খোরাক পাবে। আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাসের দিকে যাচ্ছি। আমাদের সব সামনে ছিলো চীন থেকে আসা দুজন প্রশিক্ষণার্থী কাস্টমস অফিসার। হঠাৎ আমরা খেয়াল করলাম চীনা অফিসার দু'জন বাসে ওঠার মুহূর্তে চার পাঁচজন লোক ওদের ঘিরে ফেললো। আমরা অন্যরা সবাই মুহূর্তে দাড়িয়ে গেছি নিজ নিজ জায়গায়। চীনা দু'জনকে ঐ লোকগুলো পাশে সরিয়ে নিয়ে শুরু করলো জিজ্ঞাসাবাদ। ঠিক একই সময়ে আরো ক'জন লোক পুরো বাসটিকে ঘিরে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার! আমরা সবাই হতচকিত। ইতোমধ্যে সবাই এসে গেছি বাসের কাছাকাছি। মার্কিন প্রশিক্ষক দল এবং একাডেমির কর্মকর্তারা এগিয়ে গেলো সামনে। পাঁচ মিনিটেই পরিস্কার হয়ে গেলো বিষয়টি। লোকগুলোর সঙ্গে কথাবার্তার পর বেশ হাসাহাসি হলো সবার মধ্যে। ঘটনা কি? ঘটনা হলো, ঐ লোকগুলো আর কেউ নয়, বিমানবন্দরের নারকোটিক্স গোয়েন্দা দল। তারা কীভাবে জানি খবর পেয়েছে এই বাসে এক কিলো হেরোইন এসেছে এবং তা বিমানবন্দরের ভেতরে চলে গেছে। আমরা যতোক্ষণ ভিতরে ট্রেনিংয়ে ছিলাম, ঐ গোয়েন্দা টিম বাসটাকে নজরদারিতে রেখেছে এবং কেউ বাসে উঠলেই তাকে আটক করার পরিকল্পনা করেছে। ফলে চীনা কাস্টমস কর্মকর্তা দু'জন বাসে উঠতে গেলেই তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বাসের ভেতর হাসাহাসি পড়ে গেলো আবার। আমি ভাবলাম অন্য কথা। আমাদের কাছে অবশ্যই এক কিলো হেরোইন ছিলো, সেটা আমাদের প্রশিক্ষকরা বিমানবন্দরের ভেতরেও নিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এই সংবাদ নারকোটিক্স বিভাগের গোয়েন্দা টিম পর্যন্ত পৌঁছে গেলো কীভাবে? ওদের এই তৎপরতায় আমার মুগ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো কি? আমি আজো ঐ ঘটনাটার কথা ভাবি এবং গোয়েন্দা তৎপরতার বিস্ময় দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। যোগাযোগের ভালো ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ আমাদের বাংলাদেশের কাস্টমস গোয়েন্দাদের আরো বহুদূর সামনে নিয়ে গেছে, আমাদের অনেক অনেক যোগ্যতম কাজ আছে, কিন্তু ১৯৮৮ সালে যোগাযোগ মাধ্যমের সুব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির সহায়তা না থাকার পরও সাহার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভারতীয় নারকোটিক্স গোয়েন্দা দল যে কাজটি করেছিলো তা অবাক করার মতো ঘটনাই বটে।
এটাই প্রকৃত গোয়েন্দাগিরি।

- শাহাবুদ্দীন নাগরী, অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

Maldivian

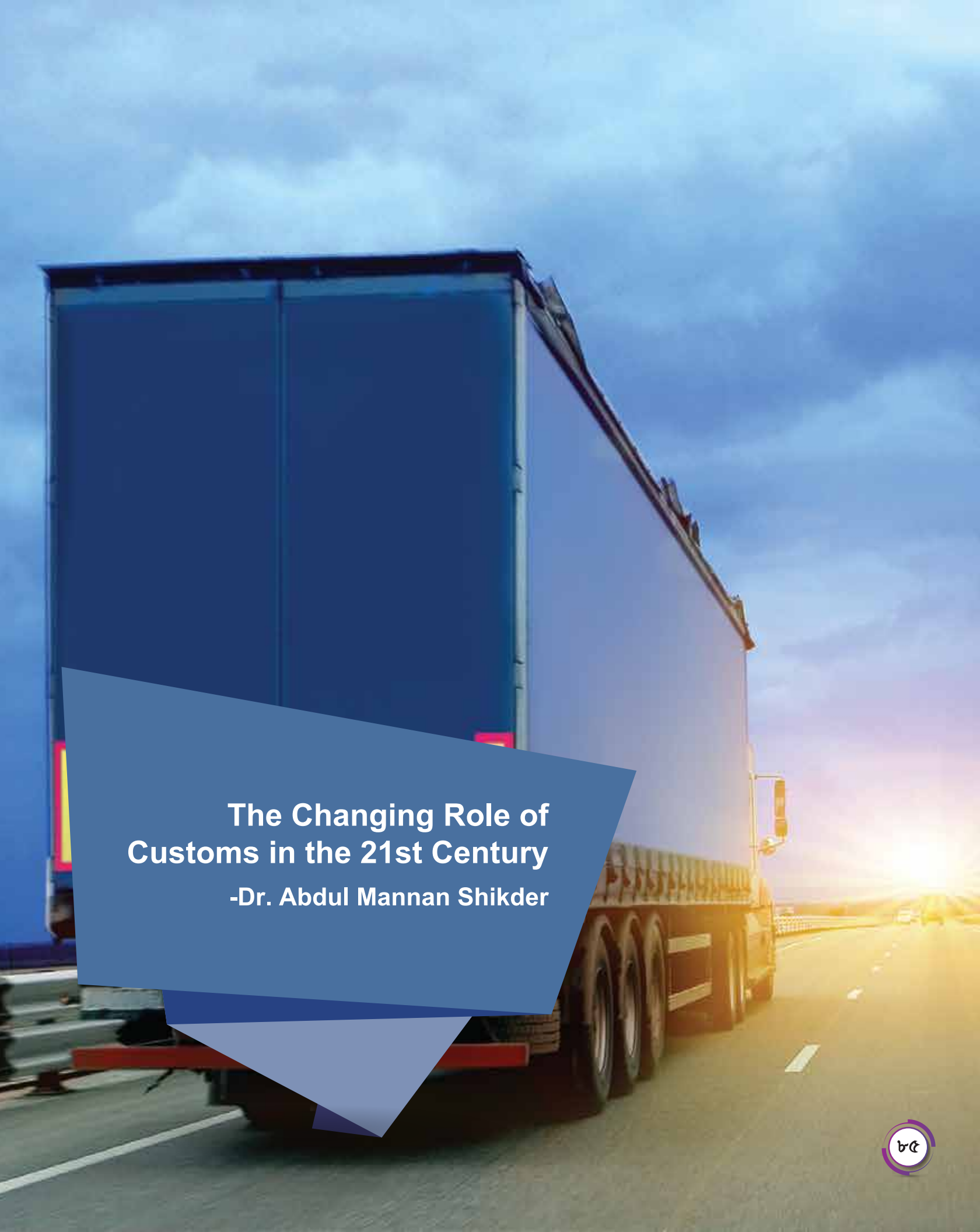

The Changing Role of Customs in the 21st Century

-Dr. Abdul Mannan Shikder

Abstract

From time immemorial Customs authority has been considered as the frontier soldier of a state. It also stands for the national sovereignty of a state. As a key border agency Customs plays a critical role in trade facilitation, revenue collection, community protection and ensuring national security and can make a major contribution to enhance national trade competitiveness. Traditionally Customs has three major roles:

- To assess and collect revenue based on the characteristics of the goods and.
- To protect the country and the society by preventing smuggling.
- To ensure that national legislation is applied on imported-exported goods.

The role of Customs has, however, changed significantly in recent times, and what may represent core business for one administration may fall outside the sphere of responsibility of another. This is reflective of the changing environment in which customs authorities operate and the corresponding changes in government priorities.

The Role of Customs

The responsibilities of Customs administrations vary from country to country. Traditionally, however, Customs has been responsible for implementing a wide range of government policies, spanning areas as diverse as revenue collection, trade compliance and facilitation, protection of cultural heritage and enforcement of intellectual property laws.

In many developing and least developed countries, import duties and related taxes represent a significant portion of the national revenue. Because of this, the main focus for their customs authority is to collect revenue. In developed countries, on the other hand, with relatively little reliance on imports as a source of government revenue, there is an increasing focus on border protection, with particular emphasis on the enforcement of import and export prohibitions and restrictions.

Customs Role and priorities in the 21st Century

For several decades now, there has been mounting pressure from the international trading community to minimize government intervention in commercial transactions and a growing expectation for Customs Authorities Worldwide to place an increasing emphasis on the facilitation of trade. The changing expectations of the international trading community are based on the commercial realities of its own operating environment. It is looking for the simplest, quickest, cheapest and most reliable way of getting goods into and out of the country. The demand from Customs for 21st century is as follows:

First, in spite of declining tariff rates brought about by successive rounds of trade liberalization, the revenue mobilization and control functions of Customs are likely to remain substantial;

Second, in all countries, Customs will continue to collect trade data for statistical and regulatory purposes;

Third, Customs will continue to be responsible for effective and efficient border management to facilitate trade;

Fourth, based on a heightened awareness of the threat posed by international terrorism and transactional organized crime, governments will require that Customs administrations take on a larger role in enquiry relating to national security and law enforcement.

Expected Support

To make strong, motivated, efficient and capable customs WCO is playing very important and significant role. Some of the steps taken by WCO are as follows:

1. WCO The Guide

The World Customs Organization (WCO), established in 1952 as the Customs Co-operation Council (CCC) is an independent intergovernmental body whose mission is to enhance the effectiveness and efficiency of customs administration. Today, the WCO represents 180 Customs administrations across the globe that collectively process approximately 98% of world trade. As the global centre of Customs expertise, the WCO is the only international organization with competence in Customs matters and can guide rightly the international customs community.

2. WCO instruments & programs

The WCO has also developed a range of their instruments and tools to enable its members to be more responsive to the challenges of the 21st Century. These Include:

- Revised Kyoto Convention [The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures)
- Harmonized System Convention
- Advance Passenger Information (API) Guidelines.
- AEO Benefits: Contribution from the WCO private sector Consultative Group
- AEO Compendium
- AEO Implementation Guidance
- Application of Information & Communication Technology-ICT Guidelines
- Capacity Building Development Compendium
- CLiKC [WCO Internet-based Training portal] & e-learning courses
- Coordinated Border Management Study (CBMS)
- Customs Guidelines on Integrated Supply Chain Management
- Customs International Benchmarking Manual
- Customs Valuation Compendium
- Diagnostic Framework
- Glossy of International Customs Terms
- Guide to Measure the Time Required for the Release of Goods/Time Release Study
- Guidelines for the Purchase and Development of Scanning/Imaging Equipment
- Immediate Release Guidelines
- Model AEO Appeal Procedures
- PICARD Professional Standards
- Revenue Package

- Risk Management Compendium
- SAFE Data Element Maintenance Mechanism
- SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade
- Single Window Compendium
- The Authorized Economic Operator and the Small and Medium Enterprise (FAO)
- Trade Recovery Guidelines
- WCO Data Model.

The relevance and impact of the WCO's instruments and tools have been recognized by other international organizations such as the World Bank. By way of illustration, the Revised Kyoto Convention has served as a blueprint for the reform and modernization of many administrations around the world. This convention is the WCO's Trade Facilitation Convention and it supports Customs to more quickly clear legitimate goods and thereby accelerating economic growth.

3. International Customs Day

The Convention established the Customs Cooperation Council (CCC) was signed on 15 December 1950 in Brussels and entered into force two years later on 4 November 1952. The official inauguration session of the Council was held in Brussels on 26 January 1953 with participation of 17 (Seventeen) countries. In 1994 the Customs Cooperation Council was renamed World Customs Organization (WCO). So each year International Customs Day is observed and celebrated worldwide on 26 January. On this day the customs administrations of 180 Member States of the World Customs Organization organize various national events to celebrate the official inauguration day of CCC or WCO. On its part, the WCO secretariat chooses a topic for the International Customs Day. In 2016 the 26 January celebrations are devoted to the topic "Digital Customs: Progressive Engagement". Here in this topic the theme is "Digital Customs" and "Progressive Engagement" is the slogan. The term Digital Customs refers to any automated or electronic activity that contributes to the effectiveness, efficiency, and coordination of customs activities, such as automated Customs clearance systems, the Single Window concept, electronic exchange of information, websites to communicate information and promote transparency and the use of smart phones. Thus the WCO is contributing in changing the role of customs of its member countries. The theme and slogans disseminated in the previous years from WCO are as follows:

Year	Theme	Slogan
2009	Customs and the Environment	protecting our natural heritage
2010	Customs and Business	improving performance through partnerships
2011	Knowledge	a catalyst for customs excellence
2012	Connectivity	borders divide, customs connects
2013	Innovation	innovation for customs progress
2014	Communication	sharing information for better cooperation
2015	Coordinated Border Management	an inclusive approach for connecting stakeholders

Trade Facilitation

Trade facilitation looks at how rules and procedures governing the movement of goods across national borders can be improved to reduce associated cost burdens and maximize efficiency while safeguarding legitimate regulatory objectives. The WTO, in an online training package, once defined trade facilitation as "The simplification and harmonization of international trade procedures" where trade procedures are the "activities, practices and formalities involved in collecting, presenting, communicating and processing data for the movement of goods in international trade".

In December 2013, WTO members concluded negotiation on a Trade Facilitation Agreement (TFA) at the Bali Ministerial Conference, as a part of a wider "Bali Package". According to the Bali package adopted at the Bali Ministerial conference on 7 December, 2013, the trade facilitation decision is a multilateral deal to simplify customs procedures by reducing costs and improving their speed and efficiency. The objectives are: to speed up customs procedures; make trade easier, faster & cheaper, provide clarity, efficiency and transparency; reduce age-old cumbersome bureaucracy and corruption, and use technological innovations.

The Trade Facilitation Agreement contains provisions for expediting the movement, release and clearance of goods, including goods in transit. It also sets out measures of effective cooperation between customs and other appropriate authorities on trade facilitation and customs compliance issues. It further contains provisions for technical assistance and capacity building in this area.

Conclusion

Gone are the long prevailing notions of all pervading bureaucracy as propounded by Max Webber, doing everything for the peace and prosperity of a state. There has been a paradigm shift in the role of bureaucracy limiting its role from doing everything by the government engaging bureaucracy to only that of facilitating good governance and creating an enabling environment progressively engaging people in general in government activities. This proposition of participatory approach is followed now-a-days throughout the world and Bangladesh is not an exception in this regard. The concomitant result is a win-win situation both for the government and citizens of a particular state. Likewise, customs authority of any country cannot alone achieve its avowed objectives without the progressive engagement of other customs administration in general and the internal stakeholders in particular. In ensuring engaging stakeholders as espoused by WCO, Bangladesh is not lagging behind; delegation of some activities of customs to AEO, which is on the cards, many other similar programs undertaken and implemented by it like automation and use of ICT merit mention. We believe that we should, indeed we must, constructively engage our stakeholders for elevating the status of our customs administration to such a height that we can view for supremacy with other customs administration. As the advent of 21st century poses new challenges to our customs administrations, we must rise to the occasion by thinking a new and acting a new, leaving behind the age-old legacy and changing old mindset.

- **Dr Abdul Mannan Shikder,** Commissioner of Customs Bond Commissionerate, Chittagong

স্বর্ণ - পিদিম

-মোঃ জামাল হোসেন

চতুর্থবার বিমানের টয়লেট থেকে ফিরে রমজান সিটে বসে বেল্ট বাঁধছিল। এ সময় তার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ।

ফিস্‌ফিস্‌ করে কে যেন রমজানের উদ্দেশ্যে বলল– জনাবের কি মোশন লুজ? ওষুধ লাগবে? আমার কাছে এ্যামোডিস আছে বড় কার্যকর ওষুধ। পাঁচশ মিলি'র এক ট্যাবলেটে লুজ এক্কেবারে পাথর টাইট– লাগবে জনাব?
প্রশ্নকারীর কণ্ঠে রমজান বিরক্তির আভাস পেল।

ফিস্‌ফিসানির শব্দে রমজান আঁতকে উঠল। এত সামান্য বিষয়ে কারোও আঁতকে ওঠার কথা না। কিন্তু, রমজান আঁতকে উঠল। মুখে বলল, "জে না, ওষুধ লাগবে না। মনে মনে বলল– ছাগল নিজের চরকায় তেল মাখ, ফ্যাচর ফ্যাচর করিস না।"

দুবাই থেকে বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং ৩৭৭ এয়ার ক্র্যাপ্টটি আকাশে উড়ার পর তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। এ তিন ঘণ্টায় রমজান বেশ ক'বার আঁতকে উঠেছে। রমজানের আঁতকে ওঠার বিষয়টি এখন প্রায় অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেছে।

ফিস্‌ফিস্‌ শব্দটা রমজানের ডান কানের কাছে হয়েছে। রমজান ডান দিকে ঘাড় ঘোরাল। সে দেখল, ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি মাওলানা কিসিমের এক লোক। মাওলানা রমজানের পাশের আইল সিটের যাত্রী– তার গাত্র বর্ণ গৌর – বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। মাওলানার মধ্যে পীরালি পীরালি একটা ভাব আছে।

বিমানে ওঠার পর থেকে রমজান আছে একটা অস্থিরতার মধ্যে। তার ডান-বামের যাত্রী কে বা কারা–পুরুষ না মহিলা এতক্ষণ সে তা খেয়াল করেনি। ফিস্‌ফিস্‌ কাণ্ডের পর এই প্রথম রমজান বিষয়টি খেয়াল করল।

রমজান দেখল– মাওলানা সাদা পাঞ্জাবির ওপর কালো হাতা কাটা কোট পরেছেন। তার মাথায় জিন্না টুপী– মুখ ভর্তি কুচ কুচা কালো দাড়ি। বয়সের অনুপাতে মাওলানার দাড়ি বেশি কালো মনে হচ্ছে। তাঁর কোট আর দাড়ির রং মিলেমিশে একাকার। রমজানের কাছে মাওলানার দাড়ি কেন যে, নকল বলে মনে হলো।

মাওলানা অবিরাম পান চিবিয়ে যাচ্ছে। তার চোখে মুখে একটা সুখী সুখী ভাব। রমজান জানে, টাকা-পয়সায় টেক ভর্তি থাকলে মানুষের চেহারায় এমন সুখী সুখী ভাব হয়। রমজানের নিজেরও মাঝেমধ্যে এমন হয়।

কৌতূহলবশত রমজান তার ঘাড় বাঁয়েও ঘুরাল। রমজান দেখল, তার বামের উইন্ডোসিটের যাত্রী একজন তরুণ। তরুণের পরনে টী-শার্ট এবং জিন্সের ট্রাউজার। তার চোখে সান গ্লাস। রাতের বেলা চোখে সান গ্লাস দেখে রমজানের কিছুটা খটকা লাগল।

কাপ্তান বাজারের শীর্ষ সন্ত্রাসী কানা মজিদ। তার একটা চোখ নষ্ট। এ নষ্ট চোখ আড়াল করার জন্য মজিদ সারাক্ষণ চোখে সান গ্লাস পরে থাকে। রমজান কানা মজিদের বিষয়টি অবগত। এ অভিজ্ঞতা থেকে রমজানের মনে হলো এ যুবকের কোনো একটা চোখ নষ্ট। নষ্ট চোখ ঢেকে রাখার জন্যই সে সান গ্লাস পরে আছে।

যুবকের বাম গালে আবার ইঞ্চি দু'য়েকের একটি কাটা দাগ। চেহারায় মাস্তান মাস্তান ভাব। রমজান মনে মনে ভাবল– এ লোক সন্ত্রাসী-মাস্তান না হয়েই পারে না। রমজান আবার আঁতকে উঠল।
কথিত মাস্তান যুবক সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুঁদে আছে। সে ঘুমে না জাগরণে রমজান তা বুঝতে পারছে না। যুবকের সামনের ট্রের ওপর একপাশে একটি ছোট সিরামিক বাটিতে কিছু কাজু বাদাম। ট্রের অপর পাশে দুটি বিয়ারের ক্যান। একটি ক্যানের মুখ খোলা। সম্ভবত যুবক ইতোমধ্যে ক্যানটির তরল বস্তু ইস্তেমাল করে ফেলেছে। অপর ক্যানটি তখনো ইনটেক্ট।
অস্থিরতার কারণে রমজানের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। যুবকের ইনটেক্ট ক্যানটার পানীয় গলাধঃকরণের তীব্র বাসনা

Copyright © Kevin Murphy

রমজানকে গ্রাস করল। ক্যানটির দিকে রমজান করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মাওলানা ও তরুণ যেন পাউরুটির দুইটি স্লাইস। রমজান হচ্ছে সেই স্লাইস দুটির মাঝখানের চিকেন টুকরা। অর্থাৎ রমজানের ভাগ্যে জুটেছে স্যান্ডুইচ সিট।

রমজান জানে, আজ তাকে ভীষণ মানসিক চাপে থাকতে হবে। তার ওপর অল্প বয়সেই ডায়বেটিক। এটা তার বংশের ধারা। তার পিতৃকুলের সবাই চিনি রুগী। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে তার বাপ-চাচারা অসময়ে ধরাধাম ত্যাগ করেছে। তখন রমজান মাত্র চার বছরের বালক। মায়ের আদরও রমজানের কপালে বেশি দিন জোটেনি।

চাপ ও চিনিজনিত কারণে রমজানকে ঘন ঘন প্রক্ষালন কক্ষে যেতে হবে। স্যান্ডুইচ সিট থেকে বারংবার প্রক্ষালন কাজে যাতায়াত করা কিঞ্চিত সমস্যা সংকুল। আইল সীটের যাত্রীকে ডিঙিয়ে টয়লেটে গমনাগমন করলে সে হয়ত বিরক্তিতে চোখ বাঁকা করে তাকাবে, হয়তো ভদ্রতার খাতিরে মুখে কিছু বলবে না কিন্তু মনে মনে বলবে– হারামজাদার হয়েছে কি! এর কলকব্জা সব ঢিলা নাকি!

রমজান যা ভেবেছে বাস্তবেও হলো তাই। মাওলানা ইতোমধ্যে উদ্ভট প্রশ্নের মাধ্যমে তার বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলেছে।

সংগত কারণে কোনো যানবাহনের মাঝের ও উইন্ডো সিট রমজানের ভীষণ অপছন্দের। তার পছন্দ আইল সিট। অবশ্য আজ বিমানে আসন নির্বাচনে রমজানের কোনো ভূমিকা ছিল না। রমজানের টিকিট, বোর্ডিং পাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় অদৃশ্য হাতে– দূর থেকে। তার কাছে পৌঁছে রেডিমেড জিনিস– শেষ মুহূর্তে।

পেশা বিবেচনায় রমজানকে বলা যায় নাচের পুতুল। তাঁর নিয়োগ কর্তা তাকে যেমন নাচায় সে তেমন নাচে–ইনফ্যাক্ট নাচতে বাধ্য হয়।

রমজানের নিয়ন্ত্রকের পক্ষ থেকে তাকে আগেই ব্রিফ করা হয়েছে– মি: রমজান আপনি দুবাই এয়ারপোর্টের ৫ নম্বর ডিপার্চার গেট দিয়ে ঢুকবেন। লাগেজ স্ক্যানিং গেট পেরিয়ে সোজা বাংলাদেশ বিমানের বোর্ডিং কাউন্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন।

রমজান কার জন্য কেন অপেক্ষা করবে তা তাকে বলা হয়নি। এ বিষয়ে রমজানও কোনা প্রশ্ন করেনি– তার পেশায় প্রশ্ন করা নিষেধ। বিনা বাক্য ব্যয়ে হুকুম তামিল করাই তার কাজের মূল শর্ত। ফলে নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই রমজানের সময় কেটেছে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যদিয়ে। এ অনিশ্চয়তা ক্রমে তীব্রতর হয়ে অস্থিরতায় পরিণত হয়েছে।

স্ক্যানিং গেট পেরিয়ে রমজান বাংলাদেশ বিমানের বোর্ডিং কাউন্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল। মাত্র দশ মিনিট অতিবাহিত হয়েছে অথচ রমজানের কাছে মনে হচ্ছে দশ ঘণ্টা। নিজেকে রমজানের বেকুব মনে হচ্ছে। অপেক্ষা এমনিতেই অসহনীয় তদুপরি দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা তাও অনিশ্চয়তা নিয়ে– রমজানের অস্থিরতা বেড়েই চলল।
হঠাৎ রমজান লক্ষ্য করল একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তার কাছে এগিয়ে আসছে। বৃদ্ধটি হাঁটছে কিছুটা কুঁজো হয়ে। রমজানের কাছাকাছি এসে বৃদ্ধ পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে রমজানের হাতে দিল– ভাবখানা এই যেন কোনো ঠিকানা পড়তে দিয়েছে। রমজান কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিরকুটটি চোখের সামনে মেলে ধরল। চিরকুটে লেখা আছে– দ্রুত আপনার বর্তমান অবস্থান থেকে একশ গজ সামনে আসুন এবং ডান দিকের টয়লেটের প্রথম সারির ৩নং টয়লেট কেবিনটিতে প্রবেশ করে অপেক্ষা করুন। চিরকুট থেকে মুখ সরিয়ে রমজান সামনে তাকাল। ততক্ষণে চিরকুট প্রদানকারী বৃদ্ধ গায়েব– যেন সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। রমজান অবাক হয়ে ভাবল– ব্যাটা জিন ভূত নাতো ? রমজানের গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

রমজান চিরকুটের নির্দেশ অনুসরণ করে টয়লেটে গেল। ৩নং টয়লেট কেবিনটি খালিই ছিল। সে দ্রুত সেখানে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর সে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, পাশের টয়লেট থেকে পার্টিশনের নিচ দিয়ে একটি ছোট আকারের হাতব্যাগ তার কেবিনে এগিয়ে আসছে– হাতব্যাগের সাথে টেপ দিয়ে ২টি বোর্ডিং পাশ ও একটি চিরকুট লাগান।

রমজান ব্যাগ, বোর্ডিং পাশ ও চিরকুট নিয়ে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলো। অপেক্ষা করতে লাগল বোর্ডিংয়ের ঘোষণার।

যথাসময়ে বোর্ডিংয়ের এনাউন্সমেন্ট এলো। রমজান এগিয়ে গেল বোর্ডিং গেটের দিকে এবং নির্বিঘ্নেই বিমানে আরোহণ করল। অদ্ভুত উপায়ে প্রাপ্ত হাত ব্যাগ নিয়ে এতটা নির্বিঘ্নে রমজান বিমানে আরোহণ করতে পারবে কি না সে বিষয়ে রমজান কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিল। আরোহণ পর্ব নির্বিঘ্ন হওয়া সত্ত্বেও রমজানের সেই উদ্বিগ্ন ভাব গেল না।

রমজানের পিছনের সিটে একটি বাচ্চা কাঁদছে। কান্নার শব্দটি বেশ তীক্ষ্ণ। এ তীক্ষ্ণ শব্দ রমজানের মগজে গিয়ে বিদ্ধ হলো। শিশুটি সম্ভবত বহুক্ষণ ধরেই চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ রমজান তা খেয়াল করেনি। রমজানের অস্বস্তি দ্বিগুণ হলো। তার ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে বাচ্চাটাকে জোরে একটা থাপ্পড় মেরে বলে, "চুপ রও বেয়াদপ"। কিন্তু বাস্তবে সেটি সম্ভব হলো না। বাস্তবে অনেক কিছু সম্ভব হয় না। রমজান তার নিজের জীবনেই এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে।

রমজান অস্বস্তি নিয়ে পিছন ফিরল। সে দেখল শিশুটির কান্না থামাতে গলদঘর্ম হচ্ছেন একজন তরুণী। সে অপূর্ব সুন্দরী– সম্ভবত শিশুটির মা। এমন মায়াবতী রূপ রমজান ইতঃপূর্বে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। রমজানের অস্বস্তি কমতে শুরু করল। অজানা এক অনুভূতিতে তার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হলো। রমজানের বীণার তারে কোথায় যেন একটু টান পড়ল। সে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, তার চোখ দুটি অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসছে। রমজানের সেই ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি গ্রাম, গ্রামের সুবিস্তৃত মাঠ, মাঠটি হলুদ সরসে ফুলে ভরা। আরো ভেসে উঠল একটি অবয়ব, সেটিও ঝাপসা। সে অবয়বের সাথে রমজান মায়াবী তরুণীর কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য দেখতে পেল।

সাতাশ বছরের যুবক রমজান মফস্বলের মানুষ। নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া। অর্থ কষ্টে আর এগুতে পারেনি। পরবর্তীতে কাজের ধান্ধায় চলে আসে ঢাকায়। পরিচিত এক লোকের মাধ্যমে চাকরি পায় কাপ্তান বাজারের খ্রিস্টার হোটেল রবিন এ– হোটেল বয় হিসেবে। এ হোটেলেই তার সাথে পরিচয় হয় মি: সলিমুল্লার সাথে।

সলিমুল্লা পাকিস্তানি নাগরিক। সে রবিন হোটেলের নিয়মিত বোর্ডার। ঢাকায় এলেই সে এ হোটেলে ওঠে।

সলিমুল্লা মাসে বার দুয়েক ঢাকায় আসে।

সলিমুল্লাই রমজানকে বর্তমান কাজের প্রস্তাব দিয়েছে। কাজটা কিছুটা অদ্ভুত– শুধু মাসে দু'চার বার ঢাকা-দুবাই যাওয়া-আসা। রমজান এ প্রস্তাবে যেন হাতে চাঁদ পেল।

দুবাই যাওয়া রমজানের বহু দিনের স্বপ্ন। তার গাঁয়ের অনেক ছেলে ইতোমধ্যে দুবাই পাড়ি দিয়েছে। রমজানও বার দু'য়েক চেষ্টা নিয়েছে– কিন্তু অর্থ সংস্থান হয়নি।

সলিমুল্লার সাথে পরের সপ্তাহেই রমজান স্বপ্নের শহর দুবাইতে চলে গেল। যোগ দিল নতুন কাজে। দু'চার দিনেই রমজান বুঝেছে, কাজটায় কিছু ঝুঁকি আছে, তবে টিকে থাকতে পারলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

বছর দেড়েক হলো রমজান এ কাজে নিযুক্ত হয়েছে। সে এখনও তার মূল বসকে দেখেনি। তার কাছে নির্দেশ আসে কয়েক হাত ঘুরে।

রমজানকে মাসে দু'বার ঢাকা-দুবাই করতে হয়। ইতোমধ্যে সাত বার সে যাতায়াত করেছে। দুবাইয়ে তার থাকা খাওয়া সুব্যবস্থা আছে। তাকে রাখা হয় এয়ারপোর্টের সন্নিকটে হোটেল আল হামরা-তে। যখন কাজ থাকে না তখন রমজানকে সময় কাটাতে হয় হোটেল কক্ষে ঘুমিয়ে নয়তো টিভি দেখে। দুবাইয়ে তার দৌড় এয়ারপোর্ট টু হোটেল – হোটেল টু এয়ারপোর্ট। এর বাইরে তার ঘোরাফেরা সম্পূর্ণ নিষেধ। রমজানের অবশ্য খারাপ লাগে না। কাজের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টুকু সে বেশ উপভোগ করে।

এর মধ্যে রমজান সাতটি অ্যাসাইনমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। তার নিয়োগকর্তারা তার ওপর সন্তুষ্ট। রমজানের অ্যাসাইনমেন্টগুলো বেশ বৈচিত্র্যময়। একটির সাথে অন্যটির কোনো মিল নাই।

বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টে রমজানের দায়িত্ব একটি ছোট্ট পার্সেল একজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কাজটি তাকে করতে হবে বিমান আকাশে থাকা অবস্থায়। কিভাবে কার কাছে প্যাকেটটি পৌঁছাবে সে বিষয়ে তাকে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। শুধু সংকেত দেওয়া হয়েছে– পরী আসবে পানির বোতল নিয়ে। সেই পরীর কাছেই তুলে দিতে হবে পার্সেল। এ সাংকেতিক নির্দেশ মাথায় নিয়ে রমজান অস্বস্তি নিয়ে বসে আছে স্যান্ডুইচ সিটে–পরীর অপেক্ষায়। রমজানের অস্থিরতা আবার ফিরে আসতে শুরু করল।

বিমান এগিয়ে চলছে। গন্তব্য আর ঘণ্টা দেড়েকের পথ।

শীতের রাত, মাথার ওপর ফুল এসি চলছে। তবু রমজান ঘেমে উঠেছে। তার মাথার দু পাশের শিরা টিস্ টিস্ করছে। রমজানের ইচ্ছা হলো সমস্ত পোশাক খুলে দিগম্বর হয়ে যায়। তা সম্ভব হলো না। রমজান শুধু তার গায়ের জ্যাকেটটি খুলে ফেলল।

জ্যাকেট খুলে রমজান সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুঁদে রইল। তার একটু নিদ্রাভাব হলো। এ নিদ্রালু অবস্থায় সে স্বপ্নে দেখল– আকাশ ধবল জোছনায় চিক চিক করছে। সেই জোছনার মধ্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অপূর্ব সুন্দরী এক পরী। পরীর হাতে কিছু একটা আছে। কি আছে রমজান তা বুঝতে পারছে না। হঠাৎ পরীর সোনালি পাখা দুটি খসে পড়ল। পরী ডিগবাজি খেয়ে সবেগে ধাবিত

হলো মর্ত্যের দিকে। এ দৃশ্যে ঘুমের মধ্যেই রমজান আঁতকে উঠল।

হঠাৎ ঠক্ শব্দে রমজানের নিদ্রাভাব চলে গেল। রমজান চোখ মেলে সামনে তাকাল। দেখল, একজন বিমানবালা মেঝে একটি মিনারেল ওয়াটারের বোতল তুলে নিয়ে তার দিকে চেয়ে সোজা হচ্ছে। বিমানবালাটি পানির বোতল কুঁড়িয়ে দাঁড়াতেই রমজানের চোখ তার চোখে আটকে গেল। রমজান বিমানবালার চোখের পাতা সামান্য নড়ে উঠতেও দেখল। রমজান কিছুটা ভ্যাবা-চ্যাকা খেল। তারপর হঠাৎ তার মাথায় ফিরে এলো সেই সংকেত বাণী–পরী আসবে পানির বোতল নিয়ে। সাথে সাথে রমজানের ডান চোখের পাতাও মৃদু সংকোচিত হলো। বিমানবালা এক্সকিউজ মি বলে অপসৃত হলো।

রমজান বির বির করে বলে উঠল– ইউরেকা! চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী– এই তো সেই পরী। পরীর হাতেও আছে পানির বোতল। সব ঠিক-ঠাক মিলে যাচ্ছে। এর কথাই তাকে বলা হয়েছে।

রমজান লক্ষ্য করল-পরীর বুকে লাগানো নেম প্লেটে লেখা, 'শাকিরা'। রমজান বুঝল, এ পরীর কাছেই পৌঁছাতে হবে পার্সেল।

পার্সেলে কী আছে রমজান তা জানে না। তাকে শুধু বলা হয়েছে– পার্সেল হস্তান্তরের কাজটি সারতে হবে অতি সংগোপনে– দ্রুত।

শাকিরা বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের একজন বিমানবালা। এ প্রফেশনে সে আছে বছর দু'য়েক। শাকিরা সুন্দরী এবং উচ্চাভিলাষী। তার উচ্চাভিলাষই তাকে একটি বিশেষ কাজে সংশ্লিষ্ট হতে প্রভোক করেছে। কিভাবে করেছে সে প্রসঙ্গ ভিন্ন। আপাতত তা তোলা থাক।

রমজানের মতো শাকিরাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিমান যখন ঘণ্টা দেড়েকের দূরত্বে থাকবে তখন তাকে ওয়াই ক্লাসের কেবিনে ঢুকতে হবে। এ কেবিনের 'ডি' সারির সিটের কাছাকাছি এসে একটি মিনারেল ওয়াটারের বোতল মেঝেতে ফেলে দিতে হবে। তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে 'ডি' সারির মাঝখানের সিটের লাল সার্ট পরিহিত ব্যক্তিটির দিকে। গতকাল দুবাই এয়ারপোর্ট সংলগ্ন হোটেল আল-ফালাহর অভিজাত রেস্টুরেন্টের লাঞ্চ টেবিলে মিঃ কাজেম কোরাইশী তাকে এভাবেই ব্রিফ করেছে।

শাকিরা নির্দেশমত কাজ করেছে। সে তার কন্টাক্টকে লোকেট করতে সমর্থ হয়েছে। এখন শুধু নির্বিঘ্নে পার্সেলটি বুঝে নেওয়া। এ মুহূর্তে রমজানের মতো সেও অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেছে।

ঠিক পনের মিনিট পর রমজান সিট থেকে উঠে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, যাত্রী কেবিন নীরব– প্রায় সকলেই নিদ্রামগ্ন। শিশুটিও কান্না থামিয়ে মায়াবতীর বুকে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। শিশুর সাথে মাও নিদ্রামগ্ন তবে তার কাপড়-চোপড় আলুথালু। কিন্তু রমজানের সেদিকে তাকানোর ফুরসৎ নেই।

রমজান মাথার উপরকার হ্যান্ড লাগেজ-কেবিন খুলে দ্রুত হাতে তার ব্যাগ থেকে ছোট পার্সেলটি নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ভরল। সন্তর্পণে সে বিমানের পেছনের দিক অগ্রসর হলো। ভাবখানা এই যে, সে টয়লেটে যাচ্ছে। কিন্তু রমজানের এবারের লক্ষ্য টয়লেট না– শাকিরার সাথে সাক্ষাৎ।

বিমানের পেছনের দিকের টয়লেটের কাছে শাকিরা একা। তাকে দেখে মনে হবে সে অত্যন্ত কর্ম ব্যস্ত। আসলে সে অপেক্ষা করছে রমজানের জন্য। তার একটি চোখ পড়ে আছে 'ডি' সারির মাঝখানের সীটের যাত্রীর দিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রমজান শাকিরার কাছে পৌঁছে গেল।
রমজান– ম্যাডাম একটু পানি হবে?
শাকিরা– ওয়েট এ মিনিট স্যার।
অতঃপর শাকিরা কেবিন থেকে একটি পানির বোতল নিয়ে রমজানের কাছ ঘেঁষে এলো।
রমজান-শাকিরা পরস্পর পানির বোতল ও পার্সেল হস্তান্তর সম্পন্ন করল।

রমজানের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তার দায়িত্ব শেষ। সে এখন নির্ভার। হঠাৎ তার তীব্র পেশাবের বেগ হলো। রমজান টয়লেটে ঢুকল। অত্যন্ত আরামের সাথে প্রক্ষালন কর্ম সেরে সে সিটে ফিরে এলো।

সিটে ফিরে রমজান দেখল মাওলানা পূর্ববৎ নিদ্রামগ্ন। তার নাসারন্দ্র থেকে ছন্দোবদ্ধ শব্দ নির্গত হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় সে তখনও পান চিবিয়ে যাচ্ছে। তবে তরুণ যুবকটি সিটে নেই। তার দ্বিতীয় বীয়ার ক্যানটির মুখ খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে মাওলানার সামনের ট্রে'তে। রমজান কিছুটা বিস্মিত হলো।

রমজান যখন সিট ছেড়েছে ঠিক তখন সান গ্লাসধারী যুবকও নিজের সিটে নড়ে চড়ে বসল। এতটা সময় সে নিদ্রার ভান করেছে মাত্র। যুবক রমজানকে অনুসরণ করে ভিন্ন করিডোর দিয়ে বিমানের পিছন দিকে এগোল। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সে রমজান-শাকিরার পার্সেল হস্তান্তরের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করল। যুবকের ঠোঁটে ফুটে উঠল স্মিত হাসি।

মিনিট দশেক হলো দুবাই থেকে ছেড়ে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের বোয়িং ৩৭৭ এয়ারক্রাফটি হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করেছে। ধীরে ধীরে টেক্সি করে এগিয়ে যাচ্ছে বোর্ডিং ব্রিজের দিকে। যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। তারা অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক এ সময় সানগ্লাস পরিহিত যুবকের মোবাইল ফোনটি চালু হলো।

যুবক তার ফোনে দ্রুত একটি ক্ষুদে বার্তা লিখে সেন্ড করল। বার্তাটির গন্তব্য বাংলাদেশ কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স এর মহাপরিচালক ইফতেখার শামস এ গ্যালাক্সি নোট থ্রি। এ বার্তাটির জন্যই ভোর চারটা থেকে জনাব শামস নিদ্রাহীন চোখে অপেক্ষমাণ।

গত সপ্তাহে মি: শামস রিজিওন্যাল ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো অফিস (রাইলো) থেকে তিনি একটা কোডেড মেসেজ পান। মেসেজটি পাওয়ার পর তিনি তার দক্ষ অফিসারদের সাথে গোপন সভা করেন। সভায় বিশেষ একটি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে চৌকস একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে দুবাই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভোর রাতে মোবাইলে ক্ষুদে বার্তাটি পাওয়ার পর মি: শামস ত্বরিত অ্যাকশনে গেলেন। ওয়াকিটকিতে হযরত শাহজালাল এয়ার পোর্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তিনি বিশেষ কিছু নির্দেশ দিলেন।

মাস্তান যুবক যে সময়ে তার মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা সেন্ড করল ঠিক একই সময়ে অপর একজনও তার আইফোনে একটি ক্ষুদে বার্তা লিখে সেন্ড করল। রমজান যে ঠিকঠাক যথাস্থানে পার্সেল ডেলিভারি সম্পন্ন করেছে ঐ ক্ষুদে বার্তা সে তথ্যই বহন করেছে।

যাত্রীদের অবতরণ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে রমজান সাধারণ যাত্রীদের সাথে মিশে বেরিয়ে গেছে। তার আপাত গন্তব্য হযরত শাহজালাল আন্তজার্তিক বিমানবন্দরের ট্রানজিট লাউঞ্জ। দু'ন্টা পর সে আরোহণ করবে এমিরেটসের সকালের ফ্লাইটে– ফিরে যাবে দুবাইতে। ইতোমধ্যে টয়লেটে ঢুকে রমজান তার বেশভূষা পাল্টে নিয়েছে।

সান গ্লাসধারী যুবক বিমান থেকে বেরিয়ে এসে বোর্ডিং ব্রিজের শেষ মাথায় দাঁড়াল। এই যুবক কোনো মাস্তান যুবক নয়– সে ছদ্মবেশী কাস্টমস ইন্টেলিজেন্সের কর্মকর্তা গোলাম হায়দার রোজ। ইতোমধ্যে সেখানে সিভিল ড্রেসে পৌঁছে গেছেন বিমানবন্দর কাস্টমস ইন্টেলিজেন্সের কর্মকর্তাদের একটি দক্ষ টিম। তারা সকলে অপেক্ষা করছে শাকিরার নির্গমন পথ চেয়ে।

একে একে সব যাত্রী বেরিয়ে গেল। এরপর একসাথে বেরিয়ে এল ক্রু মেম্বার ও পাইলটগণ। এ দলে শাকিরা নেই। দলটি বোর্ডিং ব্রিজ সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে দেখা গেল শাকিরাকে। ক্রু ব্যাগ হাতে ধীর পায়ে সে হেঁটে আসছেন। তার যেন কোনো তাড়া নেই। সবাই চলে গেলেই যেন তার সুবিধা। শাকিরার পরবর্তী গন্তব্য হোটেল সোনার গাঁও।

বিমান থেকে বেরিয়ে শাকিরা বোর্ডিং ব্রিজের মাথায় আসতেই শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী কমিশনার সিঁথি শবনম তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বলল– এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আপনাকে আমাদের সাথে একটু আসতে হবে। মুহূর্তে শাকিরার মুখ থেকে সবটুকু রক্ত সরে গেল– বুঝতে পারল, সে ধরা পড়ে গেছে।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মাওলানা শাকিরার ধরা পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। সে দ্রুত হাতে মোবাইল তুলে নিল। সাকিরার লেটেস্ট স্ট্যাটাস সম্পর্কে রিপোর্ট করল মিঃ পিটারকে। তারপর সটকে পড়ল দ্রুত। এখন মাওলানার মাথায় ক্যাপ নেই, নেই মুখের কুচকুচে কালো দাড়িও।

শাকিরার কেবিন ব্যাগ সার্চ করা হলো। ব্যাগে পাওয়া গেল স্যালোফিন মোড়া একটি ছোট্ট সুদৃশ্য পাকেট। প্যাকেট ভর্তি সাদা পাউডার। বিমানবন্দর মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা এ পাউডারকে হিরোইন বলে শনাক্ত করলেন।

হেরোইন বহনের দায়ে শাকিরাকে পুলিশে সোপর্দ করা হলো। পুলিশ তাকে ইন্টারোগেট করল। শাকিরার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল দ্রুত রওনা দিল হোটেল সোনারগাঁও অভিমুখে। ঢাকা শহরের কমপ্যাক্ট যানজট ঠেলে দেড় ঘণ্টা পর দলটি উপস্থিত হলো হোটেল সোনারগাঁয়ের স্যুট নম্বর-৩ এ। কিন্তু সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না।

শাকিরার মাল ধরা পড়েছে। সে ঐ মালের বাহক মাত্র। মাদক চোরাচালানের গুরুত্বপূর্ণ সিন্ডিকেট সদস্য পিটার গোনজালেস রয়ে গেল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সে মেক্সিকান নাগরিক। মাওলানার ফোন পেয়ে অনেক আগেই পিটার সোনারগাঁও হোটেল থেকে সটকে পড়ছে। সে এখন আছে শহরের অভিজাত এলাকার একটি সেফ হাউজে। সেফ হাউজের আরামদায়ক সোফায় বসে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পিটার ভাবছে নতুন কোন 'পরী' রিক্রুটের কথা। হয়তো সেই পরীর হাতে পানির বোতলের পরিবর্তে থাকবে স্বর্ণ-পিদিম।

এ ঘটনার ঠিক ৩৭ দিন পরের এক সকাল। ইফতেখার শামস বসে আছেন অফিস কক্ষে, পাশে ধূমায়িত কফি'র কাফ– উল্টাচ্ছেন সে দিনের দৈনিক পত্রিকার পাতা। হঠাৎ পত্রিকার একটি ছোট রিপোর্টের ওপর তাঁর চোখ আটকে গেলো। রিপোর্টটি হলো– হেরোইন চোরাচালানের দায়ে আটক বিমান সেবিকা শাকিরা বেকসুর খালাস। কেমিক্যাল টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে শাকিরা যে প্যাকেট বহন করছিল তার ভিতরকার সাদা পাউডার এক ধরনের প্রসাধনীসামগ্রী যা ত্বক উজ্জ্বলকরণে ব্যবহার্য।

রিপোর্টটি পাঠ করে ইফতেখার শাম্‌স রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় পাথর বনে গেলেন।

- মোঃ জামাল হোসেন, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর

বাঙ্গালোরে গোয়েন্দা বাঙাল

-মোঃ আনোয়ার হোসাইন

আজ থেকে ঠিক এক দশক আগে। ২০০৬ সাল। আমি তখন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যুগ্ম-মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত। এপ্রিলের প্রথম সপ্তায় ভারতের বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত Asia Pacific Region, WCO Data Model Seminar এ যোগ দিতে গিয়েছি। হোটেল তাজ বেঙ্গালুরুতে সেমিনারের উদ্বোধন করেন ভারতের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম। অতিথি ছিলেন কর্ণাটক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এইচ. ডি. কুমারাস্বামী। বিশেষ অতিথি বক্তা ভারতীয় বিশিষ্ট ধনকুবের ব্যবসায়ী আজিম প্রেমজী। প্রেমজী একাধারে সুদর্শন এবং একজন সুবক্তা। সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলেন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় সবগুলো দেশের প্রতিনিধি এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে ইইউ এর একটি দল।

২০০৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ভারতের মুম্বাই, দিল্লী এবং বানারসীতে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ হামলাটি ছিলো ২০০৬ সালের ৭ মার্চ বানারসীতে। মাত্র একমাস আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার কারণে সেমিনার ভেন্যু তাজ হোটেলে মাত্রাতিরিক্ত নিরাপত্তার কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। [আরো বছর দুই পরে ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বাই তাজ হোটেলে ভয়াবহতম সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাটি ঘটে।]

এই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়েই আমাদেরকে সেমিনার কক্ষে ঢুকতে হয়। বিদেশ গেলেই আমি কাঁধে একটা ঝোলা-টাইপ ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখি। এবারও সেরকম। ব্যাগের মধ্যে একটা কম্প্যাক্ট ক্যামেরা, ভয়েস রেকর্ডার, ডিজিটাল অর্গানাইজার, মোবাইল ফোন, পাসপোর্ট, কিছু ডলার, ইন্ডিয়ান রুপি আর জরুরি কাগজপত্র। আমি একজন গিজমো। এ বিষয়ে আমার বরাবরের অবসেশন। আমার গ্যাজেটগুলো নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে অনেকটা অচেনা মনে হলো। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা, নাড়াচাড়া, সন্দেহ আর জেরা সামলাতে গিয়ে বিব্রত, বিরক্ত হয়ে উঠেছি। সেমিনার আইটি বিষয়ক। এনেছে দাওয়াত দিয়ে। নিরাপত্তারক্ষীরা এসব গ্যাজেটস চেনে না! বিরক্তির যথেষ্ট কারণ থাকারই কথা।

যাবতীয় ঝক্কি সামলে উদ্বোধনী হল রুমের মাঝামাঝি একটা আসন নিয়ে বসলাম। অত্যন্ত জমকালো, অভিজাত আর ডিজিটাল থিমে সাজানো কক্ষ। আমার পাশে বসা ভদ্রলোক ইয়া - লম্বা। প্রৌঢ়। শ্বেতাঙ্গ ডাচম্যান। খুব অল্প সময়েই ভাব হয়ে গেলো। আজিম প্রেমজী এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ, ব্যবসা ও বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে চমৎকার একটা বক্তৃতা দিয়েছেন। উদ্বোধন পর্ব শেষ হওয়ার পর চা বিরতিতে আমরা প্রেমজীর বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করতে করতেই হলের পাশে লবীতে চলে আসলাম টি-স্ন্যাক্স কাউন্টারে।

কাঁধের ব্যাগটা ভারী হওয়ায় আমার আসনের (চেয়ার) নিচে ওটা রেখে বের হয়েছিলাম। ডাচ ভদ্রলোক ইতস্তত করে জানতে চাইলেন এখানে ব্যাগ রেখে আসাটা নিরাপদ কি না? আমি বললাম - নিরাপত্তা ব্যবস্থার যা কড়াকাড়ি তাতে তো নিরাপদই মনে হয়। উনি এই কথায় তার ব্যাগটাও রেখে আসলেন। একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত প্রদর্শনী স্টলগুলোতে আমরা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। ASYCUDA স্টলে দেখা রেনো ম্যাসোনে'র সাথে। সে বাংলাদেশ কাস্টমস-এ ASYCUDA প্রবর্তন এর সাথে জড়িত থাকার সুবাদে দীর্ঘদিনের পরিচিত। তার সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে এসে দেখি সিটের নিচে রাখা আমার ব্যাগটি গায়েব!
ভাবলাম-আমি যা ভয়ানক ভুলো তাতে হয়তো অন্য কোথাও রেখে এসেছি। তন্ন তন্ন করে আশপাশে খুঁজলাম। মাথা চাপড়ে মনে করার চেষ্টা করলাম। আমার ভুল হলো কি না? খুঁজতে গিয়ে লবিতে এসে ডাচ ভদ্রলোকের সাথে দেখা। নির্লিপ্ত কৌতুক মিশ্রিত হাসিতে জানতে চাইলো আমার ব্যাগ খোয়া গেছে কি না? আমি উদ্ভ্রান্ত। সেই হাসিতেই জানালো তার ব্যাগটিও গায়েব। আমার তো জ্ঞানশূন্য হওয়ার জোগাড়! ওই ব্যাগের মধ্যেই তো আমার পাসপোর্ট, টাকা আর প্রিয় সব জিনিস! বাকিগুলো না হয় গেলো; কিন্তু পাসপোর্ট ছাড়া দেশে ফিরবো কিভাবে!
শুরু হলো আমার দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি। কাছাকাছি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর যে লোকটি আলো আর শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্যে বসা ছিলো তার কাছে জানতে চাইলাম সে কিছু দেখেছে কিনা? উত্তর 'না' সূচক। সিকিউরিটির লোকদের কাছে গিয়ে জনে জনে ধর্ণা দিলাম। সব নির্বিকার। বলে অন্য কোথাও রেখেছ কি না খুঁজে দেখো। এখানে যা কড়াকড়ি চুরি হওয়ার কেনোই সম্ভাবনা নেই। গেলাম হোটেল ম্যানেজারের কাছে। তারও একই কথা। নির্বিকার উত্তর-অন্য কোথাও খুঁজে দেখো। আমার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, বিরক্তি হতাশা সময়ের সাথে সাথে ধৈর্য্যের বাঁধভাঙ্গা ক্ষোভে পরিণত হয়েছে।

আমার উষ্মা দেখে ম্যানেজার পরামর্শ দিলো-কাছাকাছি একটা পুলিশ স্টেশন আছে। ঘটনা যা-ই হোকনা কেন তোমার ব্যাপারটা ওদেরকে জানানো উচিত। আমাকে হোটেলের একজন এক্সিকিউটিভ আর একটা গাড়ি দেয়া হলো। স্মার্ট এক্সিকিউটিভ। কিন্তু তাকে খুবই বিরক্ত দেখাচ্ছে। যেখানে আসলাম সেখানে বেঙ্গালুরু মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার বসেন। আমি সরাসরি তার সাথে দেখা করতে চাইলাম। অফিসটা নোংরা। আমাদের দেশের পুলিশ স্টেশনগুলোর মতো। আশপাশে গিজগিজ করা লোকগুলোকে টাউট-বাটপার টাইপ মনে হলো। ডিসি'র সাথে দেখা করতে চাওয়ায় এমন ভাব দেখালো যেন আমি সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার আব্দার করছি। বলা হলো নিচে থেকে ধাপে ধাপে আমার সমস্যার কথা জানিয়ে খুব দরকারী হলে তার দেখা মিলতে পারে। আমি গোঁ ধরলাম। অবশেষে হোটেলের ম্যানেজার ফোন করলে আমাকে ডিসি সাহেবের রুমে ঢুকতে দেয়া হলো। তার রুম ভর্তি লোকজন। দক্ষিণ ভারতীয় লোকদের চেহারাই কেমন জানি রূঢ় মনে হয়। বোঝাই যাচ্ছে রুমের লোকগুলো মূলত রাজনৈতিক পান্ডা। ডিসি সাহেব বিরক্ত মুখে জানতে চাইলেন - আমি কী চাই। বললাম আমার সমস্যার কথা। উনি জানালেন আমাকে এফআইআর করতে হবে। ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে কী কী জিনিস হারানো গেছে - স্থান, কাল, পাত্র, সন্দেহজনক ব্যক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু লিখতে হবে। শেষে বললেন এভাবে তো রফা হবে না। তদন্ত হবে। অনেক সময় লাগবে। অতঃপর আমাকে একজন এএসআই-এর হাওলা করে দিলেন আমার বৃত্তান্ত লিখতে সহযোগিতা করার জন্যে। উনার রুম আরেক হাট-বাজার। হরেক কিসিমের মানুষ সেখানে। আমাকে বসতে বললেন। কয়েক মিনিট বসে থেকে অধৈর্য্য হয়ে বললাম আমি পরে এসে দেখা করবো।

ভারতীয় ঊর্ধ্বতন কাস্টমস কর্মকর্তা, ডব্লিউসিও এবং অংশগ্রহণকারী এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ

পুলিশ স্টেশন থেকে ফিরে এসে হোটেল ম্যানেজারকে বললাম-দেখো, আমি একটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করি। তোমাদের এখানে অতিথি। তোমাদের নামি অভিজাত হোটেল। আমাকে সহায়তা না করলে একটা লংকা-কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবো। তখন তোমাদের সহ আয়োজক এবং তোমাদের দেশের মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। ম্যানেজার কিছুটা ঘাবড়ে গেছে মনে হলো। আমার কাছে জানতে চাইলো 'তুমি কী করতে চাও?' আমি বললাম- 'তোমাদের তো সিসি ক্যামেরা আছে' সেখানে চেক করে দেখতে পারো'। ম্যানেজার জানালো - পুরো হোটেল জুড়ে কয়েকশ' ক্যামেরা। আলাদা করে এই ঘটনার অনুসন্ধান যথেষ্ট সময় ও ঝক্কির ব্যাপার। তাছাড়া এ বিষয়ে কোনো আদেশ দেয়ার ক্ষমতা তার নেই। আমি বললাম - আমি নিজেই ক্যামেরা কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ব্যাপারটা তদারক করতে চাই। সে জানালো এটা সম্ভব না। একজন রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার হোটেলের যাবতীয় নিরাপত্তার বিষয়টা দেখেন। তিনি এখন মুম্বাইতে আছেন। তার পারমিশন ছাড়া হোটেলের সেকেন্ড বেসমেন্টে সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুমে কেউ যেতে পারবে না। ততোধিক ইতস্তত করে বললা - তাছাড়া তুমি একজন বিদেশি।

আমি বললাম বিদেশি বলেই আমার ব্যাপারটা তোমাদের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। আমি ক্যামেরা কন্ট্রোলে না বসলে তোমরা টাইম-সিক্যুয়েল বুঝবে না। এক সপ্তাহ ঘাঁটাঘাঁটি করেও কিছু উদ্ধার করতে পারবে না।

ম্যানেজার ইতস্তত করছে দেখে আবার হুমকি দিয়ে বললাম-তোমার ব্রিগেডিয়ারকে ফোনে মিলাও। আমি কথা বলবো। নিতান্তই নিম-ভাবে কতক্ষণ ফোন টেপাটেপি করে বিরস মুখে বললো- পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নাছোড়। অনেকক্ষণ পর পাওয়া গেলো নিরাপত্তা প্রধানকে। আমি এক প্রকার ফোন কেড়ে নিয়েই কথা বললাম। তাকে নিশ্চিত করলাম তাদের নিরাপত্তায় আমি কোনোই ব্যাঘাত ঘটাবো না। তাছাড়া আমার কিঞ্চিৎ আইটি এবং গোয়েন্দা নিরাপত্তা জ্ঞান আছে। সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে বিষয়টা উদ্‌ঘাটন করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। ব্যাপারটা আমার জন্যে বিপর্যয়কর এবং তাদের জন্যে সম্মান-হানিকর নয় বলেও তাকে কনভিন্স করতে পারলাম। ব্রিগেডিয়ার লোকটাকে সজ্জন বলে মনে হলো। আমি বাংলাদেশি জেনে কিছুটা উৎসুক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। ভাঙ্গাভাঙ্গা কয়েকটা বাংলাও বললেন। তিনি বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চলের মানুষ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের হয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং কুমিল্লা-আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছিলেন যুদ্ধ জয়ের শেষ দিনগুলোতে। আমাকে বললেন-একজন সিকিউরিটি অফিসার তোমাকে কন্ট্রোলরুমে নিয়ে যাবে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবে। কন্ট্রোল রুমটা সেকেন্ড বেজমেন্টে। অনেক ঘোরপ্যাঁচ করে আমাকে দুর্গ মতো একটা রুমে ঢুকানো হলো। চারদিকে সার্ভার, ডিভিআর এবং অনেকগুলো মনিটর। ঠাসাঠাসি করে রাখা। বেশ কয়েকজন সেগুলো অপারেট করছে। একজন আমাকে নিয়ে বসলেন মনিটরের সামনে। আমার একটা অভ্যাস হচ্ছে ঘন ঘন ঘড়ি দেখা। যেকোনো ট্রানজিশনে আমি সময় দেখে রাখি। যা দিয়ে একটা সিক্যুয়েল তৈরি করা যায়।

সেমিনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একাংশ চিত্র

অপারেটরকে ব্রিফ করতে শুরু করলাম। তোমাকে কয়েকটা ক্যামেরার রেকর্ড রিভিউ করতে হবে। আমি খুব কাছাকাছি সময় বাতলে দিতে পারবো। টেনশন করো না। বেশি সময় নিবো না। গাড়ি বারান্দায় (Porch) এ যে ক্যামেরাটা আছে তার রেকর্ড বের করো প্রথমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে ঠিক সাড়ে ন'টায়। আমি যখন বাস থেকে নামি তখন একবার ঘড়ি দেখেছিলাম। নয়টা পাঁচ মিনিট। কাছাকাছি সময়ে ভিডিও সার্চ করে আমাকে পাওয়া গেলো। গাড়ি থেকে নামছি। আমার কাঁধে মাঝারি আকারের লাল স্ট্রাইপ কালো ব্যাগ। এটা জুম করে ফ্রিজ করো। স্টিল শট নিয়ে সেভ করো। এরপর লবিতে। স্পাইরাল সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলার লবিতে ঢুকছি। আমার কাঁধে ব্যাগ। দোতলার লবি থেকে সিকিউরিটি চেক। সেখানে আমার ব্যাগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখেছিলাম। নয়টা পনের। স্টিল শট। আমি কনফারেন্স হলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছি। আমার কাঁধে ব্যাগ। হলের ভেতর ক্যামেরা নেই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে চা-বিরতির সময় ঘড়ি দেখছি। দশটা বত্রিশ মিনিট। আমি হল থেকে রিফ্রেশমেন্ট লবিতে ঢুকছি। আমার কাঁধে ব্যাগ নেই। স্টিল শট। সেভ। রিফ্রেশমেন্ট এবং এক্সিবিশনে ঘোঁরাঘুঁরি শেষে আবার হলে ঢুকছি। এগারোটা পঁচিশ। আমার কাঁধে ব্যাগ নেই। ফ্রিজ। হলের ভেতর থেকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বেরুচ্ছি। ব্যাগ নেই। এগারোটা বত্রিশ। তার মানে হচ্ছে-দশটা বত্রিশ থেকে এগারোটা পঁচিশ পর্যন্ত এই ৫৩ মিনিট সময়ের মধ্যে ব্যাগটা খোয়া গেছে। এই সময়ের ভেতর ব্যাগ (যা ক্যামেরায় জুম করে আইডেন্টিফাই/সেভ করা হয়েছে) নিয়ে কেউ বাইরে গেছে কিনা সেটা দেখার জন্যে বড়জোর ৫৩ মিনিটের পুরো ভিডিও দেখতে হবে অন্তত তিনটা

রেনো মেসোনে'র সাথে এস্যাইকুডা ওয়ার্ল্ড এক্সিবিশন স্টলে

ক্যামেরায়। হলের গেট, লবি, সিঁড়ি। প্রথম ক্যামেরায় ক্লু পাওয়া গেলে পরের কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে।

রিওয়াইণ্ড। প্লে ক্যামেরা থার্টি টু। সেটা কনফারেন্স থেকে বেরুনোর দরজায়। দশটা বত্রিশ থেকে শুরু। পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট। সাড়ে সাত মিনিট। ভিড়ের মধ্যে একজনকে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রাকারে। অস্পষ্ট। হাতে ব্যাগ। ভালো বোঝা যাচ্ছে না। ওয়াইণ্ড। রি-ওয়াইণ্ড। ক্যামেরা থার্টি থ্রি অন। এবার ক্লিয়ার। লাল স্ট্রাইপ দেয়া কালো ব্যাগ সামনে - পেছনে করে দ্রুত বের হচ্ছে অনুমান ২২-২৫ বছর বয়েসী একটা ছেলে। গায়ে নীল টি শার্ট। গলায় ট্যাগ ঝুলানো। কমলা ফিতা। দ্রুত ট্যাগটা খুলে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলছে। ক্যামেরা ফর্টি থ্রি হোটেলের মেইন গেট পেরিয়ে রাস্তায়। এরপর আর ক্যামেরা কভারেজ নেই। জুম করে সেভ করা ছবিগুলো সিকুয়েনিশিয়ালি সাজিয়ে আমাকে কালার প্রিন্ট দাও। অপারেটর ছেলেটা বললো অনুমতি ছাড়া প্রিন্ট তো দেয়া যাবে না। যদিও সে নিজেই আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেলিত। আত্মহারা। তার তিন বছরের চাকরি জীবনে চোর ধরতে পারার ঘটনা এই প্রথম।

আমি বললাম ব্রিগেডিয়ারকে ফোনে মিলাও। আমি অনুমতি চেয়ে নেবো। ব্রিগেডিয়ার সাহেবও শুনে মহাখুশি। আদেশ করলেন এখনই প্রিন্ট দিয়ে দাও। এই প্রক্রিয়ায় সময় লেগেছে পাক্কা দুই ঘণ্টা। বাছাই করা ০৮টি ছবির ০৩টি করে প্রিন্ট নিলাম। তখন রাত আটটা। হোটেল ম্যানেজারকে বললাম-চোর ধরা হয়ে গেছে-আমাকে একটা গাড়ি আর ঐ এক্সিকিউটিভ ভদ্রলোককে সাথে দেবে। থানায় যাবো।

হোটেল লবিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের বিদায়ী সাক্ষাৎ

সেই ডাচম্যানসহ

থানায় এসে দেখলাম ডিসি সাহেব বেরিয়ে গেছেন। জুনিয়র অফিসার ছিলেন। বৃত্তান্ত শুনে তিনি ডিসি সাহেবকে ফোন দিলেন। ভদ্রলোক চলে আসলেন দশ মিনিটের মধ্যেই। কাছেই বাসা। কাহিনী শুনে বললেন আপনাকে তো শুধু চা-খাওয়ালে হবে না। এই বেয়ারা মিষ্টি নিয়ে আসো। জুনিয়র একজন অফিসারকে অর্ডার দিলেন - ফোর্স রেডি করো। অপারেশনে যেতে হবে। আমি ক্লু দিয়ে দিলাম। নীল টিশার্ট আর ফ্লোরোসেন্ট কমলা রংয়ের ফিতাসহ ট্যাগ লাগানো লোকগুলো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট-এর। সিকিউরিটি যখন অনেকক্ষণ লাগিয়ে আমার ব্যাগ তল্লাশি করছিল তখন এই ছেলেটাই কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। পুলিশ হোটেল ম্যানেজারের মাধ্যমে ইভেন্ট ম্যানেজারকে থানায় ডেকে নিয়ে আসলো। ম্যানেজার তার কর্মচারীকে আইডেন্টিফাই করে তার নাম, ধাম, বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছে। আমি বললাম - এফ আই করার ঝামেলায় আমি যেতে চাই না। আপনারা অন্তত আমার পাসপোর্ট টা উদ্ধার করে দিন। যেটা ওর কোনো কাজে লাগবে না।

তবে আমি খোয়া যাওয়া মালামালের লিস্টটা দিয়ে এসেছি। সাথে ঢাকায় আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর। প্রথমে ভাবলাম কোলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনে একটা কপি পাঠিয়ে বৃত্তান্ত জানিয়ে রাখবো, যাতে তারা মালামাল উদ্ধার এবং আমার ঠিকানায় পৌঁছানোর ব্যাপারে সহায়তা করেন। তার আর দরকার হয়নি। কারণ পরদিন সেমিনার হলে এসে পুলিশের দু'জন অফিসার আমার ব্যাগ আর পাসপোর্ট বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আর কোনো সেশন ছিলো না। ছিলো এক্সিবিশন এবং বেঙ্গালুরু সাইট ট্যুর। গ্রুপের সাথে ট্যুর মিস করেছি। তবে সাইট সিইং এর কাজটি আমি আগেই সেরে নিয়েছিলাম। খুবই আনন্দের সাথে সেমিনারের সম্পূর্ণ সেশন শেষ করেছি।

অন্তর্গত ঘটনা হচ্ছে-পুলিশ সে রাতেই ছেলেটার বাড়িতে রেইড করে ব্যাগের মধ্যে কাগজপত্রসহ পাসপোর্টটা খুঁজে পায়। ছেলেটাকে ধরতে পারেনি। সে সম্ভবত গ্যাজেটগুলো বেচা-বিক্রির জন্যে কোথাও নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে সেই ব্যাগ আর পাসপোর্ট পুলিশ বুঝিয়ে দিয়ে যায়। আর আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ব্যাঙ্গালোর পুলিশের ডিসি সাহেব আমাকে ফোন করে জানান, ছেলেটাকে ধরে জেলে পোরা হয়েছে। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছিলো। তার কাছ থেকে কম্প্যাক্ট ক্যামেরাটি আর ডিজিট্যাল অর্গানাইজার উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো সম্ভবত সে বিক্রি করতে পারেনি। উদ্ধার করা বস্তু দুটি আমাকে কিভাবে পাঠাবেন জানতে চাইলে বললাম আমার এক পরিচিত ছাত্র আছে ব্যাঙ্গালুর আইআইটিতে আমি তাকে অথরাইজ করতে চাই। তিনি রাজি হলেন। ঐ ছাত্রের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ মাস পর গ্যাজেট দুটি ফিরে পাই।

পাদটীকায় দুটি কৌতুক-আনন্দের ঘটনা বলে রাখি।

ক) সেই যে আমার পাশের সিটে বসা ডাচ-ম্যান। নিজের ব্যাগ উদ্ধারে তার কোনো আগ্রহ ছিলো না। বরং এই ঘটনায় তিনি মজা পেয়েছেন এজন্যে যে, ব্যাগে কিছু কাগজপত্র ছিলো যেগুলো তেমন দরকারী নয়। ইন্ডিয়া যাবার বিষয়ে তার স্ত্রী তাকে সাবধান করে বলেছিলেন দেশটা চোর-বাটপারে ভরা। তিনি যাতে বুঝে চলাফেরা করেন। আমাদের ব্যাগ চুরি যাবার পর স্ত্রীকে ফোনে ঘটনাটা জানিয়ে অনেক আনন্দ পেয়েছেন।

খ) সেমিনার শেষে পরদিন আমার ফ্লাইট ছিলো বিকেলে। আর বেশীরভাগ দেশের অংশগ্রহণকারীর ফ্লাইট ছিলো দুপুরে। সকাল আটটার দিকে হোটেলের লবি থেকে রুমে একটা ফোন আসে। আনোয়ার তোমার জন্যে আমরা হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করছি। তুমি আসো। হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে আসি। লবিতে জড়ো হওয়া সবাই চিৎকার করে উঠলো। হিপহিপ-হুররে ফর আনোয়ার। আমি হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে থাকলাম। কয়েকজন ছোটখাট কিছু বক্তৃতা করলো। এর নেতৃত্বে ছিলো একজন জাপানি কাস্টমস সহকর্মী সতীর্থ আর মালদ্বীপের আরেকজন। বক্তৃতায় আসলো আমার সাহস আর ত্বরিৎ - কর্মের প্রশংসা এবং টাকা পয়সা ও মালামাল খোয়া যাওয়ার বিষয়ে সহানুভূতির কথা। এরপর আমাকে বিস্ময়, বিব্রত আবেগাবিভূত করে আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে বললো-এখানে সাড়ে সাতশো ডলার আছে। আমরা তোমার জন্যে চাঁদা তুলে জোগাড় করেছি। এটা খুবই সামান্য! তবে আমাদের ভালোবাসার উপহার। একই সাথে ভীষণ বিব্রত বিপন্ন আর ভাবাবেগে আক্রান্ত হলাম। অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। জীবনে এই প্রথম আমার কোনো দান দয়া দাক্ষিণ্য গ্রহণ। 'না' করি কিভাবে! এটা যে ভালোবাসার দান! আমার সাথে সবাই যখন কোলাকুলি করছিল তখন আমি হু হু করে কাঁদছিলাম। এটা জীবনের প্রথম আনন্দ আবেগের কান্না।

সর্বশেষ অনেকবার ভেবেছি রেনো'র (মেসেনেট) সাথে দেখা হলে ঘটনাটা তার মনে আছে কিনা জানতে চাইবো। কিন্তু অফিসিয়াল ইভেন্টে যে কয়বার দেখা হয়েছে-জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি।

সেদিনের সব বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ে। তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অতোটা সক্রিয় ছিলো না বলে কোনো যোগসূত্র থাকেনি। তবে সবার ছবি যত্ন করে বাঁধাই করে রেখেছি।

- মোঃ আনোয়ার হোসাইন, কমিশনার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধে কাস্টমস

-ড. মইনুল খান

কাস্টমস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। দেশের সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় পণ্য ও যাত্রী চলাচলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে। এতে বৈধ গমনাগমন উৎসাহিত হয়, অন্যদিকে অবৈধ কর্মকাণ্ডের রেশ টেনে ধরে। যেখানে আন্তর্জাতিক লেনদেনের সংযোগ জড়িত সেখানে কাস্টমসের ভূমিকা স্বীকৃত। এর সূত্র ধরে আসে রাজস্ব। তবে কাস্টমসের ভূমিকা রাজস্ব আহরণের মধ্যে সীমিত নয়। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা রক্ষা করা এবং সামাজিক ও পরিবেশের সুরক্ষা দেয়ার মধ্য দিয়ে কাস্টমসের উপস্থিতি স্বীকৃত হয়েছে। অতীতের রাজস্ব নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে দেশের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত হয়েছে কাস্টমস। কিছুদিন আগেও কাস্টমস থেকে সবচেয়ে বড় অঙ্কের রাজস্ব আহরণ হতো। আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং বর্তমান বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে এই রাজস্ব নির্ভরতা কমে এসেছে। অতীতের সর্বোচ্চ উৎসের এই খাতটি রাজস্ব আহরণের ক্রমহ্রাসে যুগোপযোগী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বৈধ ব্যবসায়া-বাণিজ্য উৎসাহিত হয়েছে এবং প্রসার ঘটেছে।

চোরাচালান প্রতিরোধ ও কাস্টমস

চোরাচালান প্রতিরোধ কাস্টমসের স্বতঃসিদ্ধ কাজের একটি অগ্রাধিকার। কাস্টমসের অন্যান্য ফাংশনের মধ্যে রয়েছে আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ রাজস্ব আহরণ করা, দেশের শিল্পায়ন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, ট্রেড ফেসিলিটেশন নিশ্চিত করে ব্যবসায়ীদের পণ্য খালাসে জটিলতা ও সময় হ্রাস করা এবং এর পাশাপাশি অবৈধ কর্মকাণ্ড রোধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যতো দিন যাচ্ছে ততো পণ্য চলাচল বাড়ছে। বাড়ছে যাত্রী চলাচলও। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে দেশের জিডিপির আকার ছিলো প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। বর্তমানে এটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭.১৬ লক্ষ কোটি টাকা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আনুপাতিক হারে আমদানি-রপ্তানিও। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বাস্তবতায় ব্যবসায়িক লেনদেন প্রতিযোগিতামূলক করতে খরচ কমানোর চাপ বাড়ছে। যাতায়াত বা পণ্য চলাচলে 'লিড টাইম' কমাতে পারলে ব্যবসায়ীদের ব্যয় সাশ্রয় হয়। কম দামে পণ্য রপ্তানি করা বা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য পূরণ হয়। দেশি ও বিদেশি চুক্তি ও কনভেনশনে এই বাস্তবতার প্রতিফলনও ঘটেছে। কাস্টমস ব্যবস্থাপনায়ও যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন ধারণা। এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর্স (AEO), সিঙ্গেল উইন্ডো, সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত খালাস দেয়ার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। তবে ট্রেড ফেসিলিটেশন যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এই সহজীকরণের যেন অপব্যবহার না হয় সেজন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করাটাও একটা চ্যালেঞ্জ। মনে রাখা দরকার, সকল ব্যবসায়ী অসৎ নয়। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য মুষ্টিমেয় অসাধু ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় আইন মেনে চলার (কম্প্লায়েন্স) প্রবণতা তৈরি। আর এই পরিসরে এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে চোরাচালান প্রতিরোধের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট।

অবৈধ পথে বৈধ বা অবৈধ পণ্য আনা অথবা বৈধ পথে অবৈধ পণ্য আনাকে সাধারণ অর্থে চোরাচালান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই সংজ্ঞা 'দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯' এর সেকশন ২(এস) এ বিধৃত আছে। অন্য কোনো আইনে চোরাচালানের সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা এই আইনে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানি নীতি আদেশে বর্ণিত আছে। নিষিদ্ধ পণ্য সাধারণ অর্থে সমাজ, রাষ্ট্র বা ব্যক্তি শ্রেণির ক্ষতি হতে পারে এমন ধারণা থেকে উৎসারিত। যেমন নকল মুদ্রা, নির্দিষ্ট পরিমাণের (২০০ গ্রামের অতিরিক্ত) বেশি স্বর্ণ, মাদক, পর্নগ্রাফি, বাংলাদেশের অবস্থান নেই এমন কোনো মানচিত্র ইত্যাদি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় তা 'দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯' এর সেকশন ১৫ ও অন্যান্য বিধানে নিষিদ্ধ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এছাড়া, নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকাও উক্ত আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই তালিকার পণ্য কতিপয় শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে আনা বা নেয়া যাবে। শর্ত পূরণ না হলে তা নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন, অস্ত্র, কিছু নির্দিষ্ট মেডিসিন, রাসায়নিক ও খাদ্যদ্রব্য, মোবাইল সেট, সিগারেট ইত্যাদি। এসব পণ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র প্রদান বা কতিপয় শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে ছাড়যোগ্য। এক্ষেত্রে কাস্টমস সীমান্তে ঐসব দপ্তর বা মন্ত্রণালয় বর্ধিত এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া শুল্ক ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে অননুমোদিত পথে যে কোনো আমদানিযোগ্য পণ্যও আনা হলে তা সরাসরি চোরাচালান হিসেবে গণ্য। এসব পণ্যের চোরাচালানের পেছনে দুটো প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। এক, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া। শুল্ক ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলে

অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। দুই, আইনের নিয়ন্ত্রণ পরিহার করা। কোনো পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেটি উপেক্ষা করে এক দেশ হতে অন্য দেশে পাচার করা। এতে নাশকতা বা নিরাপত্তার ওপর হুমকি তৈরির সংযোগ থাকে।

চোরাচালান অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তা দেশের জন্য ক্ষতিকর। এটি প্রতিরোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে। বাংলাদেশ কাস্টমস পৃথকভাবে বিভিন্ন বন্দর ও দেশের অভ্যন্তরে নানা ধরনের অভিযান পরিচালনা করছে। অন্যদিকে, দেশে চার স্তরবিশিষ্ট চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সও চলমান রয়েছে। বিভিন্ন বাহিনী ও বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয়, কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলা টাস্কফোর্স সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় চোরাচালান বিরোধী টাস্কফোর্স, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স, বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় টাস্কফোর্স এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা টাস্কফোর্স দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৭২ সালে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কে আলাদাভাবে সীমান্তের পাঁচ মাইলের মধ্যে কাস্টমস আইনের আটক ও গ্রেফতারসংক্রান্ত কতিপয় সেকশনে কাস্টমস কর্মকর্তার ক্ষমতা অর্পন করেছে। এই বাহিনী নিয়মিতভাবে সীমান্ত এলাকায় এই আইনের আওতায় দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ পুলিশকেও ঐ একই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ১৯৮৫ সালে। তবে এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে কাস্টমস স্টেশন বা বন্দর এলাকায় কাস্টমস কর্মকর্তাদের দায়িত্ব মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চের রায়ে[১] নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। চোরাচালানবিরোধী কার্যক্রম দেশের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

জাতীয় নিরাপত্তা ও কাস্টমস

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিরাপত্তার ধারণাটির ব্যাপ্তি বেড়েছে। পূর্বে এই ধারণা ভূখণ্ড রক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এক দেশের পক্ষে আরেক দেশের ভূখণ্ড দখল করা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজন পড়ে না। বিশ্বায়নের যুগে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অর্থে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় দেশের জনস্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থনীতির ভিতকে সুরক্ষা দেয়া, পরিবেশ রক্ষা করা, প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, জানমালের ওপর ক্ষতি রোধ করা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধসহ রাষ্ট্র কর্তৃক জনস্বার্থ রক্ষা করার বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচ্য। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসব অপ্রচলিত বিষয় কোনো রাষ্ট্রের স্থিতাবস্থা বজায় ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ। এই অপ্রচলিত নিরাপত্তায় কাস্টমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাস্টমস আইন ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহযোগী আইন প্রয়োগ করে এই ভূমিকায় নতুন মাত্রা যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে এতোদিন কাস্টমসের মূল ভূমিকা ছিলো রাজস্ব আহরণ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৭২ সালে কাস্টমসের অবদান ছিলো প্রায় ৮০%, ২০০০ সালে এটি কমে হয় ৪০%। বর্তমানে হয়েছে ২২%। শুল্ক হার ও মোট রাজস্ব আহরণে শতকরা হার কমা সত্ত্বেও প্রকৃত কাস্টমস রাজস্বের পরিমাণ বেড়েছে [২]। আয়কর ও মূসক রাজস্বের পরিমাণও বেড়েছে আনুপাতিক হারে। এই রাজস্ব দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে রক্ত সরবরাহ করছে। এই তিন উৎসের মধ্যে কাস্টমস রাজস্ব আনুপাতিক হারে কমে যাওয়া অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। অর্থনীতিবিদদের মতে, কাস্টমসের ওপর রাজস্ব-নির্ভরতা দেশের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা হ্রাস করে। অন্যদিকে, ধনী-গরিব সকলকে এই ট্যাক্সের বোঝা বইতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির সক্ষমতা নির্ধারণে এটি সুবিচার করতে পারে না। অস্ট্রেলিয়ার সেন্টার ফর কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ স্টাডিজের পরিচালক ডেভিড উইড্ডোসনের মতে, কাস্টমসের সনাতনী ভূমিকা রাজস্বনির্ভর 'গেটকিপার' এর ভূমিকা বর্তমান যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর মতে, বাণিজ্য সহায়ক ও তা বৃদ্ধিতে কাস্টমসের নতুন ভূমিকাকে সামনে নিয়ে এসেছে[৩]। এর মানে এই নয় যে, কাস্টমস রাজস্ব আহরণ করবে না। কাস্টমস নিজে রাজস্ব-নির্ভর না হয়ে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

[১] ১৯৮৩ সালের রাষ্ট্র বনাম রিয়াজুল করিম মামলার বরাতে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চে প্রদত্ত রায়।

[২] ১৯৭২ সালে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ছিল ২০০%। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫%। ১৯৭২ সালে শুল্ক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি টাকা, ২০০০ সালে ৫০০০ কোটি টাকা, ২০১৪-২০১৫ সালে তা প্রায় ৩৬,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর মিলে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১,৭৬,৩৭০ কোটি টাকা। সূত্রঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরীণ করাদি (আয়কর ও ভ্যাট) ও বেড়ে যাবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে সব শিল্প দেশের জন্য সহায়ক সেগুলোর কাঁচামাল ও মেশিনারিজের ওপর নিম্ন শুল্ক আরোপ করে উৎসাহিত করা এবং যেগুলো অনাহূত সেগুলোতে উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে আমদানি নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা। ফলে সরাসরি রাজস্ব আহরণ না করলেও দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ করে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ও সাশ্রয়ে কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আবার একইভাবে, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে কাস্টমস। আর এভাবে দেশের অর্থনৈতিক ভিতকে সুরক্ষা দিতে পারে কাস্টমস।

অন্যদিকে, দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন পণ্য যেমন অস্ত্র, ড্রাগস, স্বর্ণসহ অন্যান্য চোরাচালানি পণ্য ঠেকাতে কাস্টমস কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। চোরাচালানি পণ্য দেশের কেবল স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ ক্ষতি করে না, বরং তা নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। সম্প্রতি, সন্ত্রাসবাদ, আন্তঃমহাদেশীয় অপরাধ ও চোরাচালানের যোগসূত্রের বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অন্যতম গবেষক শেলি লুইস (২০০৭) এগুলোর মধ্যে অতীতের তুলনায় অধিকহারে পারস্পরিক যোগসাজস (Nexus) খুঁজে পেয়েছেন[৪]। অন্যদিকে, মাইকেল ফ্রিম্যান (২০১১)[৫] এর মতে, যেহেতু সন্ত্রাসবাদে জনবল নিয়োগ, অস্ত্র ক্রয় এবং টিকে থাকার জন্য দ্রুত অর্থের প্রয়োজন, তাই চোরাচালানের মতো নানা অপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ। জন পিকারেলি ও শেলি লুইস (২০০৭) দেখিয়েছেন, আল-কায়েদা ও হিজবুল্লাহ গ্রুপ পশ্চিম ইউরোপ, তানজানিয়া ও অন্যান্য দেশ হতে ডায়মন্ড ও গোল্ড চোরাচালানের সাথে জড়িত হয়েছে। আফগানিস্তানে তালিবান ও অন্যান্য গ্রুপ হেরোইন পাচারের সাথে যুক্ত হয়েছে। সেন্ট্রাল ও দক্ষিণ আমেরিকার সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো কোকেন পাচারের সাথে সম্পৃক্ত। সাবসাহারান আফ্রিকার কিছু গ্রুপ পশ্চিম ইউরোপে কোকেন ও অন্যান্য পণ্য চোরাচালান করে অর্থ আয় করে। নকল ও ভেজাল পণ্য চোরাচালানেও এসব সন্ত্রাসীগ্রুপের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। এসব পণ্যের তুলনামূলকভাবে আকার ও আয়তন কম এবং সহজে বহনযোগ্য। একই সাথে এসব চোরাচালানে স্বল্প আয়োজনে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়, যা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সহায়ক হয়। মাইকেল ফ্রিম্যান (২০১১) দেখিয়েছেন, যে কোনো বড় ধরনের নাশকতার জন্য খুব বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসীদের ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ করতে খরচ হয়েছিলো ১৯,০০০ ডলার। ২০০২ সালে বালি বোমা হামলায় হয়েছে ২০,০০০ এবং ২০০৪ সালে মাদ্রিদ হামলায় ১০,০০০-৫০,০০০ ডলার। সবচেয়ে বেশি খরচ হয়েছে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারে হামলায়। এতে ব্যয় হয়েছিলো ৩,৫০,০০০-৫,০০,০০০ ডলার। সুতরাং যে কোনো অঙ্কের চোরাচালান বা শুল্ক ফাঁকি দেশের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বয়ে আনতে পারে।

চোরাচালানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়টি কাস্টমসের নতুন ভূমিকাকে জোরদার করবে। যে কোনো চোরাচালানের পণ্য আটক ও রাজস্ব ফাঁকি রোধে সন্ত্রাস ও আন্তঃমহাদেশীয় অপরাধে অর্থ-বিনিয়োগ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান, আটক ও তদন্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচার বর্তমানে আলোচিত বিষয়। এতে দেশ যেমন যথাযথ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়, তেমনি দেশের সম্পদ লুট হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এগুলোর প্রয়োজনীয় তদন্ত এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ভিন্ন এক গবেষণায় দেখা গেছে, এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদারে চোরাচালানের খরচ বেড়ে যায় এবং তা প্রকারান্তরে নিরুৎসাহিত হয়।

[৩] Widdowson, David. 2007. "The Changing Role of Customs: Evolution or Revolution?", World Customs Journal, Vol. 1, no. 1., p. 31-37.

[৪] Shelley, L. 2005. 'The unholy trinity: transnational crime, terrorism, and corruption', the Brown journal of world affairs, vol. XI, Issue 2, Winter/Spring, p.104; Makarenko, T 2005. 'Terrorism and Transnational Organized Crime: Tracing the Crime-Terror Nexus in the Southeast Asia', in Smith P. J. (ed.) Terrorism and violence in Southeast Asia: transnational challenges to states and regional stability, New York: ME Sharpe.

[৫] Freeman, Michael. 2001. "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology", Studies in Conflict and Terrrorism, 34:461-3

এই গবেষণা নির্দেশ করে কার্যকর অর্থে এনফোর্সমেন্ট প্রয়োগ করার[৬]। মোদ্দাকথা, কাস্টমসের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ দেশের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'সুইচ-বাটন' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে। দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পায়ন, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন বিধান করতে পারে নতুন ভূমিকায়।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, "চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি রোধে করণীয়" শীষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

সাম্প্রতিক চোরাচালানবিরোধী চিত্র

কাস্টমস বর্তমানে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় শক্তিশালী। সক্ষমতার দিক দিয়ে কাস্টমস অনেকদূর এগিয়েছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি, ব্যবস্থাপনায় বাস্তবমুখী কৌশল অবলম্বন, স্বচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কর্মকর্তাদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে আইন প্রয়োগে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে। এসব কর্মকাণ্ডে সাম্প্রতিক দৃশ্যমান অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটেছে। স্বর্ণ, মুদ্রা, মাদকসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধে কাস্টমস বিশেষ ভূমিকা রাখছে। দেশের বিমান, সমুদ্র ও স্থল বন্দরসমূহে প্রায়শ ধরা পড়ছে এসব পণ্য। এসব পণ্য আটক, নির্ধারিত কাস্টমস গুদাম (স্বর্ণ ও মুদ্রা ব্যতিত) ও বাংলাদেশ ব্যাংক (স্বর্ণ ও মুদ্রা) এ জমা এবং তা নিষ্পত্তিতেও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সাথে, গ্রেফতার করা হয়েছে এসবের সাথে যুক্ত বাহক, সহায়তাকারী ও নেপথ্যের ব্যক্তিদের। এই এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম দুটো মূল উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এক, চোরাচালানকৃত পণ্য আটকের মাধ্যমে আন্ডার-গ্রাউন্ডের ব্যবসার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়া। নজরদারি বেশি হলে চোরাচালানের খরচও বাড়ে। এতে মুনাফাও হ্রাস পায়। চোরাচালানের অন্যতম উৎসাহ এই মুনাফা না থাকলে অবৈধ কর্মকাণ্ডও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। দুই, এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে 'ডেটারেন্স' বা নিবারণী প্রভাব সৃষ্টি করা।

যেহেতু প্রতিটি পণ্যচালান বা ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় এবং কাম্যও নয়, তাই ইন্টেলিজেন্স প্রয়োগ করে লক্ষ্যবস্তুকে তল্লাশির আওতায় আনার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

[৬] চৌধুরী, ফয়জুল লতিফ. ২০১৫. "চোরাচালানের অর্থনীতি", গোয়েন্দার চোখ ২০১৫, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, পৃষ্ঠা ৯৬-১০৫।

নজরদারির আওতায় এসব অভিযান অন্যদের নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মিডিয়ার ভূমিকা। অনেক অভিযানে মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করাটা গুরুত্বপূর্ণ। এতে যেমন অভিযানে স্বচ্ছতার বিষয়টা সামনে এসেছে, অন্যদিকে সাধারণভাবে অশুভ শক্তির মাথা নিচু হয়েছে। কাজের সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনেও সহায়ক হয়েছে।

সম্প্রতি জনস্বার্থে কাস্টমসের কতিপয় কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য। যেমন গত তিন বছরে নানা অভিযানে বিভিন্ন কৌশলে চোরাচালানকৃত প্রায় ৮০ মণ স্বর্ণ আটক হয়েছে এবং ১৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। টাকার অঙ্কে এই স্বর্ণের মূল্য প্রায় ১৪৫০ কোটি টাকা। এসব আটক স্বর্ণের মালিকানা রাষ্ট্রের। আটক স্বর্ণের মধ্যে অনেক চাঞ্চল্যকর অভিযানও রয়েছে। যেমন ২৬ এপ্রিল ২০১৪ এ বিমানের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে বিশেষভাবে লুকায়িত অবস্থায় ১০৫ কেজি স্বর্ণসহ 'অরুণার আলো' নামের একটা এয়ারক্রাফট আটক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এ একই কৌশলে ৬২ কেজি স্বর্ণসহ 'রাঙাপ্রভাত' নামের এয়ারক্রাফট আটক, ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ এ ১৪ কেজি স্বর্ণসহ এস২এএইচকে এয়ারক্রাফট আটক, এবং ৩০ মে ২০১৫ এ ২৪ পিস স্বর্ণবারসহ এস২এডিএফ এয়ারক্রাফট আটক উল্লেখযোগ্য। গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ এ কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক ঢাকার পল্টনের একটি বাসা হতে পৌনে দুই মণ স্বর্ণ, চার বস্তা দেশি ও বিদেশি মুদ্রা আটকসহ একজন বড় মাপের চোরাচালানিকে গ্রেফতারের ঘটনাটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এছাড়া যাত্রীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে লুকানো অবস্থায় এবং যন্ত্রপাতি ও ব্যাগেজের আড়ালে প্রতিনিয়ত স্বর্ণ আটক হচ্ছে। সম্প্রতি যেসব স্বর্ণের চালান আটক হয়েছে তাতে অতি সহজভাবে মনে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্ট পূর্ণ হচ্ছে এবং দেশ প্রকান্তরে ধনী হচ্ছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সার্বিকভাবে কাস্টমস কর্তৃক আটক এসব স্বর্ণ কেবল রাষ্ট্রীয় কোষাগারই পূর্ণ করছে না, এর দ্বারা অনেক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অপরাধ হ্রাসের ক্ষেত্রেও অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। কোনো সংঘটিত অপরাধের অর্থ সাধারণত অবৈধভাবে লেনদেন হয়ে থাকে। এসব অপরাধে আনীত অবৈধঅর্থ অন্যান্য অপরাধের অক্সিজেনের ভূমিকা পালন করে। এই অক্সিজেন সরবরাহে ঘাটতি হলে অপরাধের মাত্রাও কমে যাবে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনায় সর্বমোট অর্থের প্রয়োজন হয়েছিলো ৩-৫ কোটি টাকা মূল্যের ডলার। গত তিন বছরে কাস্টমস কর্তৃক আটক ১৪৫০ কোটি টাকার স্বর্ণ দিয়ে কী পরিমাণ নাশকতার সৃষ্টি করা যায়, একটু চিন্তা করলে হয়তো অনুধাবন করা যাবে। অন্যদিকে, এ পর্যন্ত দৃশ্যমান আটকের বাইরেও গোয়েন্দা তৎপরতায় আরো প্রায় ৫০০ মণ স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধ হয়েছে। এতে সার্বিক অর্থে দেশে মানিলন্ডারিং, মানব-পাচার, মাদক, অস্ত্রসহ অন্যান্য আন্তঃমহাদেশীয় অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অর্থায়নে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কিছু তদন্তে কালো টাকার লেনদেন, হুন্ডি, আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে লেনদেনও আইনের আওতায় এসেছে। কাস্টমস স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখায় দেশের সার্বিক অপ্রচলিত নিরাপত্তায় নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি মেধাস্বত্ব অধিকার (আইপিআর) সংরক্ষণে কাস্টমস এই নতুন ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ, কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক গত ৪ মার্চ ২০১৫ সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় শিমরাইলে একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কসমেটিকসের খালি প্যাকিং কন্টেইনার বা মোড়ক উদ্ধার করা হয়। এসব কন্টেইনারের মধ্যে বিশ্বের নামিদামি ব্র্যান্ডের নানা জাতীয় পারফিউম ও স্প্রে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এসবের গায়ে লেখা রয়েছে মেইড ইন ইংল্যান্ড, ইউএই, ফ্রান্সসহ আরো অনেক দেশের নাম। অথচ এসব খালি কন্টেইনার ঐ কারখানায় রিফিল করে বোতলজাতপূর্বক দেশের বিপণিবিতানগুলোতে সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কাস্টমস আইনের সেকশন ১৫ ও ১৬ অনুযায়ী এবং ট্রেড মার্ক আইন অনুযায়ী এগুলো নিষিদ্ধ আইটেম। এ ধরনের লেখাযুক্ত খালি প্যাকিং কন্টেইনার আমদানি করা যায় না। এর দ্বারা দু'ধরনের ক্ষতির সংযোগ রয়েছে। এক, এর দ্বারা মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার খর্ব হয়েছে। আইনের চোখে এটি দণ্ডনীয় অপরাধ। দুই, এসব পণ্য ব্যবহারের ফলে ক্রেতা সাধারণ প্রতারিত হচ্ছে। বাইরের মোড়ক দেখে ক্রেতা বিদেশি পণ্য হিসেবে কিনছেন ঠিক, কিন্তু ভেতরে স্থানীয় ও নকল দ্রব্যের মিশ্রণ। এসব মিশ্রণের পণ্য কতটা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে তা ভেবে দেখলে বুঝা যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্কিনের সাথে মানবদেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। কিডনি থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তদন্তে বের হয়েছে, এসব চালানের বৈধ কাগজ-পত্রাদি নেই। এর মানে রাজস্ব ফাঁকির বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু এর চেয়ে বড় বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, এর দ্বারা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এসব চালান ছাড়াও, বিমানবন্দর ও

সমুদ্র বন্দরে বড় বড় ওষুধের চালান আটক করতে পারদর্শিতা দেখিয়েছে কাস্টমস। নকল ভায়াগ্রাসহ নানা প্রেসক্রাইবড ওষুধ (অনেকাংশে নকল, মেয়াদোত্তীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী) এর চালান কাস্টমস কর্তৃক আটক করা হয়েছে। একটি তদন্তে ইনফিউশন নিডল সেটের শতাধিক চালান অবৈধভাবে খালাসের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এতে দেখা গেছে, নিম্ন মানের নিডল এসেছে কোনো ধরনের স্থানীয় মান নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে। এসব নিডলে নানা রোগ-জীবাণু থাকা অস্বাভাবিক নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসলে তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ ও অনৈতিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর নজরদারি গ্রহণ করা হয়েছে। এর দ্বারা কাস্টমসের নতুন ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে, কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক ঘনচিনি (সোডিয়াম সাইক্লামেট) আটকের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। মিথ্যা ঘোষণায় আনা এসব আমদানি নিষিদ্ধ এই পণ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এক কেজি ঘন চিনি ৫০ কেজি সাধারণ চিনির সমান উপযোগিতা পাওয়া যায়। দামে কম বলে ক্ষতিকর এই কেমিক্যাল কোনো কোনো অসাধু ব্যবসায়ী বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করেন। সাধারণত চকলেট, দই, মিষ্টি, বেকারি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিমসহ নানা পণ্যে ব্যবহার হয়ে থাকে এই ঘনচিনির। এই বিষাক্ত কেমিক্যালের চোরাচালান কার্যকরভাবে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে পারে কাস্টমস।

চট্টগ্রাম বন্দরে ২০১৪ সালে ভোজ্যতেলের ড্রামে কোকেন উদ্ধারের ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বলিভিয়া থেকে ১৭২টি তেলের ড্রাম এসেছিলো সিঙ্গাপুর হয়ে। দীর্ঘ ২৮ দিন পার হওয়ার পরও কন্টেইনার পড়ে থাকায় এবং এলসি ব্যতিরেকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রথমবারের মতো ভোজ্যতেল আসায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নমুনা উত্তোলন করে উন্নততর পরীক্ষাগারে প্রেরণ করলে কোকেনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। তথ্য অনুযায়ী, চালানটি ভিন্ন দেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছিলো। অত্যন্ত চৌকস কৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমে এই চেষ্টা ব্যাহত করা হয়। এছাড়া, ২০১০ সালে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওয়াটার হিটার ভেঙে সিঙ্গাপুর নিবাসী এক যাত্রীর নিকট হতে ২০ কেজি কোকেন উদ্ধার করা হয়। এখানেও অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অন্যদিকে, গত ১২ মার্চ ২০১৪ এ কাস্টমস কর্তৃক সিলেটের বৈদেশিক ডাকঘর থেকে প্রায় ৮ কেজি হেরোইন আকট করা হয়। এসব ভয়ঙ্কর মাদক দেশের সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এসব মাদক পাচার দেশের ভিত্তি ও সুশাসনের প্রতিও হুমকিস্বরূপ। অন্যদিকে, এতে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা জড়িত। কারণ, বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত কোনো চালানে বিদেশের পোর্টে এসব মাদক উদ্ধার হলে বাংলাদেশের স্বার্থ চাপের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ এসব পণ্য পাচার বন্ধে তাই কাস্টমসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে, অবৈধভাবে সিগারেট আমদানির ক্ষেত্রেও কাস্টমস তৎপর রয়েছে। গত তিন বছরে প্রায় অবৈধভাবে আনীত ১.৭২ কোটি সিগারেট আটক হয়েছে বিভিন্ন বন্দরে। সবচেয়ে বড় চালানটি আটক হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এ। কসমেটিক্সের আড়ালে মিথ্যা ঘোষণায় একটি ৪০ ফুটের কন্টেইনারে আনা এসব সিগারেট গোয়েন্দ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আটক হয়। আটক সিগারেট পরীক্ষা করে দেখা গেছে এসব সিগারেটের অধিকাংশই বিদেশের কালোবাজার থেকে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ড্যাম অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ সিগারেট। নকল সিগারেটও পাওয়া গেছে এসব চালানে। বিদেশি সিগারেট হিসেবে কেনা এসব সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে, বিদেশি এসব সিগারেট বাজারে সয়লাব হওয়ায় দেশীয় সিগারেট ফ্যাক্টরিগুলো অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে। লোকসানের মধ্যে পড়ছে এ খাতের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। অন্যদিকে, সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম বড় এই খাত ক্ষতির মধ্যে পড়ছে। ফলে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (ভ্যাট ও আয়কর) আদায়ও চ্যালেঞ্জের মুখে পতিত হয়েছে। তাই সিগারেট চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ কাস্টমসের অন্যতম অগ্রাধিকার।

বিদেশি নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ দমনেও কাস্টমসের নজরদারি রয়েছে। ৬ মার্চ ২০১৫ এ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশি দূতাবাসের একজন কূটনীতিককে চোরাচালানকৃত প্রায় ২৭ কেজি স্বর্ণসহ হাতেনাতে ধরা হয়। ঐ দূতাবাসের কর্মকর্তার গতিবিধি দীর্ঘদিন ধরে নজরদারিতে রাখার একপর্যায়ে তিনি ধৃত হন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করা হয়। অন্য একটি ঘটনায় গুলশানে ঐ দূতাবাসের কতিপয় কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বিক্রয় করার দায়ে বিপুল পরিমাণ মদ, উত্তেজক ট্যাবলেটসহ অন্যান্য পণ্য আটক এবং রেস্টুরেন্টের মালিককে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ভিন্ন আরেকটি দেশের নাগরিকের অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের শাড়ি-থ্রিপিসসহ অন্যান্য পণ্যাদি আটক করা হয়। গুলশানের পিংক সিটির শপিং মল থেকেও কয়েকটি দোকানে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসব দোকানেও কতিপয় বিদেশিদের দ্বারা পরিচালিত অবৈধভাবে আনীত পণ্যসামগ্রী জব্দ করা হয়। বিদেশিদের দ্বারা এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, অন্যদিকে নিরাপত্তার প্রতি হুমকির সংযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে জঙ্গি অর্থায়নের বিষয়টিও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বর্তমান কাস্টমসের নতুন ক্ষেত্র। গবেষকদের মতে, বাণিজ্যের মাধ্যমে সর্বাধিক মানিলন্ডারিং সংঘটিত হয়। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও এটি উঠে এসেছে। আমদানি-রপ্তানি ইস্যুতে কাস্টমসের সুষ্ঠু নজরদারি বৃদ্ধির মাধ্যমে এই মানিলন্ডারিংয়ের মাত্রা বহুলাংশে হ্রাস করা যেতে পারে। সম্প্রতি (ডিসেম্বর ২০১৫) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এ সংশোধনী আনায় কাস্টমসের ওপরও এই অপরাধের তদন্ত করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। উক্ত আইনে মোট ২৭টি 'সম্পৃক্ত অপরাধ' এর মধ্যে ৬টি কাস্টমস সংশ্লিষ্ট হওয়ায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কাস্টমস অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে বাণিজ্য-ভিত্তিক মানিলন্ডারিং শনাক্ত ও তা যথাযথভাবে আইনের আওতায় আনা এই সময়ের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছে কাস্টমস। এরই মধ্যে কাস্টমসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে, বিভিন্ন আইন-কানুনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অচিরেই এ বিষয়ে স্বর্ণ, মুদ্রা ও মাদকের ন্যায় দৃশ্যমান ফল দেখতে পাওয়া যাবে।

উপসংহার

চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকি রোধে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিবারণমূলক কার্যক্রম বর্তমান কাস্টমসের মূলমন্ত্র। অধিক ঝুঁকি ও তা সামাল দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যে কোনো অভিযান ও নজরদারি পরিচালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে, রাজস্ব-নির্ভরতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে অপ্রচলিত নিরাপত্তার ধারণাকে মাথায় রেখে কাস্টমস অপরাধ প্রতিরোধ এখন অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচ্য। তাই বর্তমানের অভিযানে আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য, দেশি ও বিদেশি নাগরিক কর্তৃক অবৈধ পণ্য, মুদ্রা, মাদক ও স্বর্ণ পাচার রোধসহ জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং সার্বিক অর্থে দেশের ও জনস্বার্থে কাজ করার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বে অন্যান্য দেশেও কাস্টমসের এটি মুখ্য ভূমিকা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সমভাবে ব্যবসা-বান্ধব ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং অপ্রচলিত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সামনে রেখে এনফোর্সমেন্ট বর্তমান কাস্টমসের মূল লক্ষ্য। বৈধ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অন্যতম সহায়ক শক্তি নতুন এই ভূমিকা। নিজে যেমন রাজস্ব আদায় করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ, কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের প্রসারে অবদান রাখতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের আগাছা দূর করতে কাস্টমস অধিক আগ্রহী। এটি আরো কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে কাস্টমস প্রশাসনকে সর্বতোভাবে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জনবল, লজিস্টিক্স বাজেট বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি বর্তমানে সামনে চলে এসেছে। একইসাথে, অটোমেশনসহ নানা আধুনিকায়নের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে কোনো দেশের কাস্টমস দেশের জীবনীশক্তি সঞ্চার করে। এতে যে কোনো বিনিয়োগ তা আনুপাতিক ফলাফল আনতে সক্ষম। তাই সক্ষমতার ওপর নজর দেয়া ও পাশাপাশি আলোকিত প্রশাসন গড়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। যেসব সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের চাকা আরো গতিশীল হবে এটিই প্রত্যাশা।

- ড. মইনুল খান, মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

-বিঃ দ্রঃ এই লেখাটি ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

কাস্টমসের নতুন ভূমিকায় অর্থ পাচার প্রতিরোধ

-ড. মইনুল খান

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর গত ১৫ জুন ২০১৫-এ মেসার্স এসএন ডিজাইন লিঃ নামক একটি গার্মেন্টসের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ কোটি টাকা অর্থ পাচারের অভিযোগে এন্টি মানিলন্ডারিং আইনে প্রথম মামলা দায়ের করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১০-১৫ মেয়াদে পাঁচ বছরে ২৯৭টি চালান বিদেশে রপ্তানি করলেও রপ্তানির বিপরীতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনেনি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুল্ক গোয়েন্দা ডিসেম্বর ২০১৫ এ চট্টগ্রাম বন্দরে ৭টি চালানের কন্টেইনার রপ্তানি করার প্রাক্কালে আটক করে। এরপর কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় ব্যাংকের ইএক্সপি ফরম ও এলসি জাল করে এসব কন্টেইনার রপ্তানি করার চেষ্টা হয়েছে। কাস্টমসের অটোমেটেড সিস্টেম এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড থেকে গত পাঁচ বছরের হিসাব নিয়ে দেখা যায় ব্যাংকের দলিলাদি জাল করে এর আগে ২৯০টি চালান রপ্তানি করেছে। সোনালী ব্যাংক লিঃ মতিঝিল শাখা, ব্রাক ব্যাংক গুলশান শাখা এবং ন্যাশনাল ব্যাংক আগ্রাবাদ শাখার গ্রাহক দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এই জালিয়াতি করে। রপ্তানির শর্ত অনুযায়ী এসব রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এই মুদ্রা বিদেশে অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে অবৈধভাবে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এসব কন্টেইনারে নানা ধরনের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে কিন্তু পেমেন্ট বিদেশে থেকে গেছে। রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে ফিলিপিন্স ও ইউএস। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন প্রাপ্তির পর এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংশোধনী আইন ২০১৫ পাসের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এই আইনে এটি প্রথম ফৌজদারি মামলা। মামলাটি মতিঝিল থানায় শুল্ক গোয়েন্দার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সরকার দায়ের করেন। এই মামলার মূল আসামি করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মো. শহিদুল ইসলাম, বাড়ি ৩৪, রোড-১, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা। প্রতিষ্ঠানটি ৩৮ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকায় অবস্থিত হলেও উক্ত ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এখন ফৌজদারি তদন্তে বিস্তারিত প্রমাণাদি সংগ্রহ করে আসামি ও তাদের সহযোগীদের আইনের আওতায় আনা হবে। মামলা হয়েছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা ২(শ) (১৮) এ, যা একই আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। আদালতে প্রমাণিত হলে সর্বনিম্ন ৪ বছর ও সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদণ্ড হতে পারে। একই সাথে অর্থদণ্ডের বিধান আছে। মতিঝিল থানার মামলা নম্বর ১৭, তারিখ- ১৫/০৬/২০১৬।

এই মামলাটি শেষ নয়, শুরু। আরো কতিপয় মামলা প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে তা মামলা আকারে দায়ের হবে। এসব মামলার তদন্ত ও প্রসিকিউশনে হয়তো অনেক সময় লাগবে। বড় বড় কিছু ঘটনা উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে অর্থ পাচারের ব্যাপকতাটা তুলে ধরা সম্ভব হতে পারে। অন্যদিকে, পাচারকারীরা অর্থ-বৈভবের মালিক হওয়ার কারণে এক ধরনের ক্ষমতা ও সামাজিক সম্মান ভোগ করেন। তবে এ ধরনের ঘটনা উদ্‌ঘাটন হতে থাকলে ভিন্ন চিত্র উন্মোচিত হতে পারে। কিছু মামলা দায়ের ও তা মিডিয়াতে প্রচারের মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রতিরোধের প্রাথমিক কৌশল হতে পারে। এর মাধ্যমে অন্তত এই বোধটা জন্মাবে যে, অপরাধ করলে তা পরবর্তীতে উদ্‌ঘাটন ও আইনের সম্মুখীন হতে হবে।

এই ধরনের অর্থ পাচার বর্তমানে আলোচিত অর্থনৈতিক অপরাধের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এতোদিন অর্থ পাচারের ইস্যুটি বিক্ষিপ্তভাবে থাকলেও সম্প্রতি তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রকাশের পর বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের চিত্রটি সংখ্যাগত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এতে গত দশ বছরের ক্রমাগত হিসাব এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের স্পর্শকাতর অবস্থান অর্থ পাচার প্রতিরোধে নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমান সরকারের জঙ্গিবাদ নির্মূল ও এতে অর্থায়ন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এই গুরুত্ব আরো অনুভূত। একইসঙ্গে, কার্যকর অর্থে অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংশোধনী আনা হয়েছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনেও। নতুন সংশোধনী আইন ২০১৫ এ অন্য সংস্থার পাশাপাশি কাস্টমসকেও ক্ষমতায়িত করা হয়েছে এই আইনের ফৌজদারি অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন পরিচালনা করার। এতে কয়েকটি অপরাধকে কাস্টমস সম্পর্কিত 'সম্পৃক্ত অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে এই আইন যথাযথ বাস্তবায়ন ও ফলপ্রসূ করতে কাস্টমসের ভূমিকা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক চর্চা ও রীতি অনুযায়ী, ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং বা অবৈধ লেনদেন হচ্ছে অর্থ পাচারের মূল ক্ষেত্র। জিএফআই প্রতিবেদনেও তা স্পষ্ট হয়েছে। সে হিসেবে কাস্টমস হতে পারে আগামী দিনের অর্থ পাচার প্রতিরোধে প্রধান চালিকা শক্তি। এই নতুন ও গুরুদায়িত্ব পালনে প্রয়োজন কতিপয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ। যত দ্রুত এসব ব্যবস্থা নেয়া যায়, ততো দৃশ্যমান ও ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে অর্থ পাচার প্রতিরোধে। স্বস্তি আসবে বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, হ্রাস পাবে সন্ত্রাসসহ নানা অপরাধের অর্থায়ন।

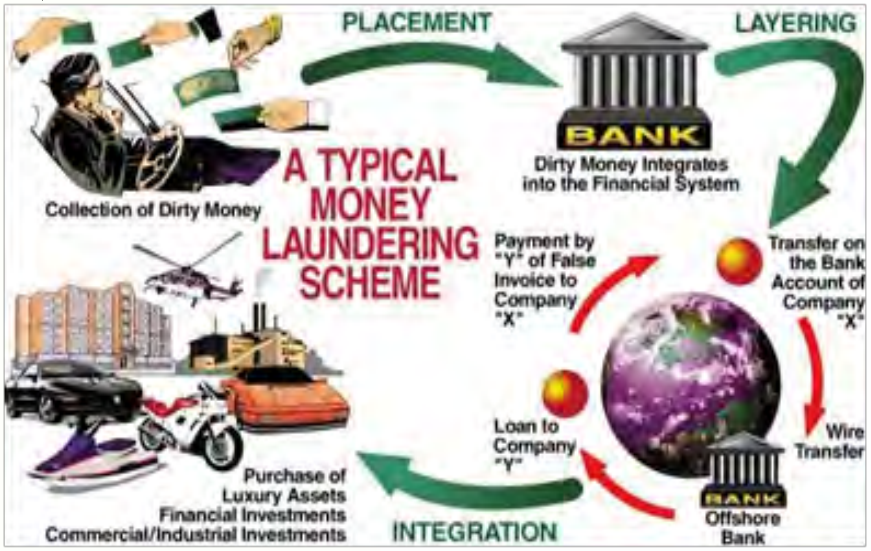

অর্থ পাচার কী?

সাধারণ অর্থে অর্থ পাচার বলতে কোনো সরকারি অনুমোদন ব্যতিরেকে বা স্বীকৃত পন্থায় নয় এমনভাবে একদেশ হতে অন্যদেশে অর্থের বহন বা স্থানান্তরকে বুঝায়। বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের পূর্বে এ মত বহুল প্রচলিত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে মানিলন্ডারিংয়ের ধারণাটিতে ব্যাপ্তি বেড়েছে। অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত কোন অর্থের উপার্জন ও ব্যবহারকে এই সংজ্ঞার মধ্যে আনা হয়েছে। জাতিসংঘে ইউএনওডিসি-র একটা প্রতিবেদনে এই বৃহৎ ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী, মানিলন্ডারিং এ চারটি স্তর রয়েছে। **প্রথম** স্তরটিতে বিভিন্ন অবৈধ উৎস হতে কুৎসিত অর্থের জোগান হয়। এসব উৎস প্রচলিত আইন-কানুন ভঙ্গ করে প্রসার ঘটে থাকে। **দ্বিতীয়** স্তরটি এসব অর্জিত অর্থ যে কোনো আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়। যে কোনো ব্যাংক বা ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমে এসব অর্থের সংযোগ ঘটে। **তৃতীয়** স্তরটি ঘটে বিভিন্ন স্থানান্তর প্রক্রিয়ায়। কোনো কোনো অর্থ এক ব্যাংক হতে অন্য ব্যাংকে, এক দেশ হতে আরেক দেশে, একজন হতে আরেকজন কিংবা জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে এক কোম্পানি বা ব্যক্তি হতে আরেক কোম্পানি বা ব্যক্তিকে হস্তান্তর বা স্থানান্তর হয়। **শেষ** স্তরটি হচ্ছে এসব অবৈধ অর্থের ইন্টিগ্রেশন বা একীভূত করা। এটি হতে পারে ভোগ বা বিলাসিতার উদ্দেশ্যে এসব

অর্থের খরচ করা, কোনো আর্থিক বিনিয়োগ কিংবা শিল্পায়ন বা বাণিজ্যিক বিনিয়োগের মাধ্যমে। এসকল পর্যায়ের অথবা যে কোনো একটি পর্যায়ে অর্থের উপার্জন বা ব্যবহার হলে মানিলন্ডারিং এর ধারণাটি প্রয়োগযোগ্য হবে। এই স্তরবিন্যাসের একটি মডেল[১] নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হয়েছে।

মানিলন্ডারিং এর স্তরবিন্যাসের মডেল

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ সালে এই বৃহৎ পরিসর সন্নিবেশিত হয়েছে। এই আইনে ধারা ২ এ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংজ্ঞা ও পরিধি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এতে অর্থ পাচারের সংজ্ঞা ১(ক)(১-৩) এ ৮ টি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এর মূল কথা হলো, এসব অপরাধের সংশ্লেষে কোনো প্রক্রিয়ায় যদি কোনো সম্পৃক্ততা থাকে তাহলে তার ও তাদের কার্যক্রমও এই ধারণার মধ্যে পড়বে। এর ফলাফল হিসেবে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই আইনে কঠোর অবস্থানের সম্মুখীন হতে হবে। অধিকন্তু, এর সাথে ধারা ২(শ) এ বর্ণিত ২৮টি সম্পৃক্ত অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব 'সম্পৃক্ত অপরাধ' দেশে ফৌজদারি বা দেওয়ানি আইন লঙ্ঘন থেকে উৎসারিত। কিন্তু এসব অপরাধ পূর্বে মানিলন্ডারিংয়ের আওতার সাথে বিচার্য ছিলো না। বর্তমান আইনে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর কাজের পরিধি ও অগ্রাধিকারে উদ্ভব হয়েছে নানা সমীকরণ ও বাস্তবতা। অন্যদিকে, ধারা ২(শ) অনুযায়ী যে 'সম্পৃক্ত অপরাধ' এর কথা বলা হয়েছে তা থেকে উদ্ভূত যে কোনো আর্থিক লেনদেন এই আইনে ধর্তব্যের মধ্যে পড়বে। কাস্টমসের সাথে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন বাস্তবায়নের যোগসূত্র এই 'সম্পৃক্ত অপরাধ'। এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে নানা ক্ষেত্র। তবে কাস্টমস দেখবে কাস্টমস সংশ্লিষ্ট অপরাধ। এখানে ২৮টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছয়টি অপরাধ কাস্টমস সংশ্লিষ্ট। এগুলো হলো: ১) চোরাচালান ও শুল্কসংক্রান্ত, ২) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, ৩) দেশি ও বিদেশি মুদ্রা পাচার, ৪) চোরাকারবার, ৫) অবৈধভাবে মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা, ৬) মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন। এসব অপরাধের সাথে কাস্টমস অপরাধের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। বর্তমানে ২০১৫ সালে যে সংশোধনী জারি হয়েছে, তাতে এই ক্ষমতা সরাসরি কাস্টমসকে দেয়া হয়েছে। এখানে ধারা ২ (খ) (ঠ) এ "তদন্তকারী সংস্থা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ঐ সকল সংস্থাকে যারা সংশ্লিষ্ট আইনে 'সম্পৃক্ত অপরাধ' তদন্ত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অন্যদিকে, এই আইনে শাস্তির বিধানটিও বেশ কঠোর। অপরাধ প্রমাণিত হলে কমপক্ষে চার বছর এবং সর্বোচ্চ ১২ বছর জেল ও সাথে জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একই সাথে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বা অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের কথাও বলা হয়েছে এই আইনে। অন্যদিকে, লন্ডারিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের দ্বিগুণ বা দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেটি অধিক হয়, তার সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। (ধারা ৪(২) দ্রঃ)।

কাস্টমস এর ভূমিকা কী?

প্রশ্ন হলো, কাস্টমসের সাথে অর্থ পাচারের বিষয়টি কীভাবে সরাসরি জড়িত? দু'ভাবে কাস্টমস এই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হতে পারে। প্রথমত, দেশের সীমান্তগুলোর বৈধ নিয়ন্ত্রক হচ্ছে কাস্টমস। যে কোনো বন্দর (সেটি স্থলবন্দর, বিমানবন্দর বা সমুদ্রবন্দর হতে পারে) দিয়ে পণ্য বা যাত্রীর গমনাগমনের ওপর নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ কাস্টমস এর মুখ্য দায়িত্ব। দেশের প্রচলিত আইন-কানুন প্রয়োগের সময় বিভিন্ন উপায়ে অর্থ পাচারের সাথে যে কোনো পণ্য আটকের ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনা হয়। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন বন্দরগুলোতে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা, স্বর্ণ ও মাদক ধরা পড়েছে। এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। আর এসব ধরা পড়েছে কাস্টমস কর্তৃক 'বর্ডার কন্ট্রোল মিজারস' হিসেবে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অংশ হিসেবে এই এনফোর্সমেন্টের কাজটিতে প্রাথমিক ও মূল ভূমিকা কাস্টমসের। আর চোরাচালান বা মুদ্রা পাচারের বিষয়টি সরাসরি নতুন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে 'সম্পৃক্ত অপরাধ'। দ্বিতীয়ত এটি কাস্টমস সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল বিষয়। কাস্টমসের অ্যাসেসমেন্ট ও শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং, মিথ্যা ঘোষণা বা জালজালিয়াতি করে শুল্ক ফাঁকি বা এমন কোনো উপাদান থাকতে পারে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় অর্থ পাচার সংঘটিত হয়েছে, তাহলে তা 'মানিলন্ডারিং' এর আওতায় পড়বে।

[১] UNODC, 2010; World Bank, Money Laundering and Terrorist Financing: Definitions and Explanations, 2003, p. I8.

কাস্টমস অ্যাক্টের সেকশন ৩২ এর আওতায় 'মিথ্যা ঘোষণা'র যে কোনো অপরাধ এই নতুন আইন দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। কাস্টমস হাউসগুলোতে শুল্কায়ন কার্যক্রমে মিথ্যা ঘোষণার ঘটনা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। পরিমাণ, ওজন, পণ্যের বিবরণ অথবা আমদানি-রপ্তানি নীতি আদেশ বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান পরিহারের উদ্দেশ্যে এসব মিথ্যা বা জালিয়াতির আশ্রয় নেয়ার ঘটনা লক্ষণীয়। নতুন আইনে এসব 'শুল্কসংক্রান্ত অপরাধ' হিসেবে গণ্য এবং তা ফৌজদারি অপরাধও বটে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে পণ্যটি আসার কথা ছিলো, সেটি না এসে আনা হয়েছে অন্যটি। অথবা যে মূল্য দেখানো হয়েছে তা সত্যিকার অর্থে প্রকৃত মূল্যকে প্রতিফলন করে না। কিংবা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে বিএসটিআই বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক প্রত্যয়ন বা ছাড়পত্র দাখিল করা হয়েছে অথবা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন করে কেউ নকল পণ্য এনেছে অথবা এতে কারোর স্বত্ব অধিকার ভঙ্গ হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কাস্টমস অ্যাক্টের পাশাপাশি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রযোজ্য হতে পারে। টেকনিক্যালি এসব কাস্টমস অপরাধ উদ্‌ঘাটন ও অর্থ পাচারের সাথে এর যোগসূত্র স্থাপন করাটা কাস্টমস এর নতুন ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কাস্টমস অপরাধের সাথে 'মানিলন্ডারিং' এর সম্পর্ক কী? স্বাভাবিকভাবে প্রতীয়মান হতে পারে কাস্টমস অপরাধ কাস্টমস অ্যাক্ট ১৯৬৯ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বিচার্য। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সাথে এর সম্পর্ক কোথায়? কাস্টমস অ্যাক্টের সেকশন ১৬ এ দেশে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আমদানি-রপ্তানির সাথে সম্পর্কিত যে কোনো বিদ্যমান বিধি-বিধান বা আইন কাস্টমস অ্যাক্টের 'এলাইড অ্যাক্ট' হিসেবে বিবেচ্য। সে হিসেবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন কাস্টমস অ্যাক্টের সহযোগী আইন। অন্যদিকে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধনী) আইন ২০১৫ এর ধারা ২ (খ) (ঠ) অনুযায়ী এই অপরাধ তদন্ত করার জন্য "তদন্তকারী সংস্থা" হিসেবে কাস্টমসকে সরাসরি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী অন্যান্য সংস্থার মতো ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় কাস্টমস অনুসন্ধানের পাশাপাশি তদন্ত ও প্রসিকিউশনের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পূর্বে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এককভাবে এই অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলো। দুদক আইনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন শিডিউলভুক্ত থাকায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সার্কুলার অনুযায়ী এই দায়িত্ব দুদকের ওপর অর্পিত ছিলো। বর্তমানে যে সব সংস্থা 'সম্পৃক্ত অপরাধ' তদন্ত করবে সেসব সংস্থাকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে পুলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে কেবল সিআইডি এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। আইনের সংশোধনীতে এই ব্যাপ্তির কারণে 'বর্ডার কন্ট্রোল মিজারস', চোরাচালান ও কাস্টমস সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা অর্পণ কাস্টমসের জন্য এটি সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের। পূর্বে 'রিপোর্টিং এজেন্সি' হিসেবে কাস্টমসের ক্ষমতা সীমিত ছিলো। বাণিজ্যসংক্রান্ত লেনদেনে কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটলে অথবা চোরাচালান বিশেষ করে স্বর্ণ ও মুদ্রা আটকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-কে রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা ছিলো। এখন নিজেদের তদন্ত ও প্রসিকিউশনের দায়িত্ব পালন করতে হবে কাস্টমসকে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাস্টমসের ফাংশন মূলত ট্রেড বেইজড। আর এই ট্রেডবেইজড মানিলন্ডারিং অর্থ পাচারের মূল ক্ষেত্র। সর্বশেষ বিশেষায়িত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে যে সব অর্থ পাচার হয় তার প্রায় ৮০% হয় ট্রেডকেন্দ্রিক। চোরাচালান, আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিং হচ্ছে এই অর্থ পাচারের উর্বর ক্ষেত্র। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (জিএফআই) ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ এ প্রকাশিত অর্থ পাচারের প্রতিবেদনে বলেছে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ থেকে ৯,৬৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ৭৬,৩৬১.৪০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। ২০১২ সালে পাচার হয়েছে ৭,২২৫ মিলিয়ন ডলার, ২০১১ সালে ৫,৯২১ মিলিয়ন ডলার, ২০১০ সালে ৫,৪০৯ মিলিয়ন ডলার। আর ২০০৪ সালে ছিলো ৩,৩৪৭ মিলিয়ন ডলার। ২০০৪ হতে ২০১৩ পর্যন্ত ১০ বছরে মোট পাচার হয়েছে ৫৫,৮৭৭ মিলিয়ন ডলার, যার বছর গড় ৫,৫৮৮ মিলিয়ন ডলার। মুদ্রা পাচারের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ২৬[২]। জিএফআই-র এই প্রতিবেদনটির নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বিশ্বব্যাপী তুলনামূলক চিত্র এতে স্থান পেয়েছে। একই সাথে, এতে 'চোখ খুলে দেয়া'র মতো তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে পদ্মা সেতুর ব্যয় প্রাক্কলন ধরা হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা, সেখানে ১০ বছরের পাচারকৃত অর্থে কয়টি মেগাপ্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব তা নানামুখী আলোচনায় উঠে এসেছে। এর থেকে অর্থ পাচারের গভীরতা ও এ সংক্রান্ত অপরাধের মাত্রা স্পষ্ট হয়েছে।

[২] Global Financial Integrity, 2015, "Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2004-2013, p. 28-30, website: http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf

সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং টিমের সদস্যরা শুল্ক গোয়েন্দা অফিস পরিদর্শন করেন

একই প্রতিবেদনে ট্রেডবেইজড মানিলন্ডারিং সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। আমদানি ও রপ্তানির সাথে যেসব লেনদেন সংঘটিত হয় তাতে এই অপরাধের উপাদান জড়িত। বিশ্বব্যাপী এন্টি মানিলন্ডারিং এর মূল সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এর ২০০৬ এর একটি স্টাডিতে এই ট্রেডবেইজড মানিলন্ডারিংয়ের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, “the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimize their illicit origins.”[৩] অপরাধীরা অর্থ অবৈধভাবে আয় করে এবং তা বিভিন্নভাবে রূপান্তর করে ট্রেডকে কেন্দ্র করে। জিএফআই এর প্রতিবেদন এবং সম্প্রতি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধনী) আইন ২০১৫ প্রবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে কাস্টমস এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে জিএফআই প্রতিবেদনেও কাস্টমস এর সক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "Governments should significantly boost their customs enforcement by equipping and training officers to better detect intentional misinvoicing of trade transactions, particularly through access to real-time world market pricing information at a detailed commodity level."[৪] অন্যদিকে, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিংয়ের ২০১২ এর প্রতিবেদনে ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কাস্টমস এজেন্সিকে মুখ্য ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদনে মানিলন্ডারিংয়ের ধরন ও প্রকৃতি এবং এই এজেন্সির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয় নিয়ে নানা পরামর্শ রয়েছে এই প্রতিবেদনে [৫]।

[৩] Financial Action Task Force, 2006, “Trade Based Money Laundering” (Paris, France: Financial Action Task Force (FATF), website: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20Based%20Money%20Laundering.pdf

[৪] Global Financial Integrity, 2015, "Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2004-2013, p. 25, website: http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf

[৫] Asia Pacific Group on Money Laundering, 2012, "APG Typology Report on Trade Based Money Laundering, adopted in the 15 Annual Meeting (July 20), website: file:///C:/Users/USER/Downloads/Trade_Based_ML_APGReport%20(1).pdf

কেন অর্থ পাচার হয়?

নানা কারণে অর্থ পাচার হয়ে থাকে। দেশের আর্থসামাজিক পরিবেশ এর মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এসব কারণগুলোকে মূলত দুটো বৃহৎভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি সাপ্লাই সাইড বা সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত। যেখানে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকে, সেখানে অপরাধ বেশি ঘটে। আইনের যথাযথ প্রয়োগে ঘাটতি এর প্রধান কারণ।

এসব অপরাধের কারণে আবার পুরো সমাজও অপরাধপ্রবণ হতে পারে। আর এসব প্রতিটি অপরাধের পেছনে থাকে অর্থ সংযোগ। আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধের ওপর খ্যাতনামা গবেষক শেলি লুইস বলেছেন, প্রতিটি অপরাধ কোনো না কোন মুনাফা লাভের দ্বারা তাড়িত হয় [৬]। কেউ সহজ অর্থে আনন্দ বা খেলার ছলে অপরাধে লিপ্ত হয় না। পেছনে মুনাফার উৎসাহ থাকে। এই অর্থের ব্যবহার সহসা লোকচক্ষুর অন্তরাল করার প্রচেষ্টা থাকে। যেহেতু কষ্টার্জিত অর্থের চেয়ে অপরাধলব্ধ অর্থের ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমিত। তাই এর লুকানো বা ব্যবহারের পদ্ধতিও ভিন্ন। ব্যাংকিং বা অফিসিয়াল চ্যানেলে এই অর্থের লেনদেন পরিহারের জন্য নানা মাধ্যমের ওপর নির্ভর করতে হয় অপরাধীদের। দেশের ভেতর সম্ভব না হলে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে এই অর্থের। চোরাচালান, আয়কর ফাঁকি, শুল্কসংক্রান্ত অপরাধ, ঘুষ-দুর্নীতি, মাদকদ্রব্যের পাচার, অস্ত্র ব্যবসা, নারী পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ লেনদেন ও তা বিভিন্নভাবে রূপান্তর করার মাধ্যমে এই অর্থ পাচার ঘটতে পারে। বর্তমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে ২৮টি এ ধরনের সম্পৃক্ত অপরাধের কথা বলা হয়েছে। এসব অপরাধ যতো ঘটবে অর্থ পাচারের ব্যাপ্তিও ততো বাড়বে। দ্বিতীয়টি হলো ডিমান্ড বা চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট। যে সব দেশে এসব অর্থের চাহিদা আছে সেসব দেশে এই অর্থ প্রবাহ হবে এটি স্বাভাবিক।

এই অর্থ কীভাবে প্রত্যাবাসিত হলো, কেন হলো, কে করেছেন, এটি বৈধ কি না ইত্যাদি তথ্যের যাচাই সম্পন্ন হলে নিশ্চয়ই এই অর্থের প্রবাহ অবাধ হতো না। জিএফআই-র যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, এসব অর্থের বড় অংশ উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত বিশ্বে প্রবাহ ঘটেছে। কিন্তু কেন? এর জন্য কী কেবল উন্নয়নশীল দেশই দায়ী? এই প্রশ্নের জবাব কম বেশি অনেকের জানা। তবে আলোচনায় এটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। মূল কথা হচ্ছে, উন্নত দেশেও অর্থের চাহিদা রয়েছে। তাদেরও অর্থের প্রবাহ প্রয়োজন। তাদের অনেক দেশে স্থবির অর্থনীতির চাকা সচল করতে এই অর্থকে স্বাগত জানানো হয়। মালয়েশিয়ায় 'সেকেন্ড হোম' প্রকল্প এই প্রবাহের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র। বাইরে থেকে টাকা প্রবেশ করলে নানা ধরনের যাচাই ও প্রশ্ন করলে অর্থপ্রবাহে চাপ সৃষ্টি হতো। কিন্তু এই বাস্তবতা ঐদেশসমূহে আছে কি? যেসব উন্নত দেশে অর্থ পাচার হয়, ঐসব দেশে কড়াকড়ি আরোপ করলে এই অর্থ পাচার সীমিত হতে পারে।

সাপ্লাই ও ডিমান্ড বিশ্লেষণ ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির অভাব থেকেও অর্থ পাচার হতে পারে। অর্থ আছে, কিন্তু পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্র নেই। থাকলেও আর্থিক প্রণোদনা নেই। পরিবার ও পরিজনের বসবাস ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার অভাব বোধ করেন অনেকে। লেখাপড়া ও উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থার অভাব এবং আইন-শৃঙ্খলার ঘাটতিতে অর্জিত টাকার অনিশ্চয়তা থেকেও মানিলন্ডারিং এর তাড়না সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, বৈধভাবে অর্জিত কিন্তু অত্যধিক করারোপের কারণেও অর্থ পাচার ঘটতে পারে। সহনশীল কর হলে করদাতারা এগিয়ে আসবেন। কিন্তু অত্যধিক ও জটিল ট্যাক্স ব্যবস্থা থাকলে দেশে অর্থ ব্যয় ও বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এই অর্থ পরবর্তীতে অন্যদেশে চলে যেতে পারে। বৈধভাবে অর্জিত কিন্তু অবৈধ ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ হলো রিয়েল এস্টেট খাত। এ খাতে প্রকৃত লেনদেন ও প্রদর্শিত লেনদেনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্যজনিত অর্থ অবৈধ হয়ে যাচ্ছে। এমন অনেক জমি আছে যা প্রকৃতপক্ষে বিক্রি হয়েছে ৫০ কোটি টাকায়, কিন্তু দেখানো হয়েছে ১০ কোটি টাকা। বাকি ৪০ কোটি টাকা কালো হতে বাধ্য এবং তা বৈধ বিনিয়োগ বা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে এই অর্থ পাচারের সুযোগও পথ খোঁজে।

এসব অর্থ পাচারের ক্ষতির দিকটি বেশি। প্রথমত, যেসব ব্যক্তি এই পাচারের সাথে যুক্ত থাকে তারা সমাজের উচ্চ ও ধনিক শ্রেণির কতিপয় ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী। এসব ব্যক্তি নানা অবৈধ উৎস থেকে অর্থ উপার্জন করে বিদেশে পাচার করে দেয়।

[৬] Shelly Louise, 2006, Transnational Crimes and Terrorism.

এতে ঐ শ্রেণির ব্যক্তি স্বার্থউদ্ধার হয়। এই অর্থ দেশের বা সমাজের কোনো কাজে আসে না। কোনো বিনিয়োগ, শিল্প-কারখানা গড়া ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে না। পর্যাপ্ত পুঁজির অভাবে বৈধ ও প্রতিযোগী ব্যবসায়ে বাধার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, এই অর্থ বিদেশ থেকে আবার বৈধ হয়ে দেশে প্রবেশ করতে পারে। এতে অপরাধ আরো উৎসাহিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে বৈষম্য আরো বাড়তে পারে। অস্থিরতা ও নৈরাজ্য দানা বাঁধতে পারে। অধিকন্তু, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিনিয়োগের জন্য পুঁজি সঙ্কটে পড়তে পারে। বিনিয়োগ না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অন্যদিকে, এসব অর্থ যেহেতু হিসাবের বাইরে থাকে এবং উৎস লুকানো থাকে, তাই অন্যান্য অপরাধের সাথে এর সংযোগ ঘটতে পারে। সমাজের নানা অপরাধ ও সন্ত্রাসেও অর্থায়ন ঘটতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে 'নেক্সাস' গড়ে উঠেছে। শেলি লুইস (২০০৬) এর মতে, এই সংযোগ আগের তুলনায় অনেক বেশি। তাই অর্থ পাচারের সাথে জঙ্গি অর্থায়নের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না[৭]। আরেকজন গবেষক মাইকেল ফ্রিম্যান (২০১১) বলেন, সন্ত্রাসবাদের জন্য অর্থের প্রয়োজন। কারণ অর্থ সন্ত্রাসীদের 'রক্ত প্রবাহ' সৃষ্টি করে। আর এই অর্থ অপরাধ সংঘটনসহ নানা উৎস হতে প্রাপ্তি ঘটে [৮]।

কী করা দরকার?

নতুন আইন পাস ও জিএফআই প্রতিবেদন প্রকাশে অর্থ পাচার প্রতিরোধের বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। যথাযথ রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি কাস্টমস অর্থ পাচার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলে সার্বিক চিত্রপট পরিবর্তন হতে পারে। আর এজন্য এখনই কিছু দৃষ্টান্তমূলক ও দৃশ্যমান ফল দেখানো দরকার। ব্যাপকভাবে অর্থ পাচারের প্রেক্ষাপটে এই ভূমিকা এখন অনেকে হয়তো প্রত্যাশা করেন। হয়তো বৃহৎ জনগোষ্ঠি, সুশীল সমাজ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এ ব্যাপারে কার্যকর অর্থে ফলাফল দেখতে চান। নতুন এই ভূমিকার জন্য কাস্টমস যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। প্রথমত, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন একটি ফৌজদারি আইন। এই আইনে বিচার্য বিষয়, অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল এবং এতে বিশেষায়িত দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এজন্যে দরকার একটা সেল বা দপ্তর তৈরি করা। এই বিশেষ সেল বা দপ্তর এই আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে যাতে আইনের প্রয়োগে ইউনিফর্মিটি থাকে। এর অন্যতম যৌক্তিকতা হচ্ছে কাস্টমসের বিভিন্ন দপ্তরে বা হাউসগুলোতে এই ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকলে একেক দপ্তর ও কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে ভিন্নতা তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে, আইন-আদালত ও প্রসিকিউশনের সাথে যোগাযোগ ও মামলা পরিচালনায় বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরিতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই বিলম্ব ব্যতিরেকে কাস্টমসের একক কর্তৃত্বে একটি বিশেষ দপ্তরকে এই ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে। অথবা এ সংক্রান্ত একটি বিশেষ সেল সৃষ্টি করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, উক্ত দপ্তর বা সেলের কর্মকর্তাদের জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

এটি একটি নতুন আইন ও নতুন ক্ষেত্র। তাই এই আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে নতুন আইন, এর প্রায়োগিক দিক, অনুসন্ধানের রীতি, ফৌজদারি তদন্তের পদ্ধতি, আদালতে চার্জশিট জমা, সাক্ষ্য আইন ও সাক্ষী দেয়া, মামলা পরিচালনা, আদালতের সাথে যোগাযোগ পদ্ধতি, প্রসিকিউশন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এসব প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ঐ স্থানে পদায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক। কোনো কারণে অন্য জায়গায় পদায়ন করতে হলে পর্যাপ্ত সময় প্রদান এবং যোগ্য ও বিকল্প কর্মকর্তাদের পদায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, কোনো দৃশ্যমান ফল দেখাতে হলে ঐ বিভাগ বা সেলকে সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় জনবল ও লজিসটিকস দিয়ে সুসজ্জিত করা দরকার। শূন্য পদের বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন করা দরকার। একই সাথে, এই বিশেষ কাজটি সম্পন্ন করতে হলে অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। প্রকৃত কাজের প্রকৃতি নির্ণয় করে অর্গানোগ্রাম সংশোধন করার উদ্যোগ ও তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবি। একইভাবে অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশনসংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

[৭] Shelly Louise, 2006, Transnational Crimes and Terrorism

[৮] Michael Freeman, 2011, "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology", Studies in Conflict & Terrorism, no. 34, pp. 461–475.

শুল্ক গোয়েন্দায় মানিলন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলছে

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনায় অর্থ পাচারের পরিসর ও ব্যাপ্তি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে মূলত নতুন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের স্বরূপ উন্মোচন ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে নতুন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে কাস্টমসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সামনে চলে এসেছে। কাস্টমস কেবল রাজস্ব আহরণের বাহন বা খাত হবে না। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে যেসব দুষ্টু ক্ষত আছে, তা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সময় এসেছে কাস্টমসের। জিএফআই-র প্রতিবেদনে যে তথ্যচিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া দরকার। পদ্মা সেতু নির্মাণে ত্যাগ ও কৃচ্ছতাসাধনের বিষয়টি সবার জানা। অথচ পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ দিয়ে অনুরূপ প্রকল্প হাতে নেয়া সম্ভব। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কাস্টমসের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ট্রেডবেইজড মানিলন্ডারিং অর্থ পাচারের একটি বড় ক্ষেত্র। জিএফআই-র প্রতিবেদনেও তা স্পষ্ট হয়েছে। নতুন মানিলন্ডারিং আইনে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই কাস্টমসকে এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তাই যথাসম্ভব শীঘ্র কাস্টমসে একটি বিশেষায়িত দপ্তর বা সেল তৈরি করে জনবল, লজিসটিকস ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যত দ্রুত এটি করা যাবে, তত দৃশ্যমান ফলাফল দেখা যাবে। আগামী বছরের মূল্যায়নে এই দৃশ্যমান ফলাফল ইতিবাচক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। সার্বিকভাবে, অর্থ পাচার প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থায় সকলে উপকৃত হবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকার ও জনগণও সুফল ভোগ করবে। সুশাসনকে মাথায় রেখে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অর্থ পাচারের এই দুষ্ট ক্ষত দূর করার কোনো বিকল্প নেই। কাস্টমস কার্যকর অর্থে রূপকল্পের অগ্রযাত্রায় শামিল হতে পারে।

- ড. মইনুল খান, মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

Enhancement of Bangladesh Customs Website: Improving Ways to Communicate Customs Information and Promoting Trade Transparency

- Dr. Khairuzzaman Mozumder

Introduction

Despite the slow progress on the part of the Negotiating Group on Trade Facilitation[1] over the years since the launch of the World Trade Organization (WTO) negotiations on trade facilitation in 2004, significant progress has finally been made in 2013. Through intense negotiations held throughout the last half of 2013 as part of a plan to deliver something concrete at the 9th WTO Ministerial, the WTO members have finally been able to conclude the much anticipated. Trade Facilitation Agreement (TFA) at Bali, Indonesia, in December 2013. The provisions under the TFA comprise various trade facilitation measures that the Members of the WTO will have to implement over the next few years following the ratification of the Agreement.

The purpose of this research paper is neither to chronicle all the events that unfolded and the negotiating processes that evolved over the years and ultimately led to the finalized text of the TFA, nor to focus at length on all the aspects of the Agreement itself. Instead, the paper will restrict its scope to an important aspect of the Agreement, that is, publication and availability of trade information. More specifically, it will aim at examining the context of the possible scope for dissemination of trade and customs information in Bangladesh and the promotion of governmental transparency through the enhancement of the customs website as a Customs Information Portal. While there are a number of government agencies that deal with trade related issues, in order to provide an in-depth analysis of the electronic dissemination of customs information and the role it plays in easing the process of information gathering for the trade and business community, this study will limit its focus of attention to the NBR websites only. Keeping other government agencies outside its purview is also justified for a substantially large part of trade related information actually involves customs, and therefore creation of an effective and enhanced Customs Portal will ultimately serve as a stepping stone towards the establishment of a general trade portal in the long run.

The paper will progress through a number of sections. While section I attempts to set the theoretical context on the role of internet as an instrument for communicating trade information and a means to promote governmental transparency, section II elaborates on various standards that reaffirm the importance of the use of internet in achieving these objectives. Section III will assess the current situation in Bangladesh in terms of the progress in implementing international standards and best practice in this regard, and section IV will elaborate on the governmental efforts towards improving the existing capacity in electronic dissemination of customs information. Finally, the article will conclude by highlighting the possible uses of electronic dissemination, in the form of an Enhanced Customs Website, by the NBR, including its benefits in facilitating intelligence information gathering and reception of intelligence information.

[1] The WTO General Council adopted on 1 August 2004 a decision on the Doha Work Programme, generally known as the "July Package", which defines modalities for negotiations in the current round of trade talks. Among others, the "July Package" includes "Modalities for Negotiations on Trade Facilitation", which mandate the WTO members to launch negotiations on this issue. Accordingly, the Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF) was formed to carry out the tasks as per this mandate, and the NGTF started working in November 2004.

Section I: Role of internet in communicating trade information and promoting transparency

This section will try to set the broader theoretical context on the growing emphasis on and recognition for, electronic information or internet as an effective instrument for communicating trade and customs information, and a means to promote governmental transparency on trade policies and processes. The discussion begins with an attempt to offer an understanding of what the term 'government transparency' entails and how access to electronic information contributes to such transparency.

The Federal Institute for Access to Public Information (cf Santos et al., 2013) defines government transparency in terms of its three elements that include 'openness of information from the government', 'communication or knowledge-sharing on the part of citizens', and 'accountability or justification, to the citizens, of decisions taken by the government'. It is somewhat similar to the concept of 'open government' advocated by the US Obama Administration with its three goals of transparency, collaboration and citizen participation. Such 'open government' policy makes it obligatory for the US government agencies to resort to internet or electronic communication for making available to the public 'their missions, activities, and results so as to facilitate public dialogue, and to solicit feedback, questions and suggestions for how to improve government' (Sharon & Natalie, 2010).

From that perspective, the issue of electronic government or e-government assumes a paramount importance when it comes to promoting transparency. Emphasizing the role of information and communication technologies (ICTs) in general or electronic communication in particular, Welch (2012) defines 'transparency' as the "active disclosure of information by an organization that enables external actors to monitor and assess its internal workings, decisions and performance". Such disclosure of information is generally a 'one-way communication process in which the organization provides information to other stakeholders'. Here, the widespread use of government websites is positively associated with satisfaction of e-government. This in turn is positively linked with citizens' trust with the government, which ultimately ensures transparency of the government (Welch et al., 2005).

This leads us to the issue of governmental information, which according to Batista, is a public good, and therefore needs to be "available to citizens, not only through the physical environment, but also through a language that is accessible, intelligible and translated for the average citizen" (cf Santos et al., 2013). It implies that the simple availability of technological resources, such as the internet, is not enough in guaranteeing transparency and that it would also require the existence of effective and enhanced websites that provide adequate information in clear language or medium for the common citizen and in easily accessible manner. The ideal example of such web communication is the "Data.gov", a government website in the US that provides extensive access to public information sources across different government organizations or locations offering electronic access to government finance, performance, and decisions. Another example of governmental information promoting transparency is that of Taiwan, where, as one study revealed, over 70% of public agencies provide freedom of information requests, and that "half of them offer electronic resources for accessibility of information, while the other half provide e-mail" (cf Santos et al., 2013).

The growing importance of internet in government transparency has also been stressed upon by some scholars (Mitchinson & Ratner, 2004). Mitchinson & Ratner basically underscores the current age of knowledge economy, which is characterized by the rise in ICTs that has enabled 'the rapid and easy flow of information from one location to another'. The advent of the knowledge economy has influenced the governments around the world to increasingly focus on e-governance as a way of promoting transparency. The term 'e-government' generally implies the use of ICT and internet by the public sector 'in support of public administration' (Ibid). This explains why the so-called knowledge revolution has also popularized the use of internet or website as an effective and efficient method for electronic dissemination of government information to the public.

After presenting a brief theoretical construct on the linkage between effective communication of information through websites and promotion of government transparency, We will now try to address the same issue from the perspective of trade policy decision making and trade processes and procedures. Availability of trade information is increasingly considered by the multilateral trade fora (e.g. the WTO) as one of the key elements of transparency. Persons often need specific information about the process(es) involved in a particular trade/customs operation they intend to carry out and the responsibility to provide such information completely and accurately lies with the trade/Customs agencies. It is, therefore, necessary for relevant government agencies, such as Customs, to take steps to improve the means of delivery of such information.

The WTO TFA aims at increasing the transparency and efficiency of customs and other administrative procedures involved in trading goods across international borders. Recognizing the importance of electronic dissemination in effectively communicating trade information and increasing government transparency, the TFA obligates all member countries to disseminate trade information through the electronic format, e.g. through the internet websites, as it allows wider dissemination and provides information in readily downloadable form. Again, the TFA mandates members to provide e-service delivery through enquiry points. The World Customs Organization (WCO) Revised KYOTO Convention (RKC) also emphasized the need to make customs information available to interested persons.

Realizing the potential of such electronic dissemination, countries across the world are increasingly enhancing their trade/customs websites to transform them into repositories or reservoirs of trade information and to facilitate e-service delivery for such information. A number of country practices in Asia are cited here as illustrations. For example, the Trade Portal of the Lao PDR is a good model for the developing countries, as it has created a single repository for all import and export information for the country (UNNeXT, 2016). The Trade Portal developed by the Department of Commerce in India is another example. As reported in UNNeXT (2016), there are similar initiatives from international organizations. Examples include- UNCTAD's Business Facilitation Program, which is 'a web-based e-government system to help the developing countries work towards business facilitation through transparency, simplification and automation of trade processes. Again, the APEC's Services Trade Access Requirement (STAR) Database is a business friendly online tool to help services providers from the APEC countries by 'gathering information on services market access into a single, easily accessible knowledge bank, aimed at increasing business awareness of the regulatory requirements to trade' (UNNeXT, 2016).

Section II: Transparency in Customs information and relevant international standards

This section examines the issue of transparency in customs information through elaborating on various standards that stresses on the importance of the use of internet or access to electronic information as a means for communicating governmental information in trade and customs and for promoting transparency.

Examining international standards on the issue, we find that Chapter 9 of the General Annex of the WCO RKC emphasizes the availability of Customs information to interested persons. But it does not specify the means and channels through which such availability could be ensured. According to Chapter 9(A):

"A. Information of General Application
9.1. Standard
The Customs shall ensure that all relevant information of general application pertaining to Customs law is readily available to any interested person.
9.3. Transitional Standard
The Customs shall use information technology to enhance the provision of information."

The WTO has attempted to devise international standards aiming to increase the transparency of trade regulations. For example, GATT Article X delineates the transparency obligations by incorporating provisions for publication and administration of trade regulations. However, it only requires that information be published in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them. Like the RKC, GATT does not specify the means and channels of such publication.

The WTO attempted to address the lacuna while framing the TFA. Article 1 of the Agreement deals with publication and availability of trade/customs information. Paragraph 2 of Article 1 specifies the need for information to be available through internet. According to Article 1(2):-

"2.1. Each Member shall make available, and update to the extent possible and as appropriate, the following through the internet:

a. A description1 of its importation, exportation and transit procedures, including appeal procedures, that informs governments, traders and other interested parties of the practical steps needed to import and export, and for transit;

b. The forms and documents required for importation into, exportation from, or transit through the territory of that Member;

c. Contact information on enquiry points.

2.2. Whenever practicable, the description referred to in sub-paragraph 2.1 a. shall also be made available in one of the official languages of the WTO.

2.3. Members are encouraged to make available further trade related information through the internet, including relevant trade-related legislation and other items referred to in paragraph 1.1 [2]*."*

Paragraph 3 of Article 1 of the TFA deals with enquiry points. According to Article 1(3):

"3.1. Each Member shall, within its available resources, establish or maintain one or more enquiry points to answer reasonable enquiries of governments, traders and other interested parties on matters covered by paragraph 1.1 as well as to provide the required forms and documents referred to in sub-paragraph 1.1 a. …."

From the perspective of increasing transparency of trade related information across the world, the TFA is particularly significant as its Article 1 not only specifies information technology as the means to ensure availability of their trade/customs information, but also makes it obligatory for member countries to publish such information through the internet.

Examining Bangladeshi standards, we find that the Right To Information (RTI) Act, 2009 provides for extensive proactive disclosure provisions, whereby public bodies must place defined types of information in the public domain. Such proactive disclosure needs to follow the principles outlined below:

- Information should be accessible (easy to find),
- It should be easy to understand,
- It should be relevant, and
- It needs to be regularly updated.

This section has attempted to highlight various standards and international best practice that mandate, as trade facilitation measures, the use of internet or websites to communicate trade-related governmental information and to promote transparency. The following section will try to assess the situation or status as of February 2015 with respect to the implementation of those trade facilitation measures.

[2] Sub-paragraph 1.1 of the TFA is as follows: Each Member shall promptly publish the following information in a non-discriminatory and easily accessible manner in order to enable governments, traders and other interested parties to become acquainted with them:
a. Importation, exportation and transit procedures and required forms and documents;
b. Applied rates of duties and taxes of any kind imposed on or in connection with importation or exportation;
c. Fees and charges imposed by or for governmental agencies on or in connection with importation, exportation or transit;
d. Rules for the classification or valuation of products for customs purposes;
e. Laws, regulations and administrative rulings of general application relating to rules of origin;
f. Import, export or transit restrictions or prohibitions;
g. Penalty provisions against breaches of import, export or transit formalities;
h. Appeal procedures;
i. Agreements or parts thereof with any country or countries relating to importation, exportation or transit;
j. Procedures relating to the administration of tariff quotas.

Section III: Status in promoting electronic dissemination of customs information in Bangladesh

Bangladesh strictly adheres to the developments spearheaded by the WTO and the WCO in relation to the facilitation of international trade and securitization of the international supply chain management of goods. It has realized the importance of facilitation of trade long before the conclusion of the WTO TFA. Considering the role of trade facilitation in fostering economic growth, Bangladesh has already made significant changes to its customs and trade procedures relating to many trade facilitation areas, such as automation of customs processes, simplification of customs procedures etc. by the time the TFA was concluded in December 2013.

However, as will be evident from the following discussion, the progress was less pronounced in the area of publication and availability of trade/customs information, especially in relation to the availability of such information through the internet. Electronic dissemination of trade-related information was dealt with by different government agencies through a number of websites with hyperlinks to the websites of their subordinate departments. The two main government agencies were the National Board of Revenue (NBR) that disseminated customs information and the Ministry of Commerce that disseminated non-customs trade information. Other government agencies included the Department of Agriculture Extension (for information on quarantine procedures) and Bangladesh Standards and Testing Institute (for information on standards issues). However, as emphasized in the introduction to this research article, this study will limit its focus to the NBR websites only.

In collaboration with the development partners, a number of studies (UNCTAD, 2012; IFC, 2014) have been conducted to assess the current status in relation to the trade facilitation initiatives and to devise the country implementation plan. These studies focused on the trade facilitation areas in general and, therefore, lacked any direct relevance to the specific issue of internet-based provision of trade and customs information. The Bangladesh Trade Facilitation Activity (BTFA) program of the USAID, being implemented by IBI, has attempted to address this caveat and undertaken a situation assessment for this particular purpose[3].

The USAID BTFA study (IBI, 2015a) conducted a technical assessment covering the current state of the internet accessibility of customs information, and examining the extent of availability of information through the internet immediately after the conclusion of the WTO TFA. The findings revealed that though there were three websites at the NBR (www.nbr.gov.bd/, customs.gov.bd/ and www.nbr-bd.org/)[4] with different domain names, none contained adequate information, forms and documents that could fully satisfy international standards or ensure transparency (e.g. accessibility and availability) of internet-based customs information. It also revealed a number of inadequacies with these websites in terms of both the accessibility to the websites and the availability of customs information.

[3] The study titled Situation Assessment: Internet-Based Trade/Customs Information in Bangladesh (IBI, 2015a) was conducted by a team comprising three IBI officials including me. The other two officials were Dr. Mohammad Abu Yusuf and Md. Rezwanur Rahman.

[4] Following a recommendation from the USAID BTFA study, the NBR has discontinued one of the websites (www.nbr-bd.org/).

Common inadequacies in terms of the accessibility of Customs information, as highlighted in the USAID BTFA study (IBI, 2015a), were as follows:

- *The websites were not well designed or organized, and were not easy to read or navigate. In other words, these were not user friendly.*
- *iformation, rules, procedures and documents available on the websites were not grouped under a proper 'menu/heading'.*
- *As information, documents etc. were not regularly and timely uploaded and updated, these were not easily accessible by users.*
- *None of the websites had any interactive feature.*
- *The websites lacked options for users to give feedback or raise complaints on customs matters or to 'check with expert' on customs matters.*
- *The websites did not tell users when they were last revised, modified, or updated.*

Common inadequacies in terms of the availability of customs information, as highlighted in the USAID BTFA study (IBI, 2015a), were as follows:

- Absence of a Description of the practical steps in the import, export, transit and appeal procedures.
- Absence of the forms and documents required for Customs purposes.
- Absence of internet-based national enquiry point for customs information.
- Lack of manifest submission and processing information that relates to both goods and cargo declarations (while one website (www.customs.gov.bd) provided some information on goods declaration, it was not user-friendly and extraction of information on the current state was very difficult).
- Absence of the operative tariff schedule/ the provision of a duty calculator.
- Lack of information on advance rulings.
- Absence of a valuation database.
- No information on currency exchange rates.
- Lack of information for travelers and tourists (such as duty free allowances, tourist refund scheme, information for air crew, updated baggage rules).
- Absence of a separate menu for customs information relating to the EPZs and EZs.
- Lack of an archiving facility (to store previous years' budget documents, previous baggage rules, finance acts etc.).
- Lack of a media center (news, events) and link with other trade agencies (although there were some links, they were not functional).
- Information on donor and GoB projects.
- Non-availability of specific information on risk management (e.g. compliance management and audit) including the existing RM practice.
- Information, rules, procedures and documents available on websites were not easily accessible by users (i.e. these were not user friendly) and were not regularly updated.

- The NBR websites did not have necessary systems to allow the users, clients, general public, and third parties, e.g. the banks, the agents etc., to report questionable behavior by NBR employees.

This section has attempted to assess the current situation as of February 2015 with respect to the implementation of trade facilitation measures in relation to the provision of customs information through the internet. The following section will try to elaborate on the governmental efforts towards improving such electronic dissemination.

Section IV: Actions taken in Bangladesh to improve the provision of electronic dissemination of customs information

This section highlights the actions taken by the NBR, since the conclusion of the WTO TFA, to improve the provision of customs information through the internet. In order to comply with international standards and best practice and more importantly to comply with the mandatory measure under the TFA relating to provision of trade information through the internet, the NBR has undertaken the task of improving its existing capacity in electronic dissemination. With technical assistance and support from the USAID BTFA, the NBR has pursued a two-pronged strategy to attain this objective. These included- (a) creation of a dedicate Customs Information Portal through enhancing the customs website, and (b) facilitation of e-service delivery through the establishment of national enquiry point for customs.

(i) Creation of a Customs Information Portal through enhancement of customs website

The NBR decided to create a customs information portal through the enhancement of its customs website. The idea is to develop a recognizably modern, easily navigable customs website that corresponds to best practice internationally. The ultimate aim was to create a website that will serve as a complete and comprehensive, one-stop, for all procedures, forms, laws and other information pertaining to customs in Bangladesh. In the interest of trade facilitation, it will provide increased and rapid access to organized customs information to an international audience as well as Bangladesh's public and private sector. It was also envisaged that the enhanced customs website will respond to an identified requirement for transparency and to the citizens of Bangladesh's demand for increased information and services.

The first task undertaken to accomplish this objective was to develop an architecture for the proposed website. The USAID assisted the NBR in developing the said Architecture (IBI, 2015b). While preparing the architecture, content and functional requirements for the planned NBR Customs Website were gathered and analyzed through a series of meetings with both public and private sector. Such meetings proved extremely useful, especially in identifying the probable informational requirements for different stakeholders of the NBR and users of customs information. In preparing the architecture, the aesthetic requirements were also considered and the approach taken to gather requirements was through an iterative series of presentations of a wireframe user interface. Efforts were also made to address the inadequacies found in the BTFA study (IBI, 2015a) The next step involved the development of the web design for the enhanced Customs Website, using the agreed architecture as the basis. While working on the web design, the NBR also worked to develop the content for the enhanced Customs website. With technical assistance and support

from the USAID, the NBR updated and compiled all customs Statutory Regulatory Orders (SROs), administrative procedures/orders etc. so that these could be posted on the 'Enhanced Customs Website'.

Meanwhile, the NBR has obtained the allocation of a URL and a dedicated web server from the Bangladesh Telecommunications Company Ltd. under the Ministry of Post, Telecommunications and Information Technology for this purpose. For the hosting of the proposed enhanced Customs website, the NBR has selected the URL or domain name of www.bangladeshcustoms.gov.bd. Using the web design developed as per the architecture, all contents have been uploaded to www.bangladeshcustoms. gov.bd in early May 2015, and the beta testing of the website has begun. A screenshot[5] of the home page of the beta version of the enhanced customs website is presented at the box.

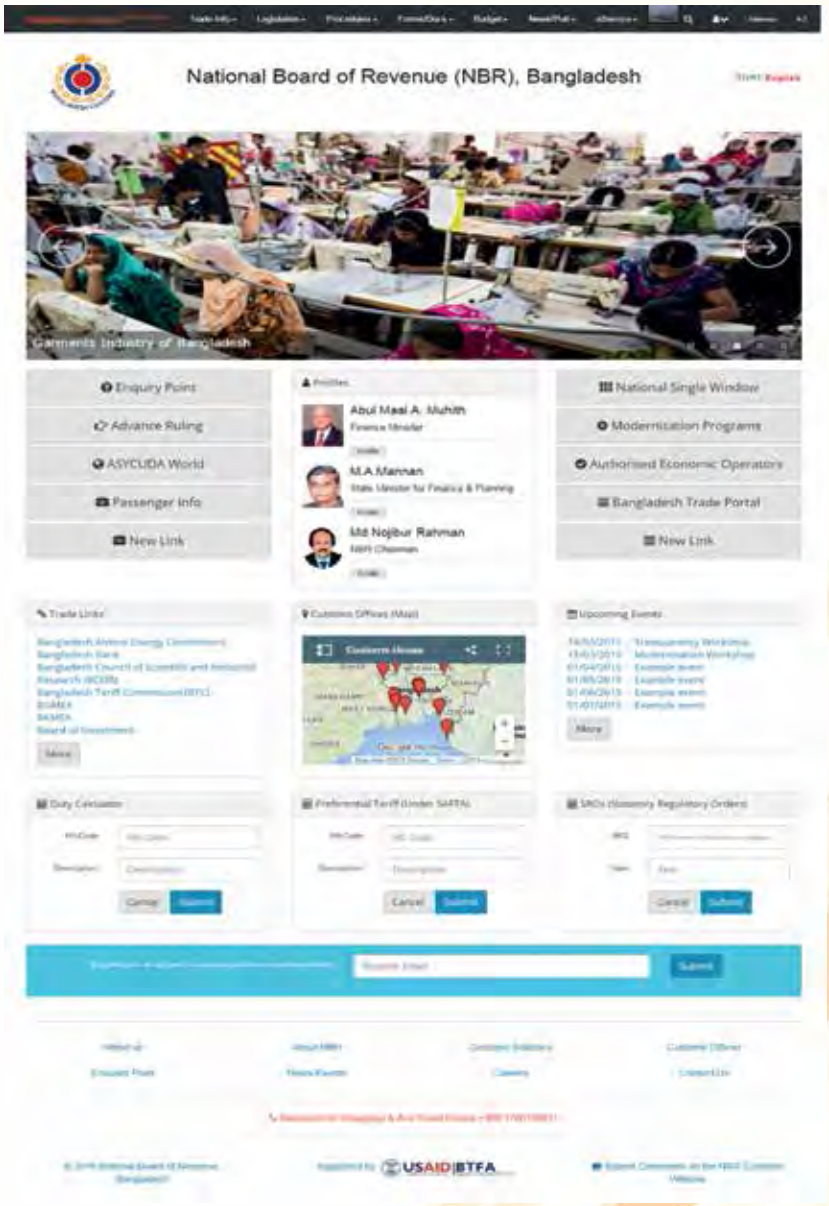

As soon as the beta testing is complete, the NBR will be able to officially launch the www.bangladeshcustoms.gov.bd website as the Customs Information Portal[6]. This customs website will be publicly accessible. The intended audience (or users) of the customs website is expected to include primarily:

- Any party participating in trade (e.g. exporter/importer/agent).
- Any customs official wishing to access legislation, procedures etc. for reference.
- Other branches of the public sector, other government agencies.

[5] The beta version of the website is currently being tested by the NBR in collaboration with the USAID BTFA program. After this initial testing, the NBR will conduct validation workshop to receive and incorporate comments from relevant stakeholders.

[6] The beta version of the Enhanced Customs Website is available at www.bangladeshcustoms.gov.bd/beta.

(ii) Establishment of national enquiry point

According to Article 1(3) of the WTO TFA, countries require to establish and maintain one or more enquiry points to answer reasonable enquiries of governments, traders and other interested parties on trade-related matters as well as to provide the forms and documents required to transact business. As discussed in Section III, at the moment, neither the NBR head office nor any of its field offices have any officially designated enquiry points. In order to assist the NBR in establishing its own National Enquiry Point or NEP, the USAID BTFA is currently providing the necessary technical assistance.

A national enquiry point can be either internet-based or phone-based or both. While the usefulness of a phone-based or call centre type NEP cannot be underestimated or downplayed, considering the growing recognition for e-service delivery and the ease in retrieving or collecting customs information through electronic means, internet-based NEP assumes a greater significance. Therefore, the NBR plans to establish an internet-based NEP on a pilot basis. Success of the pilot program will help the NBR embark later upon establishing the more ambitious call centre type enquiry point(s).

For the purpose of introducing an internet-based National Customs Enquiry Point, the enhanced customs website highlighted above is considered to be the most effective platform. If the NEP is linked from the customs portal, it will be able to introduce a simple and always-available channel of communication between public and private sector and will accelerate e-governance through efficient e-customs information delivery.

To facilitate the establishment of an internet-based NEP at the NBR, an exhaustive database of frequently asked questions and their appropriate and up-to-date answers have been developed in collaboration with the USAID BTFA program (IBI, 2016), which will be posted in the NEP site. The NBR is currently preparing the architecture for the proposed internet-based NEP. Once the architecture is developed, it will be linked from the Customs Information Portal. The NEP will enable interested traders or business people or any interested person to gather information related to customs processes and procedures, and will, in turn, contribute to promoting governmental transparency.

Concluding remarks: Possible benefits for intelligence information gathering?

As evident from the preceding discussion, the information revolution since the end of the last century and the resultant advent of the knowledge economy have enhanced the popularity of internet and its use. Accordingly, communication of governmental information through electronic dissemination has increasingly been recognized as an effective instrument for promoting government transparency. The same was true in the area of international trade. Growing recognition among countries of the need to bring transparency in trade information has resulted in the emergence of international standards and best practice that emphasize on increasing the availability of such information through the internet.

This research article has also revealed that the NBR is fully committed to promote transparency in customs information through improving its capacity in electronic dissemination of information. Accordingly, it has decided to develop a recognizably modern, easily navigable customs website, and has so far made a significant progress. Development of the Enhanced Customs Website is in its advanced stage and is currently being beta-hosted. When officially launched, the website will serve as a complete and comprehensive repository for all customs procedures, forms, laws and other information and will cater to informational requirements of both government officials and private sector users (e.g. exporter, importer, agents or any other person) from home and abroad. In addition, the NBR is also committed to establish internet-based NEP, which will improve its ability to provide e-information delivery. While promoting transparency in Customs information, these activities will also give users access to a great deal of information about customs rules, regulations, processes and procedures.

One potential benefit that merit our special focus here is the possibility of the provision of customs intelligence hotline. The NBR has recently undertaken an initiative, in collaboration with the USAID BTFA, to review and enhance the capacity of its Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID). In order to enhance the CIID's ability to gather intelligence information, a special menu may be created in the enhanced Customs Website in the name of 'Customs Intelligence Hotline'. In that way, the Website will be able to provide a telephone hotline number for persons interested to divulge important intelligence information to CIID officials. The 'Customs Intelligence Hotline' may also have provisions for electronic submission of such intelligence information. Again, the Website may host another menu on 'Enforcement & Seizures', which will showcase or display all the brilliant performances of the CIID in detecting fraud and smuggling cases, recent examples being the seizures of vehicles imported through the misuse of Carnet de Passage facility. Such display will also serve as a powerful deterrent for any potential wrongdoers.

In order to succeed in upgrading the capacity for electronic dissemination of customs information, and thereby promoting transparency in such information, the NBR needs to focus on achieving a number of important requisites. First, it will have to develop a well-conceived plan for the operation, management and sustainability of the Enhanced Customs Website, so that the same or increased level of capacity for electronic dissemination and e-information delivery can be maintained over time. Secondly, a difficult challenge usually faced by governments while providing information through the internet is to move beyond the culture of secrecy and find ways to actively disseminate information to the public (Mitchinson & Ratner, 2004). In order to ensure that it is not the case with the Enhanced Customs Website, and that the website provide the 'bedrock to transparent and accountable customs administration', the NBR will have to take necessary and adequate steps.
Through formulation of an effective management structure, ensuring constant flow of information, development of a system of accountability in the timely delivery of internet-based enquiry point services, and renewed commitment in improving access to the internet, the NBR will be able to make a significant progress with regard to facilitating effective communication of customs information and promoting transparency of the customs administration.

References

1. *(a) IBI, 2015, Situation Assessment: Internet-based Trade/Customs Information in Bangladesh, a study by USAID BTFA program, Washington, USA.*
2. *(b) IBI, 2015, Enhanced Customs Website: A Draft Architecture, prepared for the National Board of Revenue by USAID BTFA program, Washington, USA.*
3. *IBI, 2016, National Enquiry Point: Comprehensive Database of Frequently Asked Questions, prepared for the National Board of Revenue by USAID BTFA program, Washington, USA.*
4. *IFC, 2014, Bangladesh's Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement: Analysis and Reform Map, World Bank Group, Washington, USA.*
5. *Mitchinson, Tom & Mark Ratner, "Promoting Transparency through the Electronic Dissemination of Information", in Oliver, E. L. & Larry Sanders, ed., 2004, E-Government Reconsidered: Renewal of Governance For the Knowledge Age (University of Regina Press: Canada).*
6. *Santos, C. S., & O. L. G. Quelhas, S. L. B. Franca, M. J. Meirino, and L. P. Zotes, 2013, "Transparency in government institutions: a literature review", in Brazilian Journal of Operations & Production Management, volume 10, number 2.*
7. *Sharon, S. D. & H. Natalie, 2010, "Information strategies for open government: challenges and prospects for deriving public value from government transparency", Proceedings of the 9th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, Lausanne, Switzerland.*
8. *UNCTAD, 2012, National Plan for the Implementation of the Future WTO Trade Facilitation Agreement: Bangladesh, Geneva, Switzerland.*
9. *UNNeXT, 2016, Making the WTO Trade Facilitation Agreement Work for SMEs: Mainstreaming Trade Facilitation in SME Development Strategies, UNESCAP & ITC, Bangkok, Thailand.*
10. *Welch, E. W., & C. C. Hinnant et al., 2005, "Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government", in Journal of Public Administration Research and Theory 15(3).*
11. *Welch, Eric W., 2012, "The relationship between transparent and participative government: A study of local governments in the United States", in International Review of Administrative Science, volume 78, no. 1.*

- **Dr. Khairuzzaman Mozumder,** Deputy Chief of Party, USAID BTFA

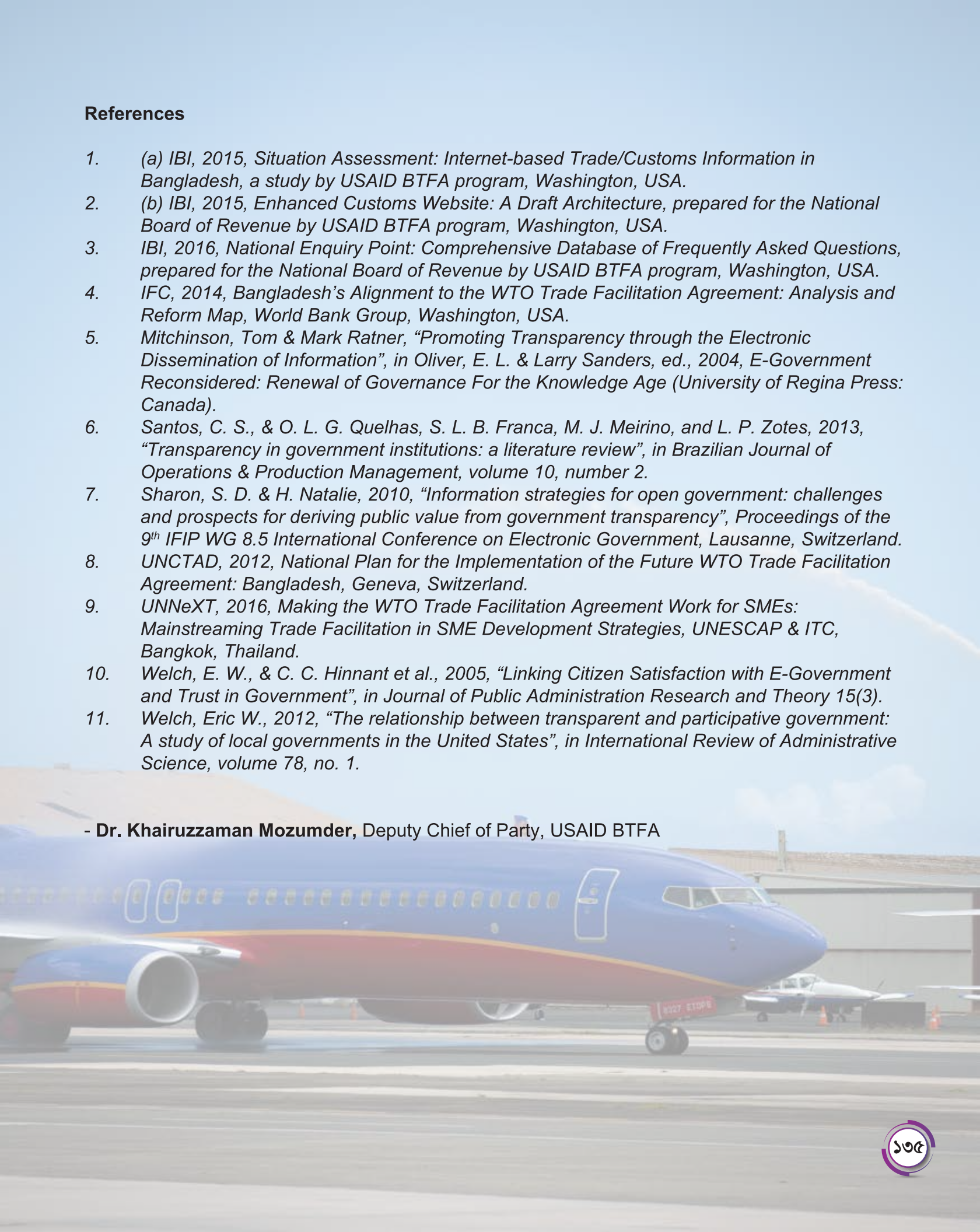

MAERSK
Matson
GATT

Using A Risk Based, Intelligence-led Approach To Everything We Do ...

- Dr. Mohammad Abu Yusuf
and Mark Hamill, USAID BTFA

Risk Management within Customs

A common characteristic of customs work is the impossibility of checking every consignment or person moving across borders; and nor should any administration try to. In recent times, customs find themselves under increasing pressure from national governments and international organizations to facilitate the clearance of legitimate cargo while also responding to increases in cross-border crime and terrorism. These competing interests mean that it is necessary for customs to find an effective balance between facilitation and control.

Changes in the strategic operating environment of customs, together with long-term growth in trade and cross-border travel volumes, has affected the way administrations are managed and how they approach their regulatory obligations. Consequently, most customs administrations now utilize 'risk management'(as promulgated by the WCO and WTO) as the key vehicle for meeting the demands of the 21st century operating environment. The primary objective of risk management is to assist customs in proactively identifying risk as early in the supply chain as possible. As a result of concentrating control efforts towards such risks, consignments or persons deemed low risk are automatically afforded clearance with zero or minimal intervention. Today,an embedded culture of risk management is seen as one of the guiding principles associated with a modern customs service.

The Role of Intelligence within Risk Management

Intelligence is the driving force behind risk management, as it helps to identify risks, develop profiles and provide up to date information on the current threats facing a customs administration.

The concept of risk can be applied to any decision making situation where the outcome is uncertain. The uncertainty arises because we are unable to see into the future, however, we are able to anticipate what might occur and develop appropriate actions to help prevent an unwanted outcome.

Risk is inherent in almost everything we do, whether that be administering a customs program, managing a project, purchasing equipment, crossing a busy street with heavy traffic or travelling by car or bus from home to the office. We manage risks continually and often unconsciously - but rarely systematically. Time is a central and vital variable to be considered when dealing with risk; there is little point applying measures to counter a risk if it has already passed or the risk has changed.

> **WCO Definition of Intelligence**
>
> "A product derives from the collection and processing of relevant information which acts as a basis for user decision-making."

The systematic application of risk management allows customs to prepare for what might happen and subsequently take appropriate action to help avoid or reduce exposure to unwanted events. It can also be used to maximize the potential outcomes of opportunities. The management of risk is not always about managing potentially negative impact; it can also be about taking a calculated

WCO Global Information and Intelligence Strategy

"Risk management is key to the overall reconciliation of the requirements of enforcement, security and facilitation. Intelligence, in turn, is a key component of risk management. Intelligence is produced from the collection and processing of information and is used primarily by Customs decision-makers at all levels to support their decision-makers processes at strategic, tactical or operational level."

approach to dealing with opportunities.

In summary, intelligence allows customs to proactively tackle areas where it is assessed there are most likely to be risks so it can take appropriate action to counter (or treat) those risks before they occur.

Centralized Activities

Amongst other roles, the Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID) act as the national unit responsible for the centralized collection, analysis and exploitation of intelligence for Bangladesh Customs. Over the past 2 years, the CIID continues to enjoy multiple high-profile successes under the energetic and professional leadership of Dr. Moinul Khan (PhD).

The CIID recognizes the ever-changing nature of threats faced by Bangladesh, and the directorates committed to an ongoing program of professional development in line with international best practices. The long-term vision of the CIID is to be a trusted and participating member of the intelligence community, both at a national and international level. To this day, the CIID continues to be instrumental in leading efforts to implement and institutionalize modern intelligence techniques within the NBR.

In addition to the CIID, local intelligence units also operate at most customs locations across Bangladesh. These units play a pivotal role in efforts to identify and tackle risk at a local and national level. Staff based at these local ports or Inland Clearance Depots (ICDs) often have an excellent understanding of the type of threats that exist on a local level in their respective work areas.

To maximize operational effectiveness, these local units understand the need to feed relevant information up to the CIID so it can be analyzed and exploited at a national (strategic) level. Such information should be conveyed in an accurate and timely manner so as to ensure identified risks can be targeted and dealt with swiftly.

Chapter 6 - WCO Revised Kyoto Convention

"The existence of a centralized intelligence unit would enable the collection and analysis of information which can be used to develop risk assessments on commodities, importers, industries, sources, etc. This would allow for more efficient targeting of shipments for examination at importation. This unit would also be responsible for developing information sharing networks with other Customs administrations and throughout the entire law enforcement community"

Intelligence Principles and Cycle

Many people often mistake the difference between what constitutes information and what constitutes intelligence. A brief definition of each is available below:

Information	Unevaluated material, which when processed, may be of operational or intelligence use (Passive)
Intelligence	Information which has been evaluated and or analysed and has been identified as being of material value. It alerts, warns and provides advance information about areas of potential risk (Active)

Specific sets of activities need to be carried outto produce intelligence of all kinds for decision making users. These activities are cyclical and feature five distinct phases, as per the diagram below:

WCO Intelligence Cycle

1. Direction
2. Collection
3. Processing
4. Dissemination

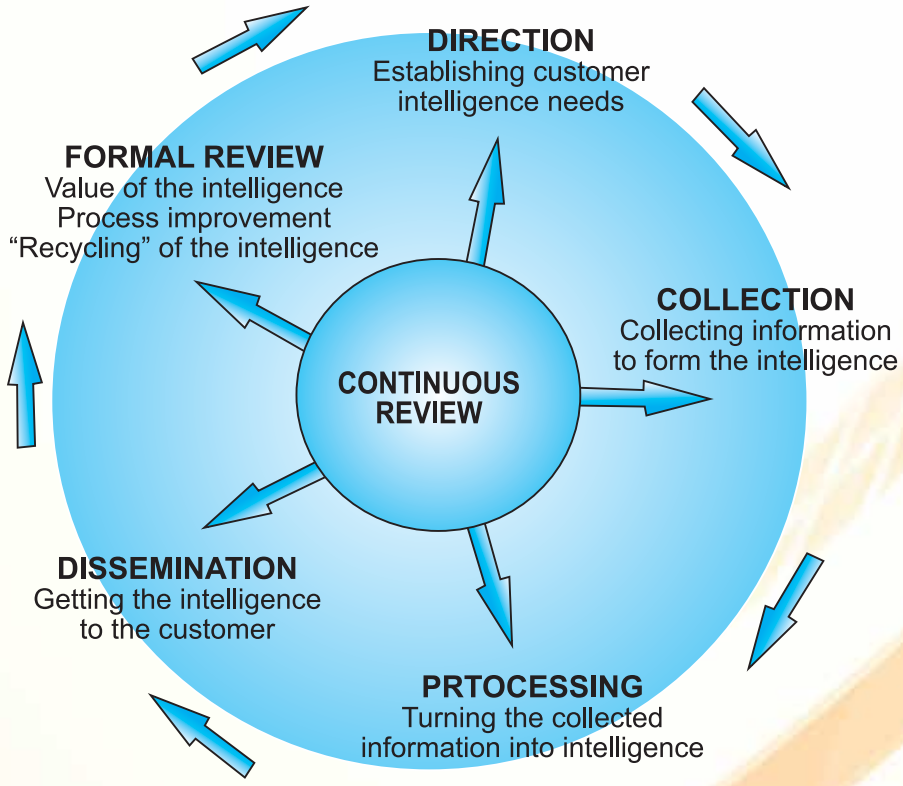

5. Formal Review

Every step of the cycle must be subjected to **Continuous Review**

To maximize operational effectiveness, intelligence must be:

Honest: Objective, unbiased and without prejudice.

Logical: Based on accurate and relevant facts with realistic conclusions.

Timely: Be in the hands of the user in time for appropriate action to be taken.

Secure: Include adequate precautions to protect sources of information from identification.

Sources of Intelligence

All the information from which intelligence is derived is contained within a "information pool". Customs continually acquire, generate, use and store information of all kinds in the course of carrying out its functions. Examples can include data held in customs processing systems (such as ASYCUDA), data received from Port processing systems (such as CTMS) or information received from other regulatory authorities. Below is an example of what information should be considered as part of the information pool:

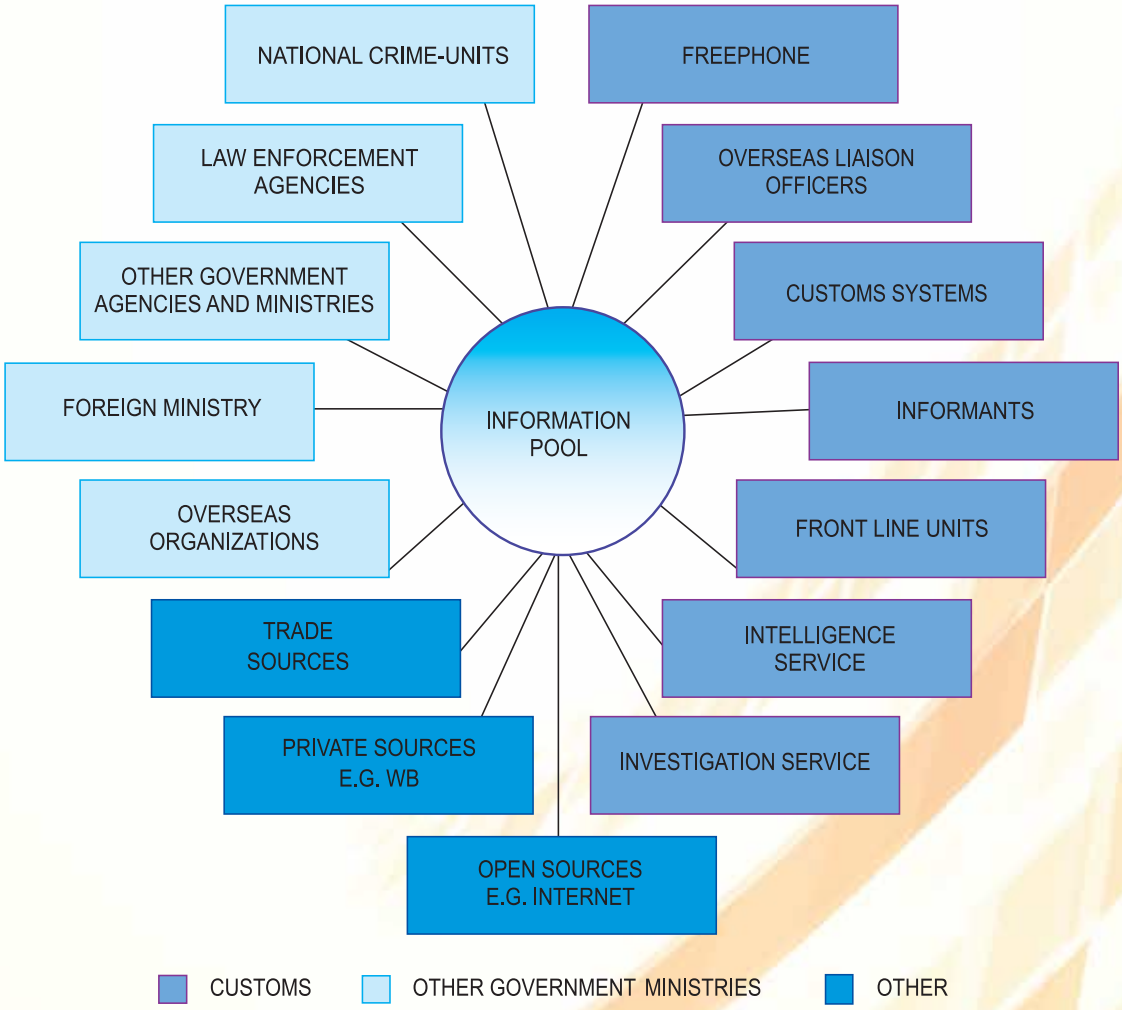

The CIID understands the importance of expanding its access to information held by key-stakeholders both nationally and internationally. Consequently, the CIID will consider commencing the process of drafting data-sharing agreements with relevant government and private sector stakeholders. Access to such data will give the NBR a tactical advantage in its mission to identify and tackle cross-border criminality.

This year, the CIID will also consider launching national 'Customs Hotline', which will allow the trade and public to report information to customs in a confidential and secure way. The system will allow information to be reported by telephone, email and even by SMS text message. Once received the information will be assessed and acted upon in a timely and professional manner.

Centralized Recording and Dissemination of Intelligence

It is vital for any customs administration to tightly restrict and monitor the collation, recording, storage and dissemination of any intelligence material that it generates or handles. A fundamental requirement for the CIID to become a full and trusted member of the intelligence community is for partner agencies to have complete confidence in how it deals with sensitive information. The deliberate or accidental leaking of sensitive information to unauthorized persons can lead to severe consequences, such as partner agencies losing confidence and refusing to co-operate with customs in the future. In the most extreme of circumstances, it could even result in the killing of a source (that provided the information that was subsequently leaked).

The CIID is actively considering plans to develop a secure, centralized, database for the recording, grading, classification and dissemination of intelligence material.

Access to this system, which will possibly be called the Customs Intelligence Database (CID), would be amid available to relevant and approved NBR officials.

To ensure a standardized and transparent approach, the CID system will most likely utilize the internationally recognized 5x5x5 Intelligence Model as a basis for the way in which it operates. Further information on this model is available below.

5x5x5 Intelligence Model

The CIID will consider utilizing the internationally recognized 5x5x5 Intelligence Model as the basis for the way in which it evaluates, grades, handles and disseminates intelligence. Adoption of this standardized approach will help to ensure that all information is properly analyzed, evaluated and handled so as to maximize its potential operational effectiveness. The term '5x5x5' refers to the matrix that is used to assess the three key elements of the grading and handling process, as follows:

5 = The assessed reliability of the source providing the information.
x
5 = The assessed accuracy of the content of the information provided.
x
5 = Who the information can be disseminated to (i.e. who can it be shared with).

This type of tiered grading system is commonly used by different law enforcement agencies all over the World, including Customs, Police, Military and the Security Services. Some administrations (such as the Belgian Police and some Customs administrations) have opted to utilize a simplified 4x4 system, whereas NATO has expanded it to 6x6 (known as the Admiralty or NATO System).

Although 5x5x5 Reporting Forms will initially be completed by CIID officers, overtime, they will be made available to all customs staff. This will allow any staff member within customs to report any information in a structured, standardized and transparent way. Furthermore, it will allow the submitting officer to provide his or her own assessment on the reliability of the source of the information (the first 5 in the matrix), and also the reliability of the content of the information given (the second 5 in the matrix).

If this model is adopted, the CIID will continue to be responsible for deciding who the intelligence can be subsequently disseminated to (the third 5 in the matrix). This will ensure a centralized approach to the dissemination of all sensitive information by Bangladesh Customs.

The primary purpose of the 5x5x5 record is to help customs to identify and tackle risk by identifying:

- WHO is thought to be involved? (I.e. which person or company etc.)
- WHAT is thought to be happening? (i.e. smuggling, tax evasion etc.)
- WHERE is it taking place? (I.e. which port or transport route etc.)
- WHEN is it taking place? (I.e. dates, times - is it still happening etc.)
- HOW is it being carried out? (I.e. goods hidden in vehicles etc.)

STEP1: SOURCE EVALUATION

The customs officer that submits the 5x5x5 Reporting Form will be responsible for providing his or her assessment of the reliability of the **source** of the information from the five options below:

SOURCE EVALUATION	A Always reliable	B Mostly reliable	C Sometimes reliable	D Unreliable	E Untested source

Some examples of what may fall within these evaluations are listed below:

A = Always Reliable

There is no doubt of the authenticity, trustworthiness and competence of the source. This grading is normally used only for technical sources such as recording equipment (CCTV, Communications equipment e.g. mobile phones, computers, video recording equipment) and DNA / Fingerprint evidence. This grading should never be utilized if the source of the information was a person due to the possibility of human error.

Example: A member of the public records on her mobile phone, clear evidence of Mr. X removing large quantities of cash from the rear of his vehicle. (Clearly seen, little possibility of misinterpretation)

B = Mostly Reliable

Information received from this source has, in the past, been found reliable in the majority of instances. This could be the majority of law enforcement and other prosecuting agencies.

Example: Information from Customs or Police officers with a previous track record of providing information found to be accurate in the past.

C = Sometimes Reliable

Some of the information received from this source has proven both reliable and unreliable in the past. Any information with this grading should generally not be acted upon without corroboration.

Example: This grading may apply to information received from the media or product of a technical deployment where the quality of the product is poor.

D = Unreliable

Information under this grading refers to individuals who have provided information in the past which has routinely proven unreliable. Any information with this grading should not be acted upon without corroboration.

Example: Information received from members of the public with a malicious motive, e.g., personal disputes.

E = Untested Source
This grading refers to information received from a source that has not previously provided information to the person recording. The information may not be necessarily unreliable but should be treated with caution.

Example: This grading will generally apply to members of the public providing information anonymously or for the first time.

STEP 2: INFORMATION / INTELLIGENCE EVALUATION
The submitting officer will be responsible for providing his or her assessment of the reliability of the content of the information or intelligence received, from the five options below:

INFORMATION/ INTELLIGENCE EVALUATION	1 Konwn to be true without reservation.	2 Konwn personally to source but not to the person reporting	3 Not known personally to the source, but corroborated	4 Cannto be judged	5 Suspected to be false

Some examples of what may fall within these evaluations are listed below:

1 = Known to be true without reservation
This could be information generated from a technical deployment or an event which was witnessed by a law enforcement officer. Information received from technical deployments should be treated with caution as although the information may have been recorded accurately, the content could be misinterpreted. This grade refers to first-hand information.

Example: A Customs officer personally witnessed the incident.

2 = Known personally to source but not to the person reporting
Information under this grading is believed to be true by the source although is not personally known by the person recording the information. The source has first-hand knowledge of the information. Care must be taken to differentiate between what a source knows to be a fact and what a source reports they have heard or been told.

Example: A source gives information that Mr. X is in possession of a large quantity of illegal drugs. They know this because they were present when that person took possession of the drugs and personally saw where Mr. X hid them.

3 = Not known personally to the source, but corroborated
Information given may have been received by a source from a third party and its reliability has been corroborated by other information, e.g. CCTV or other information. It is the responsibility of the person recording the information to seek corroboration for this grading to be given.

Example: A source has been told that Mr. X has been seen driving a car, registration ABC 123 (the source does not know this information for themselves). Enquiries with the Department of Motor Vehicles show that Mr. X is the registered owner of car registration ABC 123.

4 = Cannot be judged
The reliability of this information cannot be judged or corroborated. Information with this grading should be treated with caution.

Example: A source provides information that Mr. X may be in possession of a large quantity of illegally imported gold bars as they have heard a number of others mention this in conversation. There is no other information to corroborate this.

5 = Suspected to be false
Information with this grading should be treated with extreme caution. This information should be corroborated by a reliable source before any action is taken. Any person applying this grade should justify within the text section of the report why it is appropriate to use this grading.

Example: Malicious caller who provides exaggerated information against others in order to deflect attention from themselves

STEP 3: HANDLING CODE

Handling codes are designed to assist an intelligence unit in their risk based decision of whether to disseminate intelligence or not and, if so, to whom. The five different codes (which form the third part of the 5x5x5 matrix) provide clarity for communicating the piece of intelligence to others. By recording this code on the 5x5x5 Reporting Form, it clearly outlines the conditions which should be met when disseminating that specific piece of intelligence to other parties.

Once the 5x5x5 reporting Form has been received it will be further assessed to identify the appropriate Handling Code. These five codes (shown in the diagram below), clearly determine who the information can be disseminated to:

HANDLING CODE	1	2	3	4	5
To be completed by the evaluator on receipt and prior to entry onto the intelligence system	Permits Dissemination within Customs and to other Law enforcement Agencies in Bangladesh (as Specified)	Permits dissemination to Bangladesh non prosecution parties (as specified)	Permits dissemination to foreign law enforcement agencies (as specified)	Permits dissemination within bangladesh Customs only. Reasons and internal recipient (as specified)	Permits dissemination, but receiving agency to observe conditions (as specified)

Some examples of what may fall within these evaluations are listed below:

1 = Permits dissemination within Customs and to other law enforcement agencies in Bangladesh (as specified)
This handling code permits intelligence to be disseminated within the NBR and other law enforcement agencies in Bangladesh, such as the Police. Each relevant agency must be specified.

Example: Information that Mr. X, a convicted drug importer, is currently using a red Toyota Corolla ABC 123 to transport drugs between Chittagong and Dhaka. Handling Code '1' applies to disseminate across the Customs service and also Police forces within Dhaka and Chittagong.

2 = Permits dissemination to Bangladesh non prosecuting parties (as specified)
This handling code permits intelligence to be disseminated to non-prose cutting parties in Bangladesh. This may include banking institutions or manufacturing companies.

Example: Information received that Mr X. is importing counterfeit Dell laptops from China. Handling Code '2' applies, the information is appropriate for dissemination to the applicable commercial organization as this may constitute a breach of Intellectual Property Rights IPR). The commercial organization may have information to assist NBR is tackling this offence.

3 = Permits dissemination to foreign law enforcement agencies (as specified)
This handling code permits intelligence to be disseminated to non-Bangladeshi foreign law enforcement agencies.

Example: Information received that Mr. X is exporting large quantities of cash into Kuala Lumpur through their international airport. This money is being used to purchase gold which is subsequently smuggled into Bangladesh through Dhaka International airport. Handling Code '3' applies so Kualalumpur Customs can take appropriate action in identifying and targeting Mr. X.

4 = Permits dissemination within Bangladesh Customs only. Reasons and internal recipient (as specified)

This handling code restricts the dissemination of the intelligence to Bangladesh Customs. It provides for the need to retain particularly sensitive information within a tight community with a specific need to know. It is likely to be of use in restricting access to material that is relevant to current sensitive operations. This may include restricting dissemination to a particular operational team within Bangladesh Customs.

Example: Information received from a Confidential Human Intelligence Source (informant) that Mr. X is planning on importing drugs into Dhaka International Airport on 13/06/2016. This source is the only person that has been made aware of this information. Handling Code '4' applies as dissemination outside of the operational team that is working with these CHIS is likely to seriously compromise the source and could lead to their identification.

5 = Permits dissemination, but receiving agency to observe conditions (as specified)
Any information marked with this handling code requires special attention. Application of this code means the originator has applied specific handling instructions in respect of this information.

Example: Information from a CHIS relating to potential serious harm to a child is deemed suitable for dissemination to the Police. Handling Code '5' applies due to the sensitive nature of the information, and the Police department receiving it may only use this information in a confidential case conference rather than at an open forum.

In most cases, 'Detailed Handling Instructions' will also be included on the 5x5x5 Reporting Form that specify which person or agency the information can be shared with. As well as determining the appropriate Handling Code, the 5x5x5 record would be further assessed for:

- Any intelligence value;
- Consideration for further research and development;
- Dissemination to relevant partners; and
- Entry onto the Customs Intelligence Database (CID)

FINAL STEP: PROTECTIVE MARKING

The 5x5x5 form also allows the content of the report to be marked with a handling classification. The CIID will consider adopting the same a that is utilized by most developed law enforcement agencies across the World, as follows:

PROTECTIVE MARKING:	**RESTRICTED** ☐	**CONFIDENTIAL** ☐	**SECRET** ☐	**TOP SECRET** ☐

The PMS classification will determine how the specific record is stored and who can have access to see it in the future.

Example: Proposed 5X5X5 Reporting Template for Bangladesh Customs

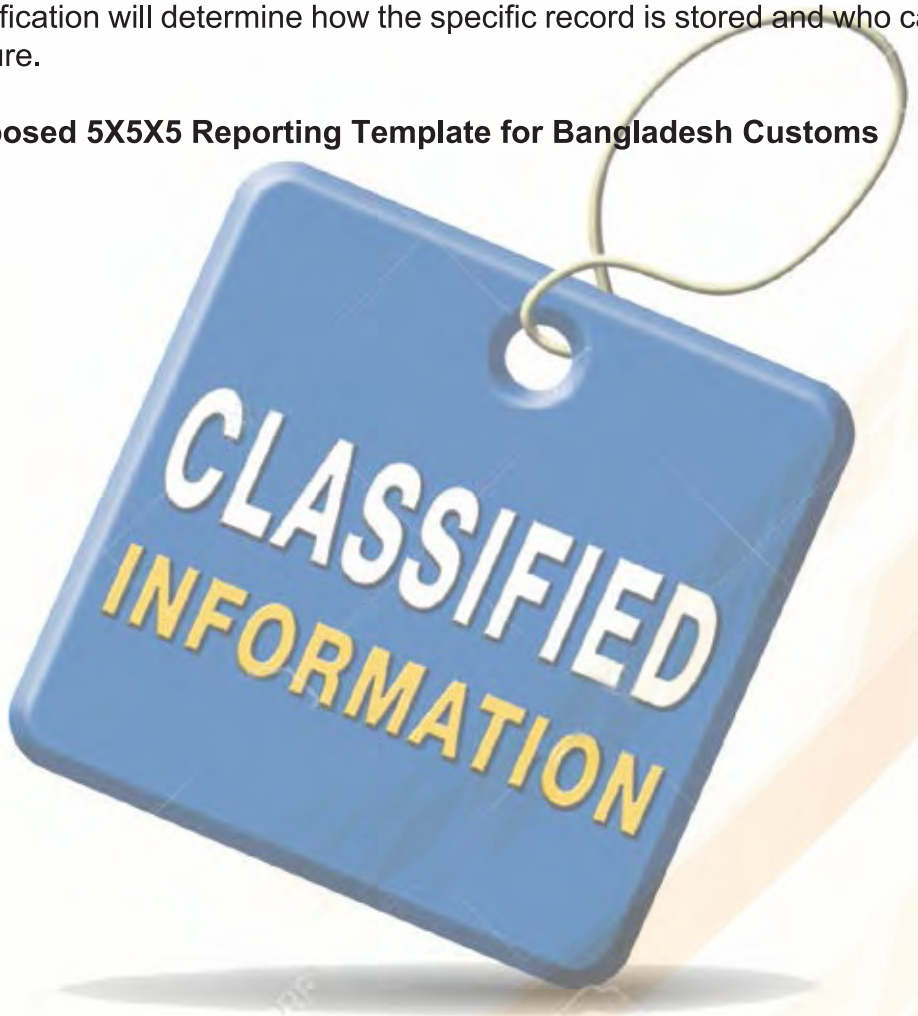

5x5x5 INTELLIGENCE REPORT			
LOCATION AND OFFICER NAME		DATE/TIME OF REPORT	
SOURCE OF INFORMATION		OTHER SOURCE	
INTELLIGENCE SOURCE REF.		REPORT URN	

SOURCE AND INFORMATION/INTELLIGENCE EVALUATION TO BE COMPLETED BY SUBMITTING OFFICER					
SOURCE EVALUATION	**A** Always reliable	**B** Mostly reliable	**C** Sometimes reliable	**D** Unreliable	**E** Untested source
INFORMATION/INTELLIGENCE EVALUATION	**1** Known to be true without reservation.	**2** Known personally to source but not to the person reporting	**3** Not known personally to the source, but corroborated	**4** Cannot be judged	**5** Suspected to be false

REPORT					
SURNAME:		FIRST NAME(S)		DATE OF BIRTH:	
HOME ADDRESS:				GENDER:	
BUSINES NAME:		BUSINESS ADDRESS:			

TEXT:	S	I	H

INTELLIGENCE UNIT ONLY					
HANDLING CODE To be completed by the evaluator on receipt and prior to entry onto the intelligence system	**1** Permits dissemination within Customs and to other law enforcement agencies in Bangladesh (as specified)	**2** Permits dissemination to Bangladesh non prosecuting parties (as specified)	**3** Permits dissemination to foreign law enforcement agencies (as specified)	**4** Permits dissemination within Bangladesh Customs only. Reasons and internal recipient (as specified)	**5** Permits dissemination, but receiving agency to observe conditions (as specified)

REVIEWED BY:		DATE OF REVIEW:	
DISSEMINATION APPROVED:	YES ☐ NO ☐	AUTHORISED BY:	
DISSEMINATED TO:			
INPUT ONTO CUSTOMS INTELLIGENCE DATABASE (CID):		YES ☐ NO ☐	

PROTECTIVE MARKING:	RESTRICTED ☐	CONFIDENTIAL ☐	SECRET ☐	TOP SECRET ☐

- **Dr. Mohammad Abu Yusuf and Mark Hamill** - USAID BTFA

Dr. Mohammad Abu Yusuf is a Customs Specialist, USAID BTFA and a member of BCS (Customs and VAT) Association
Mark Hamill is team leader, Trade Intelligence, USAID BTFA

(The views expressed herein are the sole responsibility of IBI International and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.)

Enforcement of Intellectual Property Rights at the Border: Bangladesh Perspective

-Muhammad Mubinul Kabir

Abstract

With globalization, the world economy witnessed significant structural changes in the area of intellectual property. Intellectual property (IP) refers to the creation of mind: inventions, literary and artistic works and symbols, name, and images used in commerce. Intellectual property rights (IPRs) have been widely recognized as a growth enhancing factor for the global economies as a whole. IPRs regime can influence the growth process through domestic and external sector of an economy. In Bangladesh, although IPR related legislation dates back to the late nineteenth century, its effective administration has always been in question. After the creation of World Trade Organization (WTO), IPR related legislation has been undergoing radical change in line with such international agreements as Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). At the same time, enforcement of the IP laws at the border has been given significant priority. Given this backdrop, this paper studies the Bangladesh aspects of intellectual property rights with special reference to enforcement at the border, and, makes recommendations for further improvement and strengthening of the border enforcement, especially, by customs.

1. Introduction

1.1 The term 'intellectual property' (IP, Hereinafter) refers broadly to the creations of the human mind. Intellectual property rights (IPR(s), Hereinafter) protect the interests of creators by giving them property rights over their creations. The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (1967) does not give any definition of IP, rather it mentions the following scope protected by IPR:

i. *Literary, scientific and artistic works;*
ii. *Performances of performing artists, phonograms and broadcasts;*
iii. *Inventions in all fields of human endeavor;*
iv. *Scientific discoveries;*
v. *Industrial designs;*
vi. *Trademarks, service marks and commercial names and designations;*
vii. *Protection against unfair competition; and*
viii. *All other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*

1.2 Under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS, hereinafter) the term 'intellectual property' refers to all categories of IP that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II of the said agreement which are as follows:

- *Section 1: copyright and related right;*
- *Section 2: trademarks;*
- *Section 3: geographical indication;*
- *Section 4: industrial designs;*
- *Section 5: patents;*
- Section 6: layout-designs (topographies) of integrated circuits;
- Section 7: Protection of undisclosed information.

1.3 The IPRs protect inventions, literary and artistic works, industrial designs, commercial symbols, images and nomenclature from piracy. The IPR in totality stipulates the protection of intangible assets, that is, IP. IP is intangible property because it cannot be felt or touched like physical property. Due to lack of secured IPR system and awareness about it, assets in the developing countries cannot be turned into productive capital, traded outside, used as collateral for a loan, or share against investment. Therefore, it result in lower technology growth, remains at high risk with no collateral, higher costs of borrowing, and face greater costs of financial intermediation (De Soto, 2000). The most important aspect of IPRs is that it brings technical know show, competitiveness to the local firms in the recipient countries, which can be used to expand their business opportunities. World Bank (2002, 2003, and 2005) as well as World Intellectual Property Organization and UNCTAD assert that protection of IPRs can help to generate revenues, improve balance of payment (BOP), provide access to international markets, create confidence to investors, increase employment opportunities, improve productivity and provide technical know show to the developing countries. Moreover, the importance of IPRs especially Geographical Indication (GI) and Traditional Knowledge can help in poverty alleviation.

1.4 The laws, relating to copyright, patent and design, trademarks etc. and used as tools for enforcement, are known as the intellectual property laws. IP law is one of the most important branches of law which protects the expression of ideas and thoughts of commercial and artistic significance. When we talk about the violation of IPR, we, actually, talk about the violation of any of the IP laws. It is of increasing importance in the contemporary world because of high demand of appropriate knowledge, information and technical know-how in industry and commerce. Adequate protection of the expression of ideas and knowledge is, therefore, of more and more importance as an element in the enabling framework needed to attract the business community to invest in a particular economy, and obviously they will never be interested to disseminate their ideas and knowledge of commercial significance in the economy where they are likely to be pirated with impunity.

1.5 Bangladesh is a signatory to World Trade Organization (WTO, hereinafter) agreement and, as such, TRIPS. As a developing country, Bangladesh has been given the privilege to implement the TRIPS agreement until 2013 for non-pharmaceutical products and 2016 for pharmaceutical products. Although there is a grace period, IP related legislation in Bangladesh is going through necessary overhauling in line with the international agreements despite the fact that enforcement process is not up to the mark.

2. Types of IP

2.1 Intellectual property is usually divided into two branches, namely industrial property and copyright.

2.1.1 Copyright: IPRs related to artistic creations like poems, novels, music, paintings and cinematographic works are called copyright. In most European languages other than English, copyright is known as author's rights. The expression copyright refers to the main act which, in respect of literary and artistic creations, may be made only by the author or with his authorization (Bentley, 2001). That act is the making of copies of the literary or artistic work, such as a book, a painting, a sculpture, a photograph or a motion picture. The second expression, author's rights refers to the person who is the creator of the artistic work, its author, thus underlining the fact, recognized in most laws, that the author has certain specific rights in his creation, such as the right to prevent a distorted reproduction, which only he can exercise, whereas other rights, such as the right to make copies, can be exercised by other persons for example, a publisher who has obtained a license to this effect from the author (Bentley, 2001).

2.1.2 Industrial Property: According to Article 1(3) of Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883: "Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour."Industrial property takes a range of forms which include patents to protect inventions and industrial designs, which are aesthetic creations determining the appearance of industrial products. Industrial property also covers trademarks, service marks, layout designs of integrated circuits, commercial names and designations, as well as geographical indications, and protection against unfair competition. In some of these, the aspect of intellectual creation, although existent, is less clearly defined. What counts here is that the object of industrial property typically consists of signs transmitting information, in particular to consumers, as regards products and services offered on the market. Protection is directed against unauthorized use of such signs likely to mislead consumers, and against misleading practices in general.

2.2 The government in any country is responsible for protecting the rights by adopting measures and policies, compatible with TRIPS agreement of the WTO. Patents have a fixed term and are territorial in nature. An inventor has to apply for a patent in each country where he wants to have his invention protected. The countries could have their own terms and conditions and application

process to adhere to the rules of TRIPS. Like patents, trademark protection is generally territorial in nature, and action needs to be taken in each country where protection is sought. Trademark rights are usually acquired by registration, although in common law countries, rights can also be obtained through use. Although, rights in registered marks are granted for a fixed term, the registration can be renewed indefinitely or for further terms.

3. IPR Enforcement in Bangladesh

3.1 Legal framework

3.1.1 Bangladesh's judicial and legal system is largely modeled on the Indo-Mughal and British legal systems. The judicial structure consists of lower courts and a Supreme Court, both of which hear civil and criminal cases. The lower courts comprise magistrates' courts and session courts. The Supreme Court also has two divisions: a High Court Division, which hears original cases and reviews lower court decisions, and an Appellate Division, which hears appeals from the High Court. Bangladesh's IP laws can also trace back their origin to the days when the country was part of British India, although these laws have been modified several times to meet the demands of international practices and obligations.

3.1.2 IP rights in Bangladesh are handled by two separate government ministries:

i. Industrial matters are administered by the Department of Patents, Designs and Trade marks, a subordinate office of the Ministry of Industries; and

ii. Copyright and related rights are the responsibility of the Copyright Office, a subordinate office of the Ministry of Cultural Affairs.

The Department of Patents, Designs and Trademarks is a quasi-judicial organization, with the department's registrar acting as a tribunal. Any appeal against the registrar's decisions must be made to the High Court.

3.1.3 The Constitution of Bangladesh has guaranteed the freedom of thought and conscience (art. 39.1) and rights to property (art.42.1) which includes intellectual property (art.152). The pertinent statutes in Bangladesh relating to IP matters are:

- The Patents and Designs Act, 1911 (II/1911);
- The Trademarks Act, 2009;
- The Trademarks Rules, 1963;
- The Copyright Act, 2000;
- The Copyright Rules, 1967, as modified in1983;
- The Bangladesh Penal Code, 1860;
- The Code of Civil Procedure, 1980;
- The Customs Act, 1969; and
- The Consumer Rights Protection Act, 2009.

3.1.4 Bangladesh is also a signatory to the following international agreements, and many provisions of these agreements have already been incorporated in the statutes mentioned in para 2.1.3:

- *The World Intellectual Property Organization Convention, since May1985;*
- *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, since March 1991;*
- *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, since May1999; and*
- *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), since January 1995.*

It is noteworthy that as a developing country, Bangladesh has until 2033 to fully implement the provisions of TRIPS agreement for pharmaceutical provisions.

3.2 Enforcement measures

3.2.1 In Bangladesh, all trans-border trading activities are regulated by the Ministry of Commerce under the Imports and Exports (Control) Act, 1950 and Import and Export Policy Orders made thereunder. Further, transactions and trade related to foreign exchange are governed by the Foreign Exchange Regulation Act, 1947. In addition, Section 15 of the Customs Act, 1969 prohibits the import of goods, whether by air, land or sea, that fall within the following categories:

- goods marketed under a counterfeit trademark or false trade description;
- goods made or produced outside Bangladesh and intended for sale under a design in which copyright exists under the Patents and Designs Act in respect of the class to which the goods belong or any fraudulent or obvious imitation of such design without a license or the rights holder's written consent; and
- goods made or produced outside Bangladesh and marketed under any name or trade mark being or purporting to be the name or trademark of any manufacturer, dealer or trader in Bangladesh.

3.2.2 As per Section 17 of the Customs Act, 1969, "if any goods bearing registered trademarks are imported into or attempted to be exported out of Bangladesh in violation of the provision of Section

15 or of a notification under Section 16, such goods shall, without prejudice to any other penalty to which the offender may be liable under this act or another law, be liable to be detained and confiscated and shall be disposed of in such a manner as may be prescribed."There is no provision for the recordal of trademarks with Customs. However, upon receiving a complaint from a rights holder, Customs may take steps against any person or entity that imports goods in violation of Sections 15 and 16 of the Customs Act. Moreover, a rights holder may approach the High Court to obtain an order directing Customs to detain and/or seize the counterfeit goods.

3.2.3 The Customs Act, 1969 does not stipulate any criminal prosecution for violation of section 15 of the said act, rather it provides for administrative and quasi-judicial actions. The penal provision for violation of section 15 is stipulated in Section 156(1)(9(i)) which reads as follows:
'such goods shall be liable to confiscation; and any person concerned in the offence shall also be liable to a penalty not exceeding two times the value of the goods.'
This provision of the Customs Act simply tells that appropriate adjudicating officer is competent enough to dispose of the IP matters and no reference to judicial proceedings is needed. If the right holder wants a criminal prosecution, he has to file a separate petition with the appropriate court.

3.2.4 On the other hand, Penal Code stipulates punishment for following offences considering them as criminal ones:

- using a false trademark so as to mislead consumers about the origin of the goods; and
- counterfeiting a trademark used by another person.

The punishment for using a false trademark is imprisonment for up to one year or a fine, or both. The punishment for counterfeiting is imprisonment for up to two years or a fine, or both. The courts also have the power to set the prison term and the amount of any fine. In addition, the Penal Code identifies a number of activities as criminal offences and sets out various enforcement measures available to rights holders. Two such offences, and their punishments, are as follows:

- making or possessing any instrument for the purpose of counterfeiting a trademark – the punishment for this offence is imprisonment for up to three years or a fine, or both; and
- selling, exposing or possessing for sale or any purpose of trade or manufacture any goods

bearing a counterfeit mark –the punishment for this offence is imprisonment for up to one year or a fine, or both.

3.2.5 In the case of a complaint of infringement concerning any imported or exported goods by a right holder, customs detains the goods temporarily and go for identification procedure. If there is an apparent infringement, customs go for adjudication procedure, which includes serving of show cause notice on the importer and taking of personal hearing, and if infringement is proven customs takes punitive actions as provided in Section 156(1)(9(i)) of the Customs Act, 1969. In cases of counterfeiting, a rights holder may file a criminal complaint with the police, which then investigate. If the complaint is proved, the case then goes to trial before a court. In addition, police officials may launch raids against counterfeit and pirated goods, and may take legal action. All criminal proceedings begin in the magistrate's court. All criminal cases relating or false trademarks or counterfeiting are tried by a magistrates court (first or second-class, or a metropolitan magistrate in an urban area). Any appeal against the magistrate's order must be made to a district magistrate or sessions judge.

3.2.6 Remedial measures available in IP violation include the following:

- Raids on the premises (including the warehouses) where the counterfeit goods are stored;
- Seizure of the goods;
- Destruction of the counterfeit goods; and/or
- Imposition of penalties on the infringer

3.2.7 As against the provision of the Customs Act, 1969 mentioned earlier which provides for the administrative and quasi-judicial measures for trademark infringements, the Trademarks Act establishes that infringement suits must be instituted before the appropriate district court. In the case of infringement suits, the trademark must be registered in Bangladesh as per Section 24(1) of the act. The act also provides for passing off actions for unregistered trademarks before the Dhaka District Court. Although civil remedies are available for both registered and unregistered trademarks, it can be extremely difficult to prove passing off actions and obtain relief for unregistered trademarks. In the case of civil proceedings, trademark infringement suits can be instituted only at a district court or higher. However, passing-off proceedings can be instituted before an assistant judge or joint district judge. The Code of Civil Procedure establishes that rights holders may file suits for permanent injunctions before the Dhaka District Court. If the infringement is proved, a suit for damages may then be filed separately.

3.2.8 The administrative authorities have no direct jurisdiction over counterfeiters and the seizure and/or confiscation of the infringing goods in question other than customs. The law enforcing agencies such as the customs, police, the Bangladesh Rifles and the Rapid Action Battalion takes cognizance of any matter relating to counterfeiting only after being directed to by the Chief Judicial Magistrate's Court, since the imitation or use of false trademarks is a non-cognizable and bailable offence under Sections 482, 483, 485 and 486 of the Code of Criminal Procedure. In addition to a civil infringement suit, rights holders may file an application for a temporary injunction under Order 39, Rules1 and 2 of the Code of Civil Procedure. If it is proved that there is a prima facie arguable case and that the balance of inconvenience is in the rights holder's favor, then the court may grant a temporary or interlocutory injunction against the counterfeiter when the suit is filed. It can take up to three to four years for a case to be finally decided.

3.2.9 The following remedies are available by way of civil action:

- Temporary injunction;
- Permanent injunction and attachment order with a declaration that the goods are counter feit; and
- Claim for damages.

4. Problems of Enforcement

4.1 Part III of the TRIPS agreement stipulates in detail about the enforcement of IPR. Section 4 of Part III provides detail guideline for border related measures. In Bangladesh, so far no study has been conducted to understand how far TRIPs is favorable to our national interest and to estimate the cost of implementation of an IPR regime in Bangladesh i.e. the establishment of new institutions, administrative and enforcement costs etc. In a study of UNCTAD (1996) it was estimated that Bangladesh may need approximately US$250,000 one time plus US$ 1.1 million annually for reform

and capacity building on intellectual property law in the context of the TRIPS agreement (Mengistie,
2003). Still, Bangladesh has made some remarkable improvements in the IPR area despite no
apparent tangible benefits. In spite of the improvements in the related laws, the enforcement is somewhat weak in Bangladesh because of some historical and socio-politico-economic problems which are discussed below.

4.2 IP laws are very technical in nature and sometimes unfamiliar even to the specialized professionals, business executives and industrial management let alone field level customs officers. Moreover, probable IP owners are not fully aware as to their rights and obligations and such ignorance lead many of them not to take up adequate measures to protect their IP rights which is a serious impediment to the effective enforcement of IP laws.

4.3 Under the existing IP laws, registration is not compulsory, rather it is optional. As the creators are not aware of the registration procedures and also, if the IP product is not registered, the competent authority cannot officially take any action for the violation or infringement of IP rights under the existing laws, or cannot request the law enforcement agency to prosecute under the Penal Code, 1860.

4.4 There is also some lack of coordination between the IP law enforcement agencies. The copy right law is administered by Registrar of Copy right office under the Ministry of Cultural Affairs, while Trademarks/Patent and Designs laws are administered by the Registrar of Trademarks, Patent and Designs under the Ministry of Industries. Both the offices are not conducive to properly execute the IP laws in the modern way as they work manually and the records are usually kept in the traditional way. Administrative reforms, automation and computerization of these offices are urgently needed.

4.5 Absence of specialized enforcement units of customs to report and investigate alleged infringement of IP rights is another deficiency in the existing system. Investigation of IP infringement is conducted by the regular officers who are always over burdened with the routine work. Moreover, there is a serious lack of technical knowledge and expertise on the part of the officers to investigate the offences under IP laws.

4.6 The current legislation does not provide for systematic suspension procedure and indemnification of

the importer and of the owner of the goods, nor does it provide for any compensation for the same. So much so, detention of the imported or exported goods for an indefinite time period sometimes goes against natural justice and customs loses the case when any petition is filed by the importer before the High Court for violation of his fundamental rights of releasing the goods.

5. Recommendations for improvement and strengthening of IPR Enforcement

5.1 The government needs to undertake several measures to strengthen Bangladesh's IP system. These include measures to strengthen the IP offices, customs and further revisions to existing IP laws. In general, the following must be addressed:

a) Raising awareness of the importance of intellectual property among the business community and the general public – this could be done through campaigns in newspapers and electronic media, as well as through regular workshops, seminars and study tours for concerned stakeholders;

b) Carrying out regular training for officials at the relevant departments to equip them to tackle such issues – such projects might follow the template set by recent government collaboration with the European Union over IP training;

c) Introducing a formal customs recordation procedure for rights holders;

d) Empowering the administrative authorities to initiate actions against infringers on receiving a complaint from the rights holder;

e) Establishment of a specialized IPR centers in the National Board of Revenue, the head quarters of Bangladesh customs, and field customs offices and ensuring that all the offices follow uniform procedure;

f) IP laws should be further amended incorporating the relevant provisions of TRIPS and other IP conventions/agreements so that rights of the right holders or the importers are ensured;

g) Enforcement agencies should be given sufficient budgetary and logistic provisions (which include integrated automation of the enforcing agencies);

h) A separate enforcement unit may be set up combining IP office, police and customs authorities and can be trained specially for IPRs.

i) The judges and lawyers should also be trained properly so that IP matters are properly handled;

j) Like Japan, a separate IP High Court, and some lower IP courts can be set up for quicker disposal of the cases.

6. Conclusion

6.1 Neo-classical growth theory emphasizes the role of IPRs in economic growth process through different channels like international trade, foreign direct investment, licensing as well as research and development. Through different channels IPRs can promote economic growth in the recipient countries. The most important is technology transfer and its positive spillovers. Therefore, IPRs exert economic growth, which requires increase in productivity, increase in productivity requires increase in technological innovation and it requires the efficient protection of IPRs (Rapp and Rozek, 1990). The IPRs can influence the average growth more effectively in the open economies as compared to the close one (Gould and Gruben, 1996). Thompson and Rushing (1999) found that IPRs have a positive and significant impact for the developed countries.

6.2 Bangladesh is a signatory of WTO, which means that it is committed to comply with the TRIPS agreement despite the fact that a substantial amount of cost is associated with the process of implementation with, may be, no apparent tangible benefits. Therefore, it cannot ignore this agreement or otherwise it would be isolated from the world. But the pace of implementation is now important that one should make necessary arrangements to that end, otherwise Bangladesh may face repercussions in term of access to the international markets, withdrawal of Generalized System of Preferences (GSP) and foreign investor confidence. Similarly, the problem of counterfeit products, which cause huge annual losses to industries and reduced tax to GDP ratio due to lack of documentation, can be addressed through adequate IPR protection measures. In order for so doing, there is no choice but to improve and strengthen border enforcement through customs and other agencies. To that end, appropriate strategy and implementation process can be undertaken according to the recommendations made in this paper.

References

Bentley, Lionel (2001). Intellectual Property, Oxford University Press

De Soto, Hernando (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books.

Gould, D.M., & Gruben, W.C. (1996). The Role of intellectual property rights in economic growth. Journal of Development Economics. 48 (2), 323-350.

Mengistie, Getachew (2003). The Impacts of the International Patent System on Developing Countries: A Study. WIPO, Switzerland

Rapp, Richard T and Rozek, Richard P (1990). Benefits and Costs of Intellectual Property Protection in Developing Countries. Journal of World Trade, Vol. 24, No.5, pp 75-102.

Thompson, Mark A. and Francis W. Rushing. (1999). An Empirical Analysis of the Impact of Patent Protection on Economic Growth: An Extension. Journal of Economic Development 24, 1.

- Muhammad Mubinul Kabir, Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Chittagong

সোনার ডিম পাড়া মাটির মানুষ ও এক তরুণ গোয়েন্দা

- মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী

মাটির মানুষ সোনার ডিম পেড়েছে। একটি দুটি নয়, এক ডজন! ষোল ঘণ্টার এক অবিরাম চেষ্টা। সাফল্য ধরা দিয়েও যেন অধরা। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি একীভূত হয় হয় করেও দুরতিক্রম্য হয়ে উঠছিল। এই আশা জাগেতো এই নিরাশা। সে এক অম্ল মধুর কসরতের রুদ্ধশ্বাস উপাখ্যান। তারুণ্য ও প্রতিশ্রুতির সম্মিলনে অর্জিত এক কষ্টলব্ধ বিজয়-কাহিনী। এই উপাখ্যান যার হাত ধরে রচিত হয় তিনি একজন তরুণ কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ঘটনাস্থল ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

কাজের স্পৃহার সাথে সৃষ্টিশীল অনুসন্ধিৎসার প্রয়োগ ঘটিয়ে সাফল্য আনলেন। অন্য নবীনদের শেখালেন। অনেক প্রবীণের চোখ খুলে দিলেন। তিনি মোহাম্মাদ জাকারিয়া। বিসিএস ৩১ ব্যাচের সহকারী কমিশনার। শুল্ক গোয়েন্দার শিফট ইনচার্জ। বিমানবন্দরে কাজ করছেন গত ছয় মাস ধরে। এর মধ্যে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর বিমানবন্দরে চোরাচালান দমনে অর্জন করেছে সাফল্য যার অন্যতম অংশীদার এই নবীন কর্মকর্তা।

গতানুগতিক কাজের বাইরে দেশ ও বিভাগের জন্য ব্যতিক্রমী কিছু করার ইচ্ছে তার প্রথম থেকেই। সেটা যেন হয় সৃষ্টিশীল ও দেশের জন অবদানমুখী। এমন একজোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখ স্বপ্ন দেখে যায়। এমন কিছু করবেন যেটা অন্য সবার মতো হবে না। সেটা এবারই। এই বিমানবন্দরেই করতে হবে। ছয় মাস ধরে নীরবে নিরবধি খুঁজে গেছেন। স্বপ্ন যেন ধরা দিয়েও দেয় না। 'পাই পাচ্ছি' করেও হারিয়েছেন। বার বার বিমুখ হয়েছেন, ক্লান্তি কখনো ভর করেছে। স্বপ্নাচারী তারুণ্য হাল ছাড়ে না।

'গোয়েন্দার চোখ'
সন্দেহের চোখ
সন্ধানের চোখ
যতো বেশি বিমুখ
ততো বেশি উন্মুখ'

ছ'মাসে অসংখ্যবার বিমুখ হয়েছেন জাকারিয়াও। সাফল্যও কখনো পেয়েছেন। মন ভরার মতো নয়। স্বপ্নভেদের মতো নয়। প্রতিটি বিমুখতা রেখে গেছে কিছু অভিজ্ঞতা, যাকে পুঁজি করে অধরা স্বপ্ন জয়ের আকাঙ্ক্ষা আরো বেশি করে জাগিয়ে দেয়। লক্ষ্যের পেছনে তাড়ায়।
দিনটি ছিল মঙ্গলবার। দিনের যাত্রায় মঙ্গলের তেমন লক্ষণ ছিল না। প্রতিদিনের মতো ফ্লাইট উঠছে নামছে। জাকারিয়াও দিনের সূচি ধরে দায়িত্ব পালন করছেন।
ঘোষণা এলো বাংলাদেশ বিমানের কুয়ালালামপুর থেকে আসা ফ্লাইট প্রতিদিনের মতো মাটি ছুঁয়েছে। গত ক'মাসে কুয়ালালামপুর ফ্লাইটে ছোট মাঝারি ধরনের কয়েকটি উদ্‌ঘাটন ছিল। সন্দিগ্ধ মন নিয়ে ছুটলেন চার নম্বর বোর্ডিং ব্রিজের দরজায়। সন্তর্পণে কাউকে কিছু না বলে। বিমানবন্দরে দেয়ালকেরও বিশ্বাস করা কঠিন। বিমান ব্রিজে লেগেছে। একটু দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সদ্য বিমান থেকে বেরিয়ে আসা যাত্রীদের সারিবদ্ধ নির্গমন।

শত শত যাত্রী যাচ্ছেন আগমনী হলের দিকে। এর বেশিরভাগই ছিলেন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী। এ দেশের সূর্যসন্তান শ্রমযোদ্ধা। লক্ষ্য করছিলেন, এদের সবারই চোখেমুখে উৎসবের খুশি। আকাশ থেকে নিরাপদে নেমেছেন বলেই নাকি মাতৃভূমিতে ফেরার বিজয়ে বোঝার উপায় নেই! আমাদের এই দেশসেবক শ্রমযোদ্ধাদের এই খুশীর মধ্যে নিখাদ সৌন্দর্যবোধ খুঁজে পেলেন জাকারিয়া। একটা ভালোলাগা অনুভব করলেন। দিনের ক্লান্তি যেন কেটে গেল। মনে হলো, রুটিন কাজের মাঝে এই ভালোলাগাটুকুই নিজের।
এর মধ্যে দুশোরও বেশি যাত্রী বিমান থেকে বের হয়ে গেছেন। সন্দেহ করার কিছু দেখলেন না। কমে আসছিল যাত্রীর সংখ্যাও। বোর্ডিং ব্রিজের দরজায় চোখ রাখতে রাখতে আগমনী হলে যাবার জন্য কয়েক পা এগুলেন তিনি। এসময় এ কজন যাত্রী বের হয়ে মূল করিডোরে পা রাখলেন। বোর্ডিং ব্রিজ থেকে দু'তিন পা এগিয়ে তার সামনে পড়েই হার্ডব্রেক করার মতো থামলেন। আড়চোখে

হাতের ওয়াকিটকিটি দেখলেন। অনেকটা ভ্যাবাচেঁকা খাওয়ার মতো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ত্বরিত দেখলেন। কাউকে খুঁজলেন। একটু দাঁড়িয়ে আবার সজোরে হাঁটা দিলেন। ভাবটা এমন যে লোকটি তাকে দেখেনি। এই লোকটির চোখে মুখে শ্রমযোদ্ধাদের আনন্দ-ঝিলিক নেই। একটা উৎকণ্ঠা চোখেমুখে স্পষ্ট। তার ভাবভঙ্গির একরকম চাঞ্চল্য ও অসংলগ্নতা জাকারিয়ার চোখ এড়ায়নি। দ্বিধা নিয়ে বারবার দেখছিলেন লোকটিকে।

হাতে ট্রলি ব্যাগ নিয়ে লোকটি দ্রুত পায়ে এগুচ্ছিল। চলার ধরন ও শরীরের ভাষায় অস্বাভাবিকতা লক্ষণীয়। এই চলাটা সাধারণ যাত্রীর মতো নয়। জাকারিয়ার গোয়েন্দা-মনে সন্দেহ ক্রমেই দানা বাঁধছিল। উল্টো ভাবনাও আসছিল। লোকটিকে নিয়ে তিনি হয়তো একটু বেশিই ভাবছেন। দৃষ্টির বিভ্রমও হতে পারে। সন্দেহ করার মতো কিছু হয়তো না। তবু কী যেন দেখা দরকার এমন একটা উসখুস মন থেকে তাড়াতে পারছিলেন না।

বিমান খালি হয়ে গেছে এর মধ্যে। তিনি দ্রুত পায়ে ফিরে এলেন আগমনী হলে। অবচেতনে মনে লোকটিকে খুঁজছেন। ব্যাগেজ বেল্টের চারপাশ একপলকে দেখে নিলেন। দেখা গেলো না কোথাও। চলে গেলো নাতো! দ্রুত গেলেন গ্রিন চ্যানেলের কাছে। পেয়ে গেলেন। লোকটি তাকে দেখে না দেখার ভান করে মুহূর্তে ব্যাগেজ বেল্টে ফিরে গেলেন। জাকারিয়া ভাবলেন, তার সাথে একটু কথা বলি। কুশল বিনিময়ে তো আর সমস্যা নেই:

-আপনি কাউকে খুঁজছিলেন?

-'না না, কাকে খুঁজব, ব্যাগের জন্য দাঁড়িয়ে আছি'। হতচকিত হয়ে কিছুটা জড়তা নিয়ে জবাব দিলেন। আবারো ওয়াকিটকিটা দেখলেন। কিছু আন্দাজ করলেন কিনা বোঝা গেলো না। প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিলেন,
বোঝা যাচ্ছিল।

-আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?

-মালয়েশিয়া থেকে। আপনি কে? তার পাল্টা প্রশ্ন।

-কাস্টমস গোয়েন্দার শিফট ইনচার্জ। অবিশ্বাস করলেন মনে হলো। লোকটি তাকে আপাদমস্তক দেখলেন। জাকারিয়া বয়সে তরুণ ও হালকা পাতলা গড়নের বলে হয়তো। আগেও দু'একবার এমন অবিশ্বাসের মধ্যে পড়েছিলেন।

-কোন ফ্লাইটে আসলেন?

-বাংলাদেশ বিমান। এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার কপালে জলরাশি চিকচিক করছে! ঘামছিলেন তিনি। অন্যদিকে আশার আলো চিকচিক করলো জাকারিয়ার গোয়েন্দা চোখে। মনে হচ্ছে, বুঝি কিছু পেয়েছেন। কী পাবেন যদিও আন্দাজ করতে পারছিলেন না।

-নাম কী আপনার? কবে গিয়েছিলেন মালয়েশিয়া?

-মোহাম্মাদ রোমান তালুকদার। চার দিন আগে গিয়েছিলাম। ঘাম বাড়ছে, তিনি ক্রমেই স্বাভাবিক ভাবটা হারিয়ে ফেলছিলেন।

-একটু এইদিকে আসুন। আপনার পাসপোর্টটা দেখি। পাসপোর্ট বের করতে গিয়ে তিনি আমতা আমতা করছিলেন। দু'হাত মৃগী রোগীর মতো কাঁপছিল। আশাবাদী হয়ে উঠছিলেন জাকারিয়া। কিছু একটা আছে। সেটা মোবাইল সেট, স্বর্ণালঙ্কার, সিগারেট না হয় লিকার! তাকে এর সন্ধান বের করতে হবে।

রোমানকে সরিয়ে আনলেন তিনি। সহকর্মীদের ডাকলেন। তার সন্দেহ জানালেন। সহকর্মীর নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন তাকে। তিনি স্বাভাবিকভাবে জবাব দিচ্ছিলেন। এসময় সহকর্মীদের একজন বললেন, 'স্যার এই রকম তো মনে হচ্ছে না, আপনাকে দেখে নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। ওকে স্মাগলারের মতো লাগে না।' রোমান বরাবরের মতো নির্বিকার। জাকারিয়ারও দ্বিধান্বিত। কখনো তাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

জাকারিয়া সায়ও দিলেন, হাল ছাড়লেন না! ওকে অফিস কক্ষে নিয়ে আসলেন। জানতে চাইলেন

-গত মাসে কয়বার গিয়েছেন?

-চার/পাঁচ বার। উত্তর শুনে তার সহকর্মীরাও এবার উৎসুক হলেন। জিজ্ঞাসু চোখে বললেন, 'চার/পাঁচ বার কেন?

-এতবার মালয়েশিয়া কেন যান? বিমান ভাড়া কোম্পানি দেয়।

-আপনার কাছেতো স্বর্ণ আছে, কোথায় রেখেছেন? প্রশ্ন করলেন জাকারিয়া।

-নাই স্যার। দুবার ঢোক গিললেন। একটু নিঃশ্বাস নিয়ে আত্মবিশ্বাসসহ বলতে চেষ্টা করলেন। এ সময় তিনি ক্রমাগত কাঁপছিলেন। এবার রোমানের কাঁপুনি সবার চোখে পড়ছে। একজন অফিসার চিৎকার করে বলে উঠলেন 'স্যার, ওর কাছে জিনিস

আছে, দেখেন ও কেমন করে কাঁপতেছে'! জাকারিয়া এবার মজা পেল, যেটা প্রথম থেকে সন্ধান করছিলেন, সেটা একজন মুখে তুলে নিলেন।

অন্য সহকর্মীরাও এসে গেছেন ইতোমধ্যে। এখন সবাই মোটামুটি নিশ্চিত কিছু পাওয়া যাবে। তন্ন তন্ন করে তার সব কিছু তল্লাশি করা হলো। পাওয়া গেলো না কিছুই। কী আছে, সবাই আন্দাজ করছে 'স্বর্ণ'! কোথায়? নাই তো কোথাও। সেটা হাতব্যাগ, মানিব্যাগ, কোমর, জুতা, বেল্ট ছাড়িয়ে পাকস্থলিতে গিয়ে ঠেকবে, কারো কল্পনায় আসেনি। একজন প্রবীণ অফিসার ধমক দিয়ে বললেন 'অ্যাই, তোর কাছে গোল্ড আছে, বের কর। নাইলে খবর আছে!' সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, বলল, 'স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি কিছু করিনি, আমার দোষ নেই'। কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন, এবার শক্ত করে বললেন 'আমার কাছে গোল্ড নেই, আপনারা তো চেক করলেন'! জাকারিয়া বুঝলেন, এ রোমান বড্ড শক্ত লোক। সহজে ধরা দেবে না, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে তাকে। তবে এর শেষ তিনি দেখবেন।

অর্ডার দিলেন, তাকে আর্চওয়ের ভেতর দিয়ে হাঁটাতে। এ যন্ত্রটিও কাজের সময় অকাজের হয়ে যায়। আর্চওয়ে প্রথমবার সংকেত দিল, তার শরীরে ধাতব কিছু আছে। কর্মকর্তার সবাই বলে উঠলেন 'স্যার গোল্ড ওর পেটের ভেতরে, হয় সে গিলে আনছে অথবা..... ঢুকিয়ে আনছে!'

আর্চওয়েতে আবার হাঁটানো হলো। এবার সংকেত দিলো না। রোমান বলে উঠল, 'আমার পেটে কোনো স্বর্ণ নেই, স্যার। আমি ডায়াবেটিসের রোগী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, আমাকে আর হয়রানি না করে ছেড়ে দিন।'

কাকুতি মিনতি করে এমন সুন্দর করে বলছিল, মাঝে মাঝে তাকে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করছিল জাকারিয়ার।

তিনি রোমানের খুব কাছে গিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

'রোমান, আপনি তো কাস্টমস হলের বাইরে যাননি, বাইরে বের না হলে আর কাস্টমস এরিয়ার মধ্যে কেউ স্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে মামলা হয় না। আপনি স্বীকার করলে, আমরা স্বর্ণগুলো ডিউটি আদায় করে ছেড়ে দেবো বা স্বর্ণ আটক করে কাগজ দিয়ে দেব, আপনি পরে ডিউটি দিয়ে নিতে পারবেন। আমরা তল্লাশি করে আপনার পেট থেকে উদ্ধার করলে আপনার বিরুদ্ধে চোরাচালানের মামলা হবে, ফৌজদারি মামলা হবে, আপনার কয়েক বছরের জেল হবে। এ ধরনের অপরাধের জামিন হয় না। আপনার স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন আছে। ওদের কী হবে বুঝতে পারছেন!'

পরিবারের কথা শুনে রোমানের চোখ দুটো ছলছল করছিল। জাকারিয়া ভাবলেন, বুঝি কাজ হবে এবার। নাহ্, কিছু হয়নি। রোমান আবেগ কাটিয়ে উঠে আরো দৃঢ়তা নিয়ে বললেন, 'আমার কাছে স্বর্ণ নেই।'

এবার তিনি সহকারী কমিশারের আইনি ক্ষমতা প্রয়োগে গেলেন। একজন যাত্রীকে বিনা প্রমাণে হয়রানি বেআইনি ও অনৈতিক। তল্লাশি গ্রেফতার জরুরি হয়ে পড়লে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাকে প্রক্রিয়ায় আনতে জাকারিয়া তার দেহ তল্লাশির নির্দেশ দিলেন। অন্য সংস্থার সাক্ষী আনা হলো। প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরানো হলো তাকে। পেটে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে শক্ত কিছু বোঝা গেলো। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা ও তল্লাশি করতে বললেন। এবারো তার শরীরে ধাতব বস্তুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। কিন্তু রোমান কিছুতেই স্বীকার করছে না। স্বীকার করানো যাচ্ছে না।

ধৈর্য যেন আর বাঁধ মানে না। সজোর ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

-অ্যাই তোমার পেটের ভেতর স্বর্ণের বার কয়টা আছে? কাঁপছে এবার রোমান থরথর করে। তার আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তবু বলছে

-না, আমার কাছে স্বর্ণ নেই

-তাহলে কাঁপছ কেন তুমি?

-জ্বি, না স্যার, কাঁপছি না তো!

-তোমার পেটে স্বর্ণ আছে, আমাদেরকে পেইন না দিয়ে বের করে দাও, নাইলে পেট কেটে বের করবো। রোমান কাঁপছে কিন্তু একই উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

আরেকটি মেটাল ডিটেক্টর আনা হলো।

দুইটি মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে বারবার পরীক্ষা করা হচ্ছিল। এগুলো যেন রোমানের প্রার্থনা শুনছিল। একবার সংকেত দিলে দুবার

দেয় না। স্বর্ণ তার পেটে আছে সবাই মনে করলেও প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। তাকে আবার আর্চওয়েতে নিশ্চিত সংকেত পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বললেন, স্যার মনে হয় কিছু নেই! কেউ কেউ রোমানের কাকুতিতে মায়ায় পড়ে গেছেন মনে হচ্ছিল। তাকে সরাসরি কিছু বলতে পারছিলেন না। পেরিয়ে যায় কসরতের ছয় ঘণ্টা। এমন একটা সময়ে পুরো টিম হতাশ। নিজের ভেতর আশা জাগিয়ে রাখলেন জাকারিয়া।

নতুন উদ্যমে শুরু করলেন। শারীরিক কসরত পদ্ধতি। বললেন, ১০০ বার ওঠবোস কর! তিনি এমন কিছু করতে অনিচ্ছুক। বাধ্য করা হলো তাকে। শুরু হলো ওঠবোস। ৪০ বার করে ফ্লোরে বসে পড়লেন। তিনি এবার আরো নিশ্চিত হলেন, জিনিস রোমানের পেটের মধ্যেই। আবার মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করতে বললেন। ওঠবোস করানোর কারণে স্বর্ণের পুটলি তার পেটের নিচের দিকে নেমে আসে। মেটাল ডিটেক্টরও এবার সংকেত দিল। তাদের সন্দেহ ক্রমে নিশ্চয়তার দিকে এগুচ্ছিল।

এবার ভোজন কৌশল। পেট পুরে খাওয়ানোর অর্ডার দিলেন। গরম গরম মাংস পরোটা দেয়া হলো। রোমান খাচ্ছেন মেপে অল্প পরিমাণে। পানি খাওয়ানো হলো দেড় লিটার। হাফ লিটার ফ্রুটো জুস। থেমে থেমে হলেও চাপে পড়ে তাকে খেতে হচ্ছিল। এসময় তাকে হয়রানি করা হচ্ছে, সে ভালো বংশের সন্তান, তাকে হেয় করা হচ্ছে' বলে অভিযোগ করতে থাকে। পেটে স্বর্ণ থাকার কথা কোনোমতেই স্বীকার করে না।

জাকারিয়া বলেন, তখন সাফল্য-ব্যর্থতার অনিশ্চিত দোলাচলে দুলছি আমরা। নিশ্চিত ছিলাম তার কাছে স্বর্ণ আছে। পেটের মধ্যেই আছে। তার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় না করে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারছিলাম না। এর মধ্যে কেটে গেল দীর্ঘ আট ঘণ্টা। বিরতি দিয়ে চলতে থাকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ।

ম্যানুয়াল সব চেষ্টা ব্যর্থ। সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করলেন জাকারিয়া। রোমানকে এক্সরে করা হবে। রাত গভীর হয়ে গেছে, পরিচিত কোনো ক্লিনিক বা হাসপাতালে করতে হবে। তাকে বুঝতে দেয়া হবে না। কড়া প্রহরায় তাকে নিয়ে গেলেন উত্তরায় একটি হাসপাতালে। গভীর রাতে হাসপাতালে। গভীর রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো। আবাসিক ডাক্তারকে বাসা থেকে ডেকে আনা হলো। আগে কিছু বলা হলো না ডাক্তারকে। এক্সরে কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জাকারিয়া তাকে উদ্দেশ্য জানালেন। ডাক্তারকে এবার বেশ উৎসাহী মনে হলো। রোমানও ততোক্ষণে বুঝতে পারলো তার এক্সরে হচ্ছে।

টেবিলে শুয়েও রোমান সাহসিকতার সাথে মিথ্যা বলে যাচ্ছিল। নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে তার পেটে স্বর্ণ নেই। হলো এক্সরে। এক্সরের বহুল কাঙ্ক্ষিত রিপোর্ট পাওয়া গেল। রিপোর্ট দেখেতো কর্মকর্তারা মহাখুশি। দম ফিরে এলো সবার মধ্যে। রাত গভীর হলেও ক্লান্তি, সাফল্য আর প্রাপ্তির আনন্দকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি।

জাকারিয়া রোমনকে বললো 'এখন কী বলবে?' তার উত্তরের অপেক্ষা না করে ডাক্তারকে বললেন 'বাচ্চা যেমনিভাবে সিজার করে ডেলিভারি করায় তেমনি করে এর পেট কেটে স্বর্ণগুলো বের করে দিন।' রোমান তালুকদার এবার প্রচণ্ড ভয় পেল। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। এই প্রথম রোমান স্বীকার করল তার পেটে স্বর্ণ আছে এবং সে চেষ্টা করলে বের করে দিতে পারবে।

তাকে হসপিটাল থেকে এয়ারপোর্টে ফিরিয়ে আনা হয়। এক সহকর্মী বলে উঠলেন,'স্যার ওরে একা বাথরুমে পাঠিয়েন না, বেটা অনেক শেয়ানা, টয়লেট ফ্লাশ করে দেবে' রোমানকে কড়া পাহারায় লোক দিয়ে

টয়লেটে পাঠানো হয়। বলা হলো ফ্লাশ বা প্যান নেই এমন টয়লেটে নিতে হবে। রাত দেড়টার দিকে ব্যাপক কোনো কসরত ছাড়াই রোমান তিনটি পুটলি বের করে আনলো। পেড়ে আনলো সোনার ডিম। পরিষ্কার কেরে আনা হলো পুটলিগুলো। জিজ্ঞেস করা হলো এতে কয়টি বার আছে? জবাব এলো 'বারটি'। এ প্রথম রোমান তাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিল। স্বর্ণবারগুলো বের করে দিল। উৎকণ্ঠাহীন স্বাভাবিক শারীরিক ভাষা তার। আর এর মধ্য দিয়ে সফল পরিণতি পেলো ষোল ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

নি:সন্দেহে সময়টা জাকারিয়া ও তার টিমের জন্য বড্ড আনন্দের। তার লেগে থাকা এখন সার্থক। সার্থক হয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা টিমের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। তার টিম সফল। তিনি বিজয়ী। কাস্টমস অ্যাক্ট ও ফৌজদারি আইনের আওতায় মামলা করে রোমানকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

ক্লান্তিহীন লেগে থাকা, অবিরাম প্রচেষ্টা, একগুয়েমিপনায় এলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার এক অনন্য সাফল্য। সহকর্মী আর অন্য সংস্থার সদস্যদের প্রশংসা আর অভিবাদনে সিক্ত হচ্ছিলেন নবীন সহকারী কমিশনার জাকারিয়া, তার ভাবনায় তখন চলছিল অন্যকিছু। এক্সরেতে 'রোমানের পেটে স্বর্ণ নেই' এমন রিপোর্ট আসলে কী হতো! ভেবে শিউরে উঠলেন। স্বর্ণহীন বর্ণহীন রোমান তালুকদারকে নিয়ে কী করতেন! তাকে নিয়ে বেশ বাড়াবাড়িই করেছেন! সহকর্মীদের কারো কারো মতামত উপেক্ষা করে আহত করছেন। পরদিন জাতীয় দৈনিকের 'বিমানবন্দরে কাস্টমস গোয়েন্দা জাকারিয়ার যাত্রী হয়রানি' দিয়ে শিরোনাম হতেন।

নিন্দুকরা তো মুখিয়েই ছিলেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তিনি রক্ষা করেছেন। সম্মান বাঁচিয়েছেন। আইনি কাজকর্ম শেষ করে 'শিফট ইন চার্জ'র কক্ষে সহকর্মীদের ডাকলেন। সবাইকে জানালেন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা, তার মহাপরিচালকসহ অন্য সিনিয়রদের শ্রদ্ধা। যাদের সমর্থন ছাড়া এমন জটিল কঠিন কাজ সফলভাবে তুলে আনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বললেন, 'আপনাদের পরিশ্রমেই এ অর্জন! এ কৃতিত্ব আপনাদের, শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের, আমি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।'

গল্পটি একটি সফল উদ্‌ঘাটনের। এ গল্পে দুটি চরিত্র। জাকারিয় ও রোমান। জাকারিয়া দেশপ্রেম ও কর্তব্যের চেতনায় সাফল্যের পানে ছুটেছেন। রোমান

উল্টো চেতনায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রোমান উল্টোরথে যুদ্ধ করে গেছে। এতগুলো সংস্থার প্রতিনিধিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজের কথায় অনড় থাকে! তার এই দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সাহস কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। সঠিক লালন পালন হলে রোমানের এই ক্ষমতা দেশ ও সমাজের কাজে আসতে পারতো। এভাবে আমাদের অগোচরে অনাদর অবহেলায় এ দেশের কতো কৃতী সন্তান রোমান হয়ে যাচ্ছে!

আমাদের আশা থাকবে জেল থেকে বের হয়ে রোমান সুস্থ জীবনে ফিরে যাবে। তার শক্তি সাহস মেধাকে দেশের কাজে লাগবে। আমাদের চারপাশ থেকে আর যেন কোনো রোমান তৈরি না হয় সেজন্যে সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হবে। রোমানদেরকে খুঁজে বের করে জাকারিয়া বানাতে হবে।

স্বপ্ন অসীম হোক, চেষ্টা স্বপ্নের অনুগামী থাকুক। দেশটি আগাগোড়া স্বপ্নাচারীর লীলাভূমিতে পারিণত হোক। এভাবেই আগামীর স্বপ্নভূমির সংকল্প রচিত হোক।

- লেখক **মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী,** পরিচালক (গবেষণা ও পরিসংখ্যান), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

TURKISH AIRLINES

Authorized Economic Operator: Certification Process of Selected Asia-Pacific Countries & Lessons for Bangladesh

-Syed Mushfequr Rahman

Historical Background of AEO:

9/11 has been an underpinning episode of history for many of the changes. We see around the world today, especially in the area of customs control over national security and anti-terrorism.

Prior to that tragic event most customs administration in developed economies targeted illegal commodities, such as narcotics and counterfeit goods while the developing economies were concerned predominantly with levying and collecting duties and taxes. Regardless of these varying priorities, a common thread of the customs environment before 9/11, was the emphasis, both theoretically and operationally, on the place of import. Whether deterring smuggling, reducing red tape at the border, or collecting customs duty, customs administration generally concentrated on imports rather than exports and the focus of customs controls and analysis took place at the physical place of import rather than the other nodes along the supply chain. Moreover, World Customs Organization (WCO) paid little attention to supply chain security and terrorism.

When the greatest power on earth – America – was attacked in 2001 on September 11, they decided the world must review all the rules of business that governs everything related to cross country movement of goods and people. So they started implementing new programs and policies that aimed at preventing global trade from being used as a conduit for terrorism.

[1] The US Customs Service became US Customs and Border Protection (CBP) in 2003 to regulate both cargo and passengers (immigration) and shifted from the Department of Treasury to Department of Homeland Security.

The major programs of US Customs & Border Protection on movement of cargo include Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) in 2001, Container Security Initiative (CSI) in 2002 and 24-Hour Rule in 2003.
C-TPAT is the first security oriented Authorized Economic Operator program, which is a voluntary partnership between US Customs and international trade operators. CSI places US Customs officers at foreign ports to screen containerized cargo exported to any US port. The 24-Hour Rule requires sea carriers to provide US Customs with detail descriptions of the contents of the sea-containers bound for US, 24 hours prior to the loading of the container on board at the port of shipment. Although these responses against the terrorists' attack on America on 9/11 raised a lot of controversies, the measures were seen as less costly to both customs and trade compared to other alternatives like 100% scanning or physical inspection at the port of entry.

Against this backdrop, WCO took the matter of increased global concern regarding the acts of international terrorism quite seriously and then encouraged by the G-8 Summit in Canada in June 2002, adopted a resolution to develop instruments on securing and facilitating global trade. This led to the development of SAFE Framework of Standards (FoS) in 2005. This is a non-binding instrument comprising technical customs standards aimed at securing without impeding global trade. SAFE FoS has four elements and three pillars:

Four Elements

a. Risk Management
b. Advance Electronic Information
c. Outbound Inspection
d. Partnership with Trade

Three Pillars

a. Pillar 1: Customs to Customs Co-operation
b. Pillar 2: Customs to Business Partnership
c. Pillar 3: Customs to Other Government and Inter-Government Agencies

Pillar 2 formed the foundation stone for formulating the concept of Authorized Economic Operator (AEO). As of 2015, 168 out of 180 member states of WCO have signed the Letter of Intent (LoI) with WCO for implementing the SAFE FoS. This indicates that most of the Customs administrations have taken this measure very seriously to facilitate their traders vis-à-vis ensuring safety and security of their countrymen.

Following the C-TPAT model of US Customs – the first AEO initiative – many countries have started working on the AEO implementation. Certification processes of a few selected countries of this region are briefly narrated below which could give good insight to Bangladesh Customs:

Experiences of selected Asia Pacific (AP) countries

Singapore

In the AP region Singapore remains in the forefront by signing the LoI with WCO on implementing the SAFE FoS as early as in 2005. Singapore has launched their AEO program – Secure Trade Partnership (STP) – in 2007. Immediately after the STP program, Singapore Customs the

STP–Plus in 2008 for companies aiming higher tier of compliance status. The STP–Plus program was launched targeting Mutual Recognition Arrangement (MRA) with other Customs administrations. Until now Singapore has signed seven MRAs, which are as follows:

(1) Canada (June 2010)
(2) Republic of Korea (June 2010)
(3) Japan (June 2011)
(4) People's Republic of China ((June 2012)
(5) Taiwan (June 2013)
(6) Hong Kong (June 2014)
(7) USA (December 2014)

Singapore Customs have set five broad assessment categories as follows:

(1) Company Profile
(2) Inventory Management & Control
(3) Compliance
(4) Procedures and Processes
(5) Security

More than 142 companies are enlisted under the STP/STP+ program who account for around 21% of Singapore's total export. The security elements considered for STP certification are:

(1) Premises security and access control
(2) Personnel security
(3) Business partner security

(4) Cargo security
(5) Conveyance security
(6) Information and IT security
(7) Incident management and investigations
(8) Crisis management and incident recovery

India

India has also joined the club of AEO certification very recently. Until now they have certified 27 entities as AEOs, which are as follows:

a. Importer – 1
b. Exporter – 1
c. Logistic Service Provider – 5
d. Custodian or Terminal Operator – 9
e. Custom House Agent (Customs Brokers) – 10
f. Warehouse Operator – 1

To approve an application for AEO certification Indian Customs carry out the following validation tests:

a. Legal Compliance

- Examination & Scrutiny of 3 years track record of adherence to Customs, Central Excise and Service Tax laws and other fiscal laws relating to Income/Corporate Tax.
- Assessment of infringements of Tax laws by
  - applicant's business entity
  - authorized persons involved in the running of the business

b. Management of Commercial & Transport Records

- An accounting system consistent with GAAP/IFRS, which facilitates audit based Customs control.
- An administrative set up and documented procedures to control and manage the movement of goods.
- Internal controls capable of detecting illegal or irregular transactions.
- Satisfactory procedures to archive and retrieve records and information, and also for protection against the loss of information.
- Appropriate information technology security to protect against unauthorized intrusion.

c. Financial Solvency

- An applicant must be financially solvent for the three years preceding the date of application.
- The applicant should not be listed currently as insolvent, or in liquidation or bank ruptcy and should not have an outstanding claim against any guarantee in the last three years.
- Where required, the applicant should have filed annual accounts with Registrar of Companies within the time limits laid down by law.

d. Maintenance of Approved Safety & Security Standards:

- Premises Security, which includes among others, CCTVs should be used to monitor

[2] GAAP – Generally Accepted Accounting Principles are the standard framework of guidelines for financial accounting used in any given jurisdiction. IFRS – International Financial Reporting Standards

the premises and images should be useful to assist in post incident investigations, strategic locations of cameras, quality of recordings, storage of recordings etc.

- Cargo Security includes documented procedures and processes on cargo handling and storage, proper reporting mechanisms in place for cargo related incidents, effective communication and training.
  for personnel involved in supply chain activities and use of ISO 17712 compliant high security seals.
- Conveyance Security includes conveyance Inspection, tracking and monitoring, drivers' guide etc.
- Personnel Security includes standard documented procedures for new hires, current employees, terminated/ resigned employees, pre-employment verification & back ground checks, periodic background checks/reinvestigation of current personnel, resignation and termination of personnel, education, training etc.
- Business Partner Security
- Information Technology Security includes preserving confidentiality, integrity and availability of physical and electronic data and information systems, measures for protecting hardware, software and network from any attacks (virus attack or hacking) procedures to be in place for:

- Security classification of information
- Data storage, backup, recovery and disposal
- Flagging out discrepancies (system capability)
- Awareness and training on Information Security for staff.

Once the applicant meet all the aforementioned requirements, the Customs authority issues the AEO certificate which remains valid for 5 years. Meanwhile the AEO Program office conducts periodic review of the status. In November 2013, India signed MRA with Hong Kong and China. Negotiation is on to ink MRA with South Korea soon.

Australia

Australian Border Force (ABF), under the Department of Immigration and Border Protection, has started its AEO program as late as July 2015 and it has 18 certified operators until now. This program is called Australian Trusted Trader (ATT), which started with four initial pilot participants who were all exporters, i.e. Boeing (Aero Structures Exporters), Devondale (Dairy Exporter), Techwool (Wool Exporter), Modelez Australia (Confectionary and General Food Exporter).

The accreditation process is as follows

- Expression of Interest outlining basic eligibility
- Self Assessment Questionnaire (SAQ) detailing how the business meets and self assesses against requirements
- Assessment of the SAQ and general entity risk/suitability by ABF officers
- The setting of a partnership agreement and provision of initial benefits
- On-site validation of information provided in the SAQ
- The establishment of a control plan to manage ongoing compliance
- Formal certification of the business as an ongoing Trusted Trader and provision of additional benefits

The qualification criteria are as under

- Status and experience of the entity
- Financial criterion
- Operating systems capability
- Communication and information quality
- International supply chain security
- Compliance with customs related laws
- Responsibilities in relation to other persons

ABF is now trying to negotiate MRA with other customs administration to reap off the true benefits of AEO system.

Bangladesh

Bangladesh Customs' progress in AEO implementation is quite limited. A national workshop was held in 2013 with the help of WCO and ADB. Then a team headed by a commissioner has been formed to take this initiative further. Until now no visible progress has been made other than holding several rounds of sensitizing seminars across Bangladesh.

Conclusion

From the experiences of the selected countries in the Asia Pacific region it can be concluded implementing AEO is a very costly, complex and arduous process. It becomes especially difficult when it is coupled with low capacity to administer such as in the case of Bangladesh. It is not surprising that India, being at the higher side of the development curve, when compared to Bangladesh, has so far been successful in certifying only one manufacturing entity – LG Electronics. This is a South Korean conglomerate having a great deal of international exposure in many developed and developing economies. Thus it was relatively easier for this company to comply with the strict validation criteria required for AEO certification. Besides, the main benefit for the aspiring authorized operators is when MRA with the trading customs administration is in effect, which will act as a major incentive to get certified as AEO. India has been quite successful in that which indicates the degree of trust on Indian Customs' capacity to administer AEO program by the counterpart administrations.

Based on the lessons learnt from the experiences of the regional countries, especially India being at the similar level of bureaucratic backwardness, Bangladesh Customs should undertake the following steps immediately:

a. Design the AEO program following international experiences.
b. Identify the areas where specialist's knowledge will be required, e.g. accounting and financial reporting standards, cyber security, business process design and analysis, intelligence management etc.
c. Develop policies of recruiting these specialists or at least train the officers having similar academic background for the job and more importantly retain them in the AEO Program Unit for at least 5-6 years.
d. Engage early with the major trading countries on design and capacity for signing of MRA, which would eventually attract the operators to invest for AEO certification.
e. Design customs process to facilitate the faster clearance of certified operators and amend the Act as appropriate.
f. Invest in physical infrastructure development to administer the AEO programs

- **Syed Mushfequr Rahman,** is a First Secretary of the National Board of Revenue and is currently working as Deputy Project Director at VAT Online Project.

This article is written based on the knowledge shared by the experts at a WCO Seminar on AEO Implementation in the Asia and the Pacific region held at New Delhi, India, during 18-20 November 2015, which the author attended as NBR representative.
The US Customs Service became US Customs and Border Protection (CBP) in 2003 to regulate both cargo and passengers (immigration) and shifted from the Department of Treasury to Department of Homeland Security.
GAAP – Generally Accepted Accounting Principles are the standard framework of guidelines for financial accounting used in any given jurisdiction.
IFRS – International Financial Reporting Standards

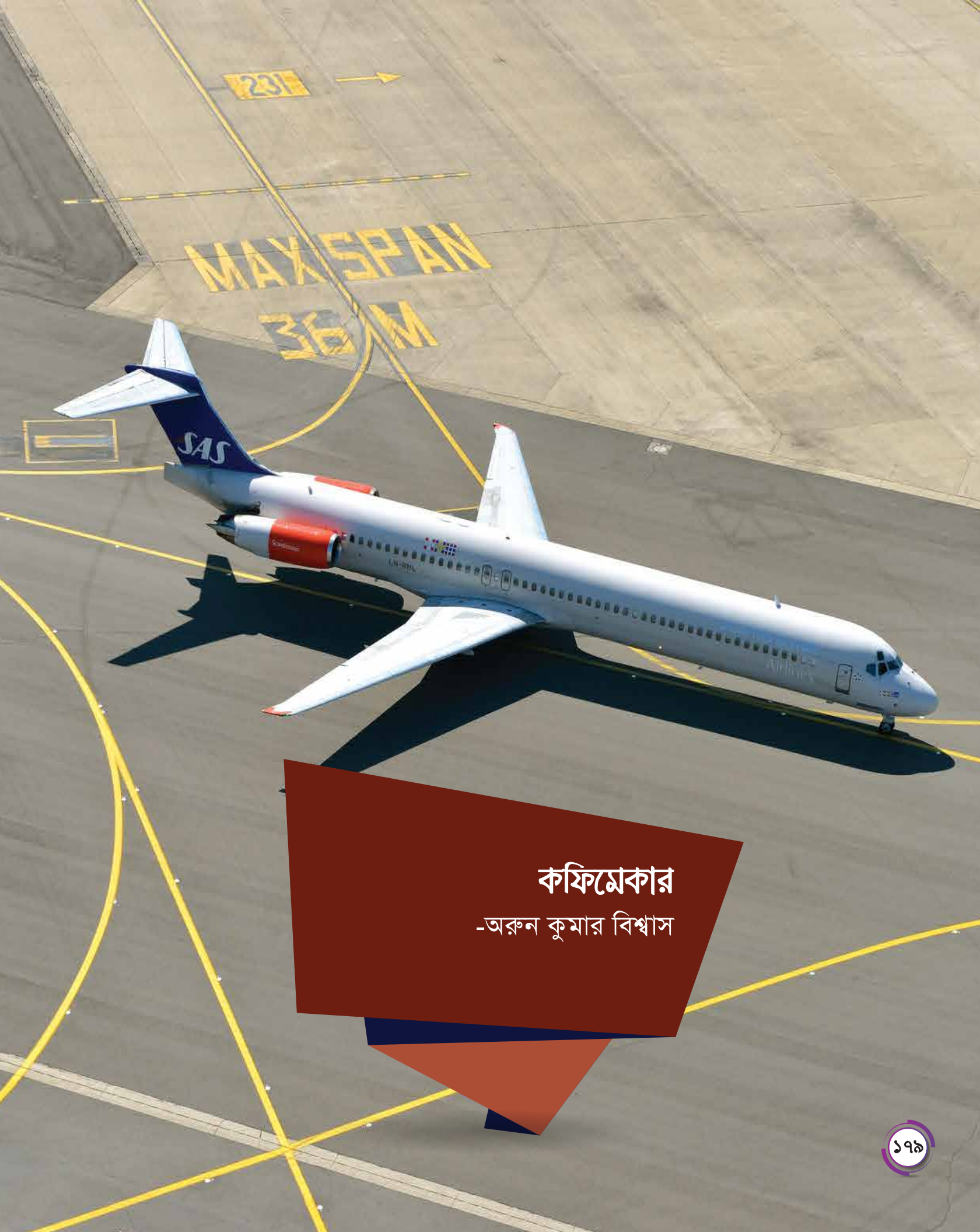

কফিমেকার

-অরুন কুমার বিশ্বাস

অলোকেশ রয় আপাতত নিষ্কর্মা বসে আছেন। তবে কাজ না থাকলেও বসে বসে মশা-মাছি তাড়ানো তার ধাতে নেই। তিনি রীতিমতো পাড়পাঠক। অলোকেশ মনে করেন, শুধু বই পড়ে তামাম দুনিয়া ঘুরে আসা যায়। সাথে একটু কল্পনার মিশেল থাকলেই চলে। মানে একটু রোম্যান্টিক হতে হয়। স্রেফ বাস্তবতা দিয়ে তো জীবন চলে না। অলোকেশ এয়ারপোর্টে তার রুমে বসে 'ক্রাইম-কুইন' খ্যাত সিডনি শেলডনের একখানা নভেল পড়ছেন। এয়ারপোর্ট মানে দিবারাত্রি সমান কথা। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক উড়ালবন্দর বস্তুত রিভারাইন ডেল্টা বাংলাদেশের গেটওয়ে। আরো দু'খানা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অবশ্য আছে, তবে ঢাকার সাথে কারো তুলনা চলে না। ক্যাপিটাল বলে কথা। কড়া এসি চলছে। পুরো এয়ারপোর্ট চত্বরে সেন্ট্রাল এসি, তাই চাইলেও কারো ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দিকে মনোযোগী হওয়ার উপায় নেই। উপন্যাসে জমে আছেন অলোকেশ। লেখিকা ভদ্রমহিলা রহস্যের জাল বুনতে ভয়ানক পারঙ্গম। ভয়ানক বললাম এই জন্যে যে, শেলডনের উপন্যাস মানেই জবরদস্ত অপরাধের গা-শিউরানো আখ্যান। সিরিয়াল কিলার থেকে শুরু করে সাইকোপ্যাথ ক্রিমিনালদের অবাধ আনাগোনা সেখানে।

অলোকেশ অবশ্য এক্ষেত্রে কাহিনিকার হিসেবে অস্কার ওয়াইল্ডকে খানিক এগিয়ে রাখছেন। কারণ গল্প নির্মাণে অস্কার ওয়াইল্ড মোটেও ওয়াইল্ড বা খেপাটে নন। তিনি বরং রক্তারক্তি বা সেনসেশনের তুলনায় মগজের খেলাতে বেশি আগ্রহী। মিস্টার রয় দুটোতেই স্বচ্ছন্দ। তিনি শুধু পাঠক নন, লেখকও। তাই তার বিশ্লেষণ রীতিমতো চুলচেরা। কাউকে একবিন্দু ছাড় দিতে তিনি রাজি নন। সমালোচক হিসেবে যার যেটুকু পাওনা, তা তিনি সানন্দে দিয়ে থাকেন। যাক্‌গে, যে-কথা বলছিলাম। অলোকেশ বইয়ের সাথে কফিতে বিস্তর আস্বাদ পান। মোক্‌কা ব্লেন্ড তার বিশেষ পছন্দ। এ জাতীয় পিওর কফি বিন্‌স অবশ্য সবখানে পাওয়াও যায় না। সেবার বিলেত থেকে ফেরার পথে পছন্দের বেশ কিছু কফি বিন্‌স তিনি নিয়ে এসেছেন। পুনর্বার বিদেশমুখী হওয়া অব্দি এতেই চলে যাবে বলে তার বিশ্বাস। কফিতে চুমুক দিতে দিতে মৃদুমন্দ হাসছেন অলোকেশ। হঠাৎ একজন এলো। নিয়মিত ভিজিটর নয়, প্যাসেঞ্জার। তাকে বরং আগন্তুক বলা ভালো। অলোকেশের সাথে (তার দুর্নিবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও) করমর্দন করতে করতে নিজেকে তিনি জনৈক ফারহান আহমেদ বলে পরিচয় দিলেন।

বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি? ভ্রু কুঁচকে তাকান অলোকেশ। তার চোখের কোণে বিরক্তি স্পষ্ট।

তেমন কিছু না। আপনার সাথে যেচেই আমি আলাপ করতে এলাম। হে হে গোছের এক স্লাইস হাসিসমেত কথাটুকু উগড়ে দেন ফারহান।

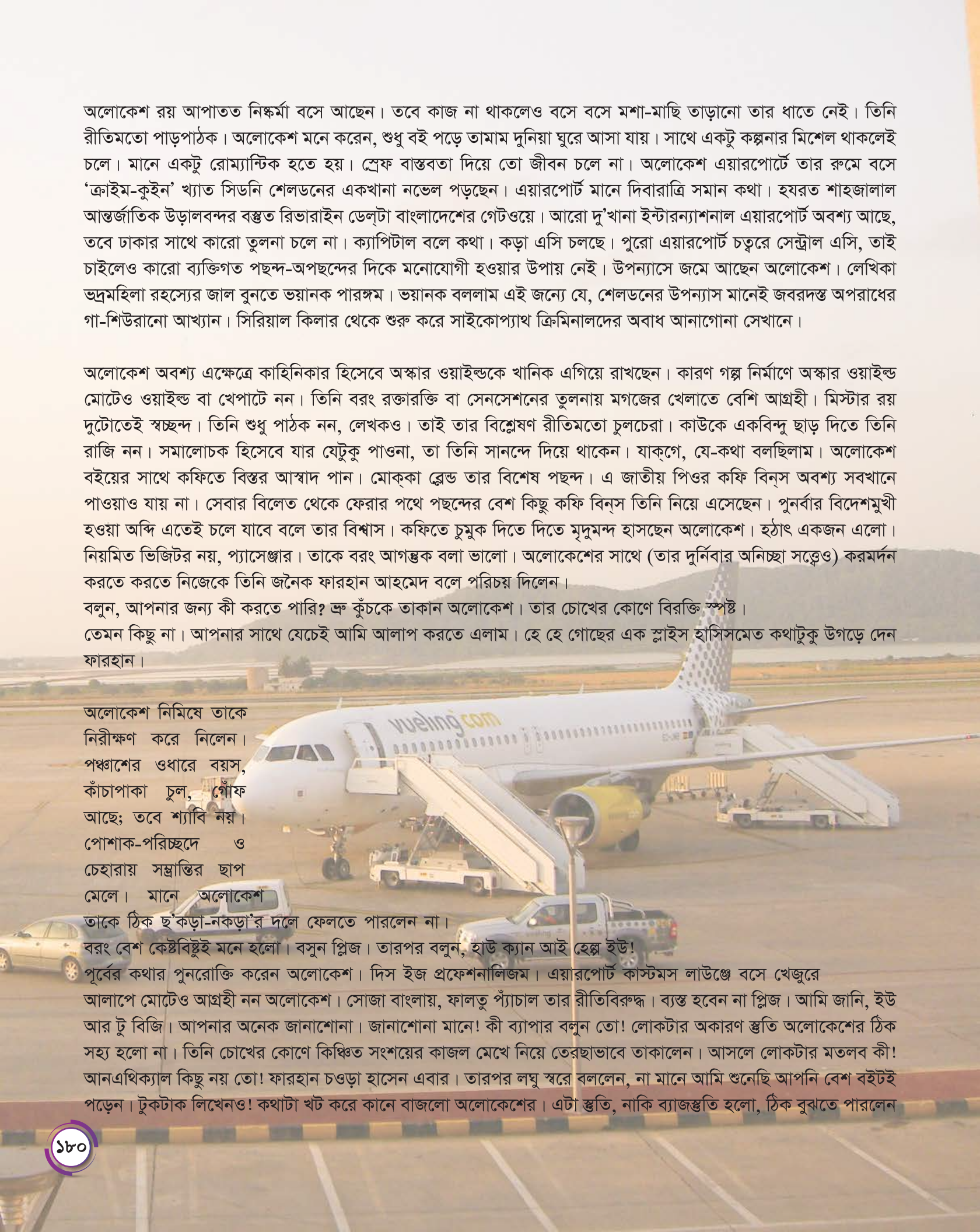

অলোকেশ নিমিষে তাকে নিরীক্ষণ করে নিলেন। পঞ্চাশের ওধারে বয়স, কাঁচাপাকা চুল, গোঁফ আছে; তবে শ্যাবি নয়। পোশাক-পরিচ্ছদে ও চেহারায় সম্ভ্রান্তির ছাপ মেলে। মানে অলোকেশ তাকে ঠিক ছ'কড়া-নকড়া'র দলে ফেলতে পারলেন না।

বরং বেশ কেষ্টবিষ্টুই মনে হলো। বসুন প্লিজ। তারপর বলুন, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ!

পূর্বের কথার পুনরোক্তি করেন অলোকেশ। দিস ইজ প্রফেশনালিজম। এয়ারপোর্ট কাস্টমস লাউঞ্জে বসে খেজুরে আলাপে মোটেও আগ্রহী নন অলোকেশ। সোজা বাংলায়, ফালতু প্যাঁচাল তার রীতিবিরুদ্ধ। ব্যস্ত হবেন না প্লিজ। আমি জানি, ইউ আর টু বিজি। আপনার অনেক জানাশোনা। জানাশোনা মানে! কী ব্যাপার বলুন তো! লোকটার অকারণ স্তুতি অলোকেশের ঠিক সহ্য হলো না। তিনি চোখের কোণে কিঞ্চিত সংশয়ের কাজল মেখে নিয়ে তেরছাভাবে তাকালেন। আসলে লোকটার মতলব কী! আনএথিক্যাল কিছু নয় তো! ফারহান চওড়া হাসেন এবার। তারপর লঘু স্বরে বললেন, না মানে আমি শুনেছি আপনি বেশ বইটই পড়েন। টুকটাক লিখেনও! কথাটা খট করে কানে বাজলো অলোকেশের। এটা স্তুতি, নাকি ব্যাজস্তুতি হলো, ঠিক বুঝতে পারলেন

না। তাছাড়া ভদ্রলোক কেন গায়ে পড়ে তার প্রশংসা করতে এসেছে, তাও চিন্তার বিষয় বৈকি। অলোকেশের চোখে দোলাচল দেখে ফারহান সচকিত হন এবং নিজেকে শুধরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বলেন, আপনার লেখা আমি পড়েছি। সুধীসমাজে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। লোকটা এমন করে 'প্রশংসিত' বলল, অলোকেশের যেন মনে হলো নয়, ওটা দংশিত শুনলেন। তবে সত্যি বলতে, লোকটাকে নেহাত তার মন্দ লাগে নি। গুণের প্রশংসা করলে কারই বা খারাপ লাগে। মানুষ তো যশের কাঙাল। আমার বই পড়েছেন আপনি? অলোকেশ সুরে খানিক প্রশ্রয় মেশান। অফ কোর্স। বেশ জোরের সাথে ফারহান বললেন, এবং কয়েকটি বইয়ের সারাংশসহ নামও উল্লেখ করলেন। ফলে অলোকেশের আর সন্দেহ থাকে না যে লোকটি সত্যিই তার গুণমুগ্ধ পাঠক। এবং তিনি কোনো রকম মতলব ছাড়াই তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। অলোকেশ যারপরনাই বিগলিত এবং ফারহানের অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই বললেন, কফি

বলি? ওকে, থ্যাঙ্কস। তবে দরকার ছিল না কোনো। আমি জাস্ট আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। আপনি দয়া করে একটু সময় দিয়েছেন, তাতেই আমি ধন্য। দরাজ হাসি উপহার দেন বিশিষ্ট সাহিত্যমোদি (নরেন্দ্র মোদি নয়) জনাব ফারহান আহমেদ। অলোকেশ কফির ফরমায়েশ দিলেন। তার ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস। 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' বলে একটা কথা তার মনের মুকুরে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। লোকটা যথার্থ সজ্জন বটে। কফি এলো। লোকটা খুব মহবৎতের সাথে সুড়ুৎ সুড়ুৎ (যা কিনা অতিশয় অনভিপ্রেত, এবং কফিম্যানারসের পরিপন্থী) শব্দ না করে কফির মগে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। কফি থেকে নির্গত ধোঁয়া নিয়ে মোটেও উষ্মা বা উদ্বেগ দেখালেন না। বরং অলোকেশ যে তাকে বিশেষ সৌজন্যবোধে কফি অফার করেছেন, এটা তার প্রতি অলোকেশের ঔদার্য মর্মে গ্রহণ করলেন।

অলোকেশ চাইলে তার সাথে গল্পে মেতে উঠতে পারতেন। দু'চার মিনিটের খেজুরে আলাপ অন্তত হতে পারতো। কিন্তু শেলডনের উপন্যাসের একটা মারমার কাটকাট স্থানে তিনি অবস্থান করছেন। ভদ্রলোকের সাথে মামুলি আলাপচারিতা করলেও মনটা তার উপন্যাসে পড়ে আছে। তিনি চাইছেন, কফি শেষ করে ফারহান উঠে পড়ুন। তাকে পড়তে দিন। তাছাড়া এটা তার অফিস, ড্রয়িংরুম নয়। অনাহুত কারো জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা তার পক্ষে যুতসই বা সমীচীন নয়। কফি প্রায় শেষ। অলোকেশ ভাবছেন ফারহান এবার উঠবেন। প্রশংসা ও প্রতিদানের পালা শেষ। এরপরও আলাপ প্রলম্বিত করার বস্তুত কোনো কারণ নেই। পাতামুড়ে রাখা (ডগ্‌স আই, এটা ওর একটা বিশেষ বদভ্যেস) বইটা হাতে তুলে নেন। এটা এক রকম লাল-সংকেত। মানে এবার তুমি কেটে পড়ো হে ফারহান। তোমার জন্য বরাদ্দ সময়ঘণ্টি বেজে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোক তখন নতুন করে আলাপের উদ্যোগ নিলেন। অপাঙ্গে অলোকেশের হাতের বইখানা দেখে নিয়ে শেলডনের বিষয়ে তার জ্ঞানজাহির করতে

লাগলো। বিরক্তিকর হলেও অলোকেশ বাগড়া দেননি। বরং ফারহানের জানাশোনার পরিধি, গভীরতা ও বিষয়বৈচিত্র্যে তিনি কিছুটা হলেও আবিষ্ট।

কথা প্রসঙ্গে ফারহান জানান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন ডাকসাইটে আমলা তার নিকটাত্মীয়। সহজ করে বললে বলতে হয় বড়কুটুম। এমনভাবে ফারহান বললেন, যেন আমলা পর্যায়ের বড়কুটুম থাকা মামুলি কথা নয়, রীতিমতো ঈর্ষাজাগানিয়া ব্যাপার। অলোকেশও তার সাথে ঐকমত্যে থাকেন, কারণ আপাতত তিনি ফারহানের উপস্থিতি সংক্ষিপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি ইতোমধ্যে অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছেন। সত্যি বলতে, সিডনি শেলডনের লোমহর্ষক আখ্যান অলোকেশের মাথা থেকে প্রায় উধাও। তবে ভদ্রলোক বড়কুটুমের কথা বলায় অলোকেশ কেমন যেন সচকিত হলেন। এটা অনেকটা তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। কেউ ক্ষমতার খুঁটি উন্মুক্ত করা মানে, কিছু একটা অভিসন্ধি তার আছে। তবে দৃশ্যত এখানে কোনো লোভ বা লাভের সম্ভাবনা নেই। ফারহান এখনও অব্দি তেমন কোনো বিষয়ের অবতারণা করেননি।

একটু পরে ব্যাগেজ কাউন্টার থেকে ইন্সপেক্টর সালাম এসে খবর দেয় যে ফারহান সাহেবের ব্যাগেজ চেক সুসম্পন্ন হয়েছে। এনিথিং টু পে? আই মিন ট্যাক্সঅ্যাবল আইটেমস ইন মাই ব্যাগেজ? চোস্ত ইংলিশে জানতে চান ফারহান আহমেদ। ইন্সপেক্টর সালাম সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত অফিসার। চোস্ত ইংরেজিতে তার ঘাবড়ে যাবার কোনো কারণ নেই। সালাম মাথা নেড়ে বলল, নো স্যার। ইট্স ওকে। ইউ মে গো নাউ। ফারহান মনে হলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বিলিতি কায়দায় মৃদু শ্রাগ করে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার, থ্যাঙ্কস অ্যা লট। তিনি আরো যোগ করলেন, কাস্টমস ইজ ইমপ্রুভিং ট্রিমেন্ডাসলি নাউ-এ-ডেজ! উই আর হ্যাপি স্যার। পরের কথাটুকু স্পষ্টতই তিনি অলোকেশকে লক্ষ্য করে বললেন। অলোকেশ স্বভাবতই খুশি এবং আমুদে গোছের হাসলেন। তিনি বোধ হয় উঠবেন এবার। তার মালামাল চেক করা শেষ। অলোকেশ ইতোমধ্যে জেনেছেন, ভদ্রলোক টার্কি থেকে দুবাই হয়ে এসেছেন। যথেষ্ট লম্বা ভ্রমণ। জেটল্যাগ ধেয়ে আসছে নিশ্চয়ই। তাকে এবার উঠতেই হবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ফারহান আপাতত উঠছেন না। সালাম দিয়ে ইন্সপেক্টর সালাম অলোকেশের রুম থেকে বেরিয়ে গেল। তখনই তিনি খেয়াল করেন, ভদ্রলোকের সাথে একটা সাইডব্যাগ আছে। ফাইন রেক্সিনে তৈরি, কোনো রকম এলেবেলে জিনিস নয় বলেই অলোকেশের অনুমান। কারণ ফারহান সাহেব যে দরের লোক, তার সাথে সস্তার গিফেনস্টাফ্স থাকার কোনো কারণ নেই। আরো কিছুক্ষণ পরে উসখুস করেন অলোকেশ। তাকে এবার একটু যেতে হবে। বিশেষ একটা ভিআইপি মুভমেন্ট আছে। অলোকেশ নিজে উপস্থিত থাকতে চান। সারাপথ দিব্যি ঘুরেফিরে এলেও কিছু ভিআইপি প্যাসেঞ্জার ঢাকা পৌঁছামাত্র মরাঘোড়ার মতো কেতরে পড়ে যান। এয়ারপোর্ট ডিউটিতে এটা এক রকম হ্যাসেল হলেও অ্যাভয়েড করা যায় না। বলা যায় প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস। মেনে নিতেই হয়। এও প্রফেশনালিজম। অলোকেশের মনে হলো, ফারহান আহমেদও একটু আলাদা যত্নআত্তি চান। মানে কেউ যদি তার লাগেজগুলো অ্যারাইভাল লাউঞ্জ অব্দি এগিয়ে দেয়। অলোকেশ মনস্তাত্ত্বিক নন, তাও এটুকু বুঝতে বোধ হয় খুব বেশি মগজ ঢালতে হয় না।

অলোকেশ এখন আপদ বিদায় করতে চান। ভদ্রতারও একটা মাত্রা থাকে। বড়কুটুমের আঠায় টান ধরেছে। স্রেফ আমলা দিয়ে মামলা ঠাণ্ডা হবে না।

অলোকেশ কষা গলায় বললেন, ইউ নিড এনি হেল্প, মিস্টার ফারহান? নো স্যার। আমি বলছিলাম কফির কথা। ইউ হ্যাভ গট অ্যা ভেরি গুড ব্লেন্ড। ভেরি ট্রু টেস্ট। কলাম্বিয়ান লাত্তে নিশ্চয়ই ? নো, ইট্স জাস্ট মোক্কা! কোস্তা ব্রান্ড। এই মুহূর্তে ভদ্রতার মুখোশ এঁটে রাখা অলোকেশের জন্য অসম্ভব প্রায়। তাকে এবার সত্যি উঠতে হবে। ফারহান হাসলেন। ও আই সি। ভালো। ভেরি গুড ইনডিড। আই হ্যাভ সাম ট্রু কলাম্বিয়ান ব্লেন্ড। মে আই অফার সাম .....? ফারহান তার সাইডব্যাগখানা টেনে টেবিলের উপরে তুললেন। অলোকেশের অনুমতি বা অনুমোদনের তোয়াক্কা না করেই কফির কয়েকটা শ্যাচেল বা প্যাকেট বের করলেন। আহা হা ... এসব কী! নো নিড স্যার। আমি কোনো কফি চাই না। শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান অলোকেশ। নিন স্যার। খেয়ে দেখুন! ভালো লাগবে। ঠিকঠাক রোস্টেড পড্স। খাঁটি কলাম্বিয়ান। স্বরে গর্ব ধরে রেখে ফারহান বললেন। পড্স! বিন্স নয়! ভ্রু কোঁচকান জেসি অলোকেশ। তার কপালের ভাঁজে কৌটিল্যের ছোঁয়া। তবে তিনি তা মুখে প্রকাশ করলেন না।

ভদ্রলোকের এই অযাচিত চাপাচাপিতে কুণ্ঠিত অলোকেশের হঠাৎই একটা গল্প মনে পড়ে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন- সেই ঝাণ্ডুদার কথা। চুঙ্গিঘরে রসগোল্লা খেয়ে শুল্ক কর্মকর্তার পুরো আড়াই মিনিট বুঁদ হয়ে থাকার কথা ভেবে ফিক্ করে হেসে ফেললেন অলোকেশ। ব্যাটা তাকে রসলোভী ঝাণ্ডুদা পেয়েছে নাকি! কায়দা করে বেশুমার কফির লোভ দেখায়! মেঘ না চাইতে আইসক্রিমের মতো ডজনখানেক কফির প্যাকেট অলোকেশের টেবিলে রেখেই ঝট করে উঠে পড়লেন ফারহান আহমেদ। ভদ্রতার খাতিরে বা অন্যবিধ কারণে জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস অলোকেশ রয়ও উঠে এলেন তার পিছু পিছু। ভদ্রলোক দ্রুত ছুটছেন গ্রিনচ্যানেলের দিকে। যেন তার বেশ তাড়া। ছুটছেন অলোকেশও। অনেকটা চেজ করার মতো। ফারহানের ছোটার গতি বেশি। যেন গ্যালপিং। যাকে বলে ঘোড়ার গতি। ফলে পিছিয়ে পড়েন অলোকেশ।

ভাই একটু দাঁড়ান। 'আপনার কফির প্যাকেটগুলো নিয়ে যান', স্বরে বাড়তি তেজ মেখে নিয়ে অলোকেশ বললেন।
থামলেন ফরহাদ। মিষ্টি হেসে বললেন, কফি ফেরত নেব কেন! ওগুলো আপনার জন্য। ধরুন একজন সুলেখকের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।
তাই বলে কফি ? না না, নিয়ে যান এসব। লোকাল ব্র্যান্ড আমার পছন্দ। অলোকেশ ফের বললেন।
সে কি স্যার! এত ভালো মাল আপনি সচরাচর পাবেন না। নাইসলি ইনসাইজড পড্স। খাঁটি জিনিস। রেখে দিন।
কী বলল লোকটা ? ইনসাইজ্ড পড্স! ইনসাইজ মানে তো আলতো করে চেঁছে নেয়া। এর সাথে কফির কী সম্পর্ক! বিড়বিড় করেন অলোকেশ। মুহূর্তে তার মগজে ঝড় উঠলো। সামথিং ইজ ভেরি রং! তেজি গলায় অলোকেশ বললেন, থামুন ভাইসাব। আমার কথা শুনুন।

কিন্তু শিকার ততক্ষণে প্রায় হাতছাড়া। অলোকেশের কথায় মোটেও পাত্তা না দিয়ে ছুটছেন ফারহান আহমেদ। একটু জোরেই ছুটছেন তিনি। ততক্ষণে অলোকেশ যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন। শিকার পালাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে তিনি চেঁচালেন, সালাম, ডু ক্যাচ হিম। হি'জ অ্যা ক্রিমিনাল। সালাম মুখিয়ে ছিল। শুরু থেকেই লোকটাকে তার সুবিধের মনে হয়নি। অলোকেশ বলামাত্র ক্যাঁক করে চেপে ধরলো সালাম। হার্ডকোর ক্রিমিনাল ধরার খবর শুনে মৌমাছির মতো মিডিয়াকর্মীরা জুটে গেল। উন্নতমানের রেক্সিনে তৈরি ব্যাগের চেইন টানতেই থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়লো। ব্যাগের ভিতর রাখা কয়েকশ ফয়েল-পাউচ কেটে যা পাওয়া গেল, তা মোটেই কফি নয়, আফিম। আলাদা করে রাখা কয়েকটা পাউচে অবশ্য কফিই ছিল, অলোকেশকে বোকা বানাবার জন্য। মালসমেত হাতেনাতে ধরা খেল কৌশলী ড্রাগমাফিয়া ফারহান আহমেদ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অলোকেশ কেসটা টের পেলেন কী করে! দেখতে শুনতে রীতিমতো কেউকেটা ভদ্রলোক ফারহান, শিল্প-সাহিত্যে সমান পারঙ্গম, যে কিনা স্বেচ্ছায় 'অলোকেশ রয় নামক বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। যুতসই প্রশ্ন করেছ হে সালাম। তাহলে শোনো আমি বলছি- লোকটার চলনে শুরু থেকেই একরকম কেঁচোগামিতা ছিল। বেহুদা কেউ কারো পালে বাতাস ঢালবে না, এ তো জানা কথা। অথচ লোকটি কায়দা করে আমাকে প্রশংসার তেলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে জানতো, আমি লেখক। আর লেখকমাত্রই কমবেশি প্রশংসার কাঙাল। কিন্তু ও জানতো না, আমি শুধু লেখক নই, একজন পেশাদার শুল্কগোয়েন্দা। আমাকে দেশের কথা ভাবতে হয়! ওর বাটারিং (মানে তেলাতেলি) যখন মাত্রা ছাড়ালো, তখনই আমি সতর্ক হলুম। মানে ধরে নিলাম ফারহানের মনে কোনো মতলব আছে।

বাহ্ বাহ্! খাসা বুদ্ধি স্যার। পাশ থেকে একজন বাহবা দিল। কে না জানে, অথর্ব বসের পায়ে তৈলমর্দন মানেই ব্যক্তিত্বের পিণ্ডি চটকে মুফতে কিছু পাবার হীন ইচ্ছে। একটু থেমে অলোকেশ শুরু করলেন আবার- কফি আমি খাই, বেশ পছন্দও করি। আফিম খাই না, তবে বিলক্ষণ চিনি। ওতে এক রকম কষা-কটূ গন্ধ লেগে থাকে। সেটা আমার অচেনা নয়। ফারহানের গায়ে কিছু গন্ধ ছিল, অনেকটা আফিমটাইপ। স্রেফ গন্ধ শুঁকে বলে দিলেন সে ড্রাগমাফিয়া? জনতার যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। নট অ্যাট অল, মাই ফ্রেন্ডস। ও ধরাটা খেয়েছে ওর অতিচালাকির জন্য। ও যদি জোর করে আমাকে কফি খাওয়াতে না যেত, তাহলে হয়তো পালাতে পারতো। কারণ ফারহানের বিষয়ে আগাম কোনো সোর্স-ইনফরমেশন ছিল না। অতি চালাকিটা কী শুনি? মিঠেল হাসলেন দুঁদে জয়েন্ট কমিশনার অলোকেশ রয়। বললেন, লোকটা দুটো ভুল করেছে। দুটো শব্দ (অপ)প্রয়োগ করেছে যাতে ক্রমশ আমি নিশ্চিত হয়েছি যে ওর ব্যাগে কফি নয়, আফিম আছে। কী কী ? বুলেটের মতো প্রশ্নটা ছিটকে এলো অডিয়েন্সের দিক থেকে।
একবার বলেছে ওর কফিটা ভালো, কারণ 'ঠিকঠাক রোস্টেড পড্স' থেকে তৈরি। সন্দেহ হলো আমার। পড্স মানে জানেন তো! জনতার চোখে চোখ রাখেন অলোকেশ। হুজুগে জনতা খুব বেশি গভীর জ্ঞানের ধার ধারে না। ন্যাচারালি জনতা নিরুত্তর। এরা লাফাতে জানে, নাচতে নয়।

অলোকেশ নিজেই বললেন, পড্স মানে বীজ-বল্কল, কিছু কিছু গাছ যেমন সূর্যমুখী বা পপিগাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফারহানের মুখে পড্স শুনে আমার মনে খটকা লাগলো। ওর গায়ের গন্ধের সাথে কিছু একটা মিল খুঁজে পেলুম। কফি না হয়ে পপিফুল হতে পারে যা থেকে তৈরি হয় আফিম। পড্স কথাটা সেখানেই যুতসই। তাও সে হয়তো ফস্কে যেত। কারণ আমি তার তেলে তখন প্রায় হড়কাচ্ছিলাম। ও ব্যাটা তেলাতে জানে! শেষ ধরাটা খেল দ্বিতীয় শব্দটা বলে। সে বলল, এসব মাল সচরাচর পাবেন না স্যার। নাইসলি 'ইনসাইজ্ড পড্স'।

ব্যাস, ধরা খেয়ে গেল। বলতে নেই, আফিম বিষয়ে আমার কিছুটা পড়াশুনা ছিল। 'ইনসাইজ' মানে আলতো করে কেটে বা ছেঁটে নেয়া। যা কেবল পপিগাছ বা এই জাতীয় পড্স-এর ক্ষেত্রে যুতসই। 'ইনসাইজ' শব্দটি বলেই ব্যাটা ফারহান 'সাইজ' হয়ে গেল। আমার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও আর রইলো না। বুঝে গেলুম ওর ব্যাগভর্তি আফিমের পোটলা।
উপস্থিত সকলে অলোকেশের কথা শুনে হেসেকেশে একশা। এই না হলে কাস্টমস ইনটেলিজেন্স! হ্যাট্স অব টু ইউ স্যার। আপনি ছাড়া আর কেউ এমন ঘুঘু-মাফিয়াকে আপসে ধরতে পারতো না। মাফিয়ারা এবার কাম-ধান্ধা ছেড়ে নির্ঘাত কাশি যাবে। যাবেই।

- **অরুন কুমার বিশ্বাস,** প্রথম সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

Capacity Building as a Pre-requisite of IPR Enforcement

-Novera Moazzem Chowdhury

Intellectual Property Rights or IPR is a common and popular term for contemporary global world, (Islam, 2013, P. 1102). To get the essence of the meaning of IPR, three words needed to be underscored separately, 'Intellectual', 'Property' and 'Rights', Which denote the rights of a person over an intangible property that means, those cannot be visualized like other properties such as 'Lands', 'Apartments', 'Jewelries' or other valuables rather these properties are the creation of mind, created by musicians, authors, artists, inventors and cultural heritage or specialty of a particular place or service.

When world economy has been expanding in a tremendous speed Intellectual property Rights (IPR) has become crucial for economic, social and technical development of any country. Considering the reality most of the developed nations have already enacted these laws whereas developing countries are still in battle to enforce IPR efficiently, (Naznin, 2011).

Being a signatory of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement of the World Trade Organization (WTO), since 1 January, 1995 Bangladesh has been enjoying the extended transition period to bring herself into compliance with the rules of TRIPS, as an LDC country. She participated in the convention establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO) on May 11, 1985 and has become a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in 1991 and of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works in 1999, (Khondokar & Nowshin, 2013, p. 2)

As defined by the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement of WTO, Intellectual Property Rights (IPR) encompasses following 8 Rights:

1. Copyright and Related rights

Copyright covers literary works (such as novels, poems and plays), films, music, artistic works (e.g., drawings, paintings, photographs and sculptures) and architectural design. Rights related to copyright include those of performing artists in their performances, producers of phonograms in their recordings, and broadcasters in their radio and television programs.

2. Patent (Example: Patent of medicine)

A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application. This right is given for a certain period of time to the patent applicant. Protecting invention is the prime objective of patent.

Dhakai Jamdani & Hilsa Fish

3. Geographical Indication

Geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods and services and is indicated by a sign on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation due to that place of origin. It may be used for a wide variety of agricultural products and also highlight specific qualities of a product that are due to human factors found in the product's place of origin, such as specific manufacturing skills (WIPO, n. d., p. 15)

4. Industrial Design

An industrial design refers to the ornamental or aesthetic aspects of an article which consist of three-dimensional features, such as the shape or surface of an article, or two-dimensional features, such as patterns, lines or color.

Industrial designs are applied to a wide variety of industrial products and handicrafts: from technical and medical instruments to watches, jewellery and other luxury items; from house wares and electrical appliances to vehicles and architectural structures; from textile designs to leisure goods, (WIPO, n. d. p. 12)

5. Trademark

A trademark is a unique sign which distinguishes certain goods or services of one entrepreneur from those of the others. It is initiated from ancient times when craftsmen used to put their signatures as 'marks' on their own handmade artistic work or functional goods. With passage of time those 'marks' have evolved into today's 'Trademark' which is based on its specific characteristics, quality and uniqueness.

CHANEL

GUCCI

6. Plant Variation

7. Layout-designs (topographies) of integrated circuits

8. Protection of undisclosed information (Trade Secrets)

Counterfeiting
Counterfeiting relates to trademark infringement, (Mainwaring, 2013). A counterfeit is a product that is forged, copied or imitated without having the right to do so.

Counterfeit Motor Vehicle Parts

TRIPS Agreement provides minimum standards for protection and ensures enforcement for each of these eight types of Intellectual Property (IP), at the same time it has left the implementation strategy and trajectory as a responsibility of individual country, ("Factual overview", 2013, p.4). However being a member of WTO, Bangladesh is also obligated to enforce IPR successfully, (Naznin, 2011).
The Patents, Designs and Trademarks Act of 1883 are the earliest legislation found to protect IP in Bangladesh which signifies the inheritance of the legal framework on IPR dating back to the British-India but unfortunately the effective enforcement of these laws is still in question, (Naznin, 2011 p. 15).

Due to globalization both legitimate and prohibited trade volume has risen throughout the world. Nevertheless being the "crime of the 21st century", counterfeiting has become a source of cross border organized crime, (Ene&Mihaescu 2014, p. 57). This evolved worrying trend not only affecting the global economy but also the consumer confidence as well as their health and safety. As there is no conformity in terms of quality, discarding and annihilation of these products raises the risk to environment, (p 54).
In view of the enormous volume of prohibited trade, Kunio Mikuriya, Secretary General of WCO argued in his speech published in WCO Illicit Trade Report (2013),that strong internationally coordinated response is essential to come across illegitimate trade since the mordant lethal nature of this transnational crime not only troubles the economic growth and job creation but also challenges the rule of law, evades revenue as well as threatens human rights and quality of life.
Well noticeable, huge volume, low tech products for instance, toothpaste and chocolate with a famous brand name, baby food, are susceptible for counterfeiting.CDs, DVDs, auto and airplane parts, medicine which are expensive and high-tech products are not free from counterfeiting curse. Exclusive products like clothing, apparel, and perfume are at high risk too. By showing jagged bristles of fake Oral-B children's tooth brush as well as highly alkalised dove soap, Jackie Walton, manager of Intellectual Property Rights from Australian Customs, said counterfeit detection technique currently has become so complicated that even inside genuine packaging, Unilever's Dove and Beiersdorf's Nivea products, are available in fake form.She also addressed the deadly effect of counterfeit goods on public health (Han, 2014).
Pharmaceuticals which are the invention of rigorous R & D are also in a delicate position,

(Ene&Mihaescu 2014, p 56). Bangladesh has already achieved massive progress in the sector of pharmaceutical industry. After full filling local demand drugs have been exported to overseas too. Referring 'Business Monitor International' a report alleged that,by testing 5000 medicines, 300 or 6% has been revealed as counterfeit in Bangladesh. According to Public Health and Drug Testing Laboratory, most of these substandard drugs are potentially life-saving medicines and pose enormous risk to public health. Since pharmaceutical products and its industry is one of the most prospective industries in Bangladesh, the current situations relating to counterfeiting goods are critical which is very much alarming for 'Trademark' and 'Patent'.

Bangladesh is a densely populated country, due to various environmental issues lots of people have been suffering from Cardio Vascular diseases. As a corrective treatment different items like Pace Makers, Cardio Vascular rings and balloons to inflate the cardiac arteries are being used. If these life-saving items are counterfeit these will cause huge toll on human life which is obviously undesirable.

At present a large number of counterfeit or trademark infringed goods, entering from China and India through the porous borders of Bangladesh. Moreover a large number of counterfeit items have been imported, through international courier services too, (Khan, 2004). As the prices of genuine products are enormously high, non-affordability drives people to go for counterfeits even though they are unwilling to purchase those, (Khondokar & Nowshin, 2013, p. 17).

Since the current focus of Bangladesh Customs administration is only on securing government revenue, when tax is paid perfectly for legitimate trade, the Customs officers do not seize any goods. Moreover, they do not have adequate knowledge about trade mark or IPR related issues. Even they hardly have any knowledge to identify fake and genuine goods. They also do not know what measures are needed to be taken in case of suspected IPR infringement. In the venture of Intellectual Property Rights protection, Right Holders (Herein after RHs) are the immediate beneficiaries, so ultimately these are focused as private rights. However, in the border control provisions of the TRIPS Agreement it had already been foreseen that in intercepting a shipment of counterfeit and pirated products, RHs are the one who are supposed to apply to Customs authorities initially. RHs are undoubtedly the first persons to recognize and to validate counterfeit goods.

They suppose to guide Customs authorities in identifying genuine products by conducting trainings and also by providing the list of authorized dealers of their products as well as intelligence report regarding risk management,(Balkeny, 2005). In Australia'Trademark holders' have been invited regularly to educate Customs officers on how to distinguish fakes from genuine goods, (ACS, 2006, p. 12). This is also the main agenda of training sessions that held to share information as part of ongoing collaboration between Singapore Customs and RHs. Singapore Customs believe, these trainings enable Customs officers to become more alert and apprehensive for further inspection into consignments which are assumed to contain IPR infringing goods. The training session held for 50 Customs officers on 20 August 2015, covered some consumer and industrial as well as automotive products from brands such as: Canon, Chanel, Hypertherm and Schaeffler Group can be mentioned for instance. ("Working with Right Holders to Protect Intellectual Property", 2015).

Similarly in Cyprus to assist frontline Customs officials, training sessionsat regular interval, conducted by brand owners as well as, local and overseas. European authorities for identifying counterfeit goods along with acquainting contemporary strategies and trends of counterfeiters have enabled the Customs department to take leading role among Other Government Agencies (OGAs) in anti counterfeiting enforcement work, (Kyriakides, Siotou, Yardimci, & Whatstein, 2011). However, Japan Customs has been practicing this strategy for getting an IPR efficient work force too.

On the other hand, to secure the international supply chain, WCO has been arranging different training programs on IPR related capacity building and information sharing issues.ASEAN's initiative in enhancing administrative capacity of Customs and Police on IPR enforcement is an appreciable international effort. Roaming seminars with the concept of 'train the trainee' held in Bruinei Darussalam on 15-16 September 2014, addressing the holistic approach in tackling IP crime, ("Capacity building on IPR enforcement", ECAPIII).

In conclusion it can be said that 'Capacity Building' is the current need of Bangladesh Customs at present. For getting competent knowledgeable Customs officials to achieve a robust IPR enforcement force in Customs administration there is no other option but arranging regular training sessions with RHs, OGAs and International organizations. The lessons that had been revealed from other countries would be very much helpful to draw a roadmap for achieving the goal of effective IPR enforcement to encounterall sorts of IPR infringement and 'Trademark' infringement in particular.

References

- Australian Customs Service. (2006). Asia Pacific Economic Co-operation. Intellectual Property Rights (IPR) enforcement strategies. APEC Secretariat, Sub-Committee on Customs Procedures, ACS. 2006. Website: www.customs.gov.au, Retrieved from http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Intellectual-Property-Rights-Experts-Group/~/media/Files/Groups/IP/06_sccp_IPR_Strategies_Inventory.ashx

- Bangladesh carrying heavy counterfeit medicine burden. (2010, September 23). SECURING INDUSTRY, [Web post]. Retrieved from http://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/bangladesh-carrying-heavy-counterfeit-medicine-burden/s40/a588/#.VnTMSDZunOY

- Blakeney, M.(2005). Guidebook on enforcement of Intellectual Property Rights.Queen Mary Intellectual Property Research Institute Queen Mary, University of London. Retrieved fromhttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/april/tradoc_122641.pdf.

- Capacity building on IPR enforcement for administrative enforcement agencies in ASEAN. (2014). ECAP III, EU-ASEAN Project on the protection of Intellectual Property Rights. Retrieved from http://www.ecap3.org/activities/capacity-building-ipr-enforcement-administrative-enforcement-agencies-asean

- Ene, C., & Mihaescu, G. L. (2014). The fight against consumer goods counterfeiting. Economic Insights – Trends and Challenges, III (LXVI) (4/2014), 53 – 67. Retrieved from http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/2014-4/6.Ene_Mihaescu.pdf

- Factual overview on technical & financial co-operation for LDCs related to the TRIPS Agreement: Identifying and responding to individual priority needs of LDCs. (2013, May). Final Report. Swedish International Development Cooperation Agency Supplementary Contribution to the WTO Global Trust Fund. SANNA Consulting: Author. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ldc_overview_08.05.2013_full.pdf

- Han, E. (2014, October 6). Customs steps up war against counterfeits, seizing record number of fakes, The Sydney Morning Herald, political news. Retrieved from http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/customs-steps-up-war-against-counterfeits-seizing-record-number-of-fakes-20141005-10pz7s.html

- Illicit Trade Report. (2013). World Customs Organization (WCO). Retrieved from http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/june/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ILLICIT%202013%20-%20EN_LR2.ashx

- Islam, M. R. (2013). A study on Intellectual Property Rights Practice from the perspective of music industry in Bangladesh. The Experiment, 16 (1), 1102 – 1111

- Khan, M. F. H. (2004, September 30). IP administration and enforcement system towards modernization of IP protection in Bangladesh-and a comparative analysis of IP administration between Japan and Bangladesh. WIPO Fund-in-Trust/ Japan Research Fellowship Program, Tokyo Institute of Technology (TIT), Japan.

- Khondokar, B., & Nowshin, S. (2013). Developing National Intellectual Property Policy for Bangladesh, An assessment of national intellectual property system. Prepared for World Intellectual Property Organization, 1-3. Retrieved from http://dpdt.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dpdt.portal.gov.bd/policies/0b84dc51_4a40_4333_ab01_66b4be436e26/IP%20Policy.KS.pdf

- Kyriakides, R., Siotou, K. G., Yardimci, E. K., & Whatstein, L. (2011, January 15). Customs border measures around the Mediterranean, Part II, INTA Bulletin, The voice of the International

Trademark Association, 66(2). Retrieved from http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Customs%20Border%20Measures%20Around%20the%20Mediterranean2.aspx

- Mainwaring, K. (2013, April 23). Counterfeiting a growing problem. ITU, TSB. Retrieved from https://www.google.com.au/?gws_rd=ssl#q=what+is+counterfeit+definition+by+WIPO

- Mikuriya, K. (2005). Legal framework for Customs operations and enforcement issues. In L. D. Wulf & J. B. Sokol (Ed.), Customs Modernization Handbook (pp. 51 – 66). The World Bank, H Street, NW, Washington, D.C. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTEXPCOMNET/Resources/Customs_Modernization_Handbook.pdf

- Naznin, S. M. A. (2011, September-October). Protecting Intellectual Property Rights in Bangladesh: An overview. Bangladesh Research Publications Journal, 6 (1), 12-21, ISSN: 1998-2003. Retrieved from http://www.bdresearchpublications.com/admin/journal/upload/09251/09251.pdf

- WIPO Intellectual Property Handbook. (2004). WIPO Publication, No. 489 (E), ISBN 978-92-805-1291-5, 2nd Ed. Reprinted 2008. Retrieve from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

- WCO Illicit Trade Report. (2013). Retrieved from http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/june/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Activities%20and%20Programmes/Illicit%20Trade%20Report%202012/ILLICIT%202013%20-%20EN_LR2.ashx

- World Customs Organization (WCO). (n. d.). Customs capacity building strategy. Prepared by the World Customs Organization on behalf of the international Customs community. Retrieved from http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/overview/~/media/3C486A00F972488DB85F687EA0F551FB.ashx

- World Intellectual Property Organization (WIPO). (n. d.).Understanding copyright and related rights. WIPO Publication No. 909(E), ISBN 978-92-805-1265-6. Geneva, Switzerland.1-22. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf

- World Intellectual Property Organization (WIPO). (n. d.). What is Intellectual Property? WIPO Publication No. 450(E), ISBN 978-92-805-1555-0. Geneva, Switzerland. 1-23. Retrieved from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

- **Novera Moazzem Chowdhury,** 2nd Secretary, Customs (IPR), National Board of Revenue
She did her B. D. S. (CU BD); PGT in Prosthodontics (BSMMU).
MS in Public Administration (University of Canberra, Australia) and
MBA (Intellectual Property Rights) Aoyama Gakuin University, Tokyo, Japan

স্মা
র্ট
পে
ই
জ

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে আসা এবং উন্নত বিজ্ঞানমনস্ক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি আমরা। দেশের প্রতিটি সেক্টরে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ধাপে ধাপে ডিজিটাল হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ। অনেক কাজ এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগের নানা মাধ্যমে।

প্রতি সেকেন্ডে ২০০০০ মানুষের চিন্তা ভাবনায় মুখরিত অনলাইন সোস্যাল প্লাটফর্ম ফেসবুক। প্রতি মিনিটে নতুন পোস্ট আসে প্রায় ৩ মিলিয়ন। তথ্য বাতায়নে কোন সংবাদ ছড়িয়ে দিতে ফেসবুকের ভূমিকা অনন্য। শেয়ার, লাইক আর কমেন্টের ছড়াছড়ি কখনো কখনো কোন ঘটনাকে ফেসবুক থেকে মিডিয়ার পাতায়ও নিয়ে আসে। লাইমলাইটকে উদ্দেশ্য করে নয় বরং জনসচেতনতা আর জবাবদিহিতা জোরদার করতে শুল্ক গোয়েন্দাও তৎপর রয়েছে ফেসবুকে।

শুল্ক গোয়েন্দার গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ও আটকের তথ্য নিয়মিত আপডেট দেয়া হয় ফেসবুক পেইজটিতে। এসব পোস্টের মাধ্যমে জনগণ একদিকে যেমন শুল্ক ফাঁকির বিষয়টি জানতে পারছে তেমনি অপরাধীদের নিত্যনতুন কৌশল, শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধের প্রবণতাও বুঝতে পারছে। পাশাপাশি অপরাধীদের অভিনব কৌশলগুলোকে আমরা কিভাবে প্রতিহত করে রাজস্ব সুরক্ষা করি সে সম্পর্কেও ধারণা পাচ্ছে। রাজস্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর দেয়ারও চেষ্টা করা হয় পেইজটিতে। প্রতিটি নতুন অভিযানে আমরা এই পেইজের দর্শনার্থীদের শুভাকাঙ্ক্ষা তুলে নেই হৃদয়ে, কখনো বা হেসে কুটিকুটি, কখনো স্তম্ভিত হয়ে ভাবি কি জবাব দেব। পেইজটিতে বর্তমান লাইকারের সংখ্যা প্রায় তেতাল্লিশ হাজার।

ফেসবুক এখন সবার হাতের নাগালে। মুঠোয় এখন রাজস্বের মানুষজন। সহজেই করে নেয়া যায় অজস্র প্রশ্ন। উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে তথ্য বাতায়ন। আমরাও তাৎক্ষণিকভাবে পাচ্ছি তাদের প্রতিক্রিয়া। তেমনি কিছু প্রতিক্রিয়ার খন্ডচিত্র উঠে এসেছে এই অংশে।

- **ফেরদৌসী মাহবুব,** সহকারী পরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

Nurus Salehin আরে এডিসন তো ডিমে তা দিয়ে ছিল আর সে তো ডিম পেড়েই দিল এখন থেকে সোনার ডিমের হাঁসের গল্প না শুনিয়ে সোনার ডিম পাড়া মানুষের গল্প শুনাও
Like · Reply · 2 · May 22 at 4:42pm · Edited

Md Manik সেই ভদ্রলোকটি ধন্য দেশের জন্য স্বর্ণের" ডিম পেড়েছে....। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই শুল্ক গোয়েন্দাদেরকেও....।
Like · Reply · 1 · May 23 at 8:34am · Edited

Rafiql Islam ডিম পারা দুর্লব মানুষ টিকে মিরপুরে চিরিয়াখানায় রাখা হউক। তাতে নিরাপদে ডিমও পারবে অন্য দিকে মানুষ ওকে দেখতে যাবে তাতে অনক রাজাসসো বারবে।
Like · Reply · 1 · May 26 at 6:08pm

Ridwan Alam Congratulations to you guys..!!!!
Thanks for bringing new changes..!!!
In Sha Allah you guys will rock..!!!
Like · Reply · 1 · May 20 at 8:06pm

Shakil Ahmed Sabuj এইভাবে ডিম পাড়তে পারবি? Jon Ahmed
Like · Reply · May 25 at 11:29pm

Tamim Ahmed গত কয়েক বছরে যে পরিমানে গোল্ড জব্দ হল তা কি আমাদের দেশের কোষাধাক্ষে জমা হয়?
Like · Reply · 3 · May 20 at 6:35pm

Hide 12 Replies

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ Gold detained by Customs is deposited to Bangladesh Bank without any delay.
During the process all agencies work together to ensure transparency. Counting is done under Cctv monitoring. Bangladesh Bank later on disposes the seized gold as per their law. Thanks for question.
Like · Reply · 7 · May 20 at 7:53pm · Edited

Abdur Rahman Then government gifts it to their relatives. Thats digital bangladesh

Mishu Hassan Shahnewaz thaken dinajpur so mango niya KOTHA bolen n mango people ER moto thaken.unara customs, apnar mango garden ER mali Na.so mind ur language.
Like · Reply · 4 · May 26 at 2:18am

Farabi Rahman Shahnewaz Sunny Bhai. Apni boltesilen Bashundhorao jawar onader shahosh nai. Lol. 4ta gaari sieze hoye gelo last Sunday te. Ajaira kothar public apanara, desh ke pichaye rakhben ajeebon apnar moto manush.

...mid Bin Shahriar মান্দাতার আমলের গাড়ি রে ভাই এত খুসি হয়েন না। ভাল গাড়ি ধরতে ...লে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় যান দেখবেন গাড়ির বাহার
...ike · Reply · 16 · May 24 at 7:26pm

Shahnewaz Sunny O der baper sahos ache basundhora te jabar
Like · Reply · 1 · May 25 at 3:48am

Istiaque Ahmed Khan 2/1 ta gari dhoira amago dekhay 🙂 bujhen na ka??
Like · Reply · 2 · May 26 at 12:01am

Mishu Hassan Apnar problem kothay Bhai??? Unader jekhane icca jabe.n apnader ato shahosh so boshundhara jaiya dhoray den gari.dekhi apnader koto boro kolija ase.r oikhane Amon bhabe boltesen jeno chorai garir addakhana ase???

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ
http://www.banglanews24.com/.../%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6...

শুল্ক গোয়েন্দার প্রশংসায় 'মানবিক' | banglanews24.com

BANGLANEWS24.COM | BY স্টাফ করেসপন্ডেন্ট

Like · Reply

Rony Hasan Vlo kaj korle aro shathay thakbo jotodin beche thakbo.. R doa roilo true n jototuku para jay honest kaj korun...
Like · Reply · May 25 at 3:50pm

Samir Shah দশ টাকার গাড়িতে নয় লাখ টাকা ভ্যাট বসিয়ে রাখলে কিউট বাঙালী একটু তো শুল্ক ফাকি দেবেই
Like · Reply · ...31 at 4:49pm · Edited

Sumon Ali আমার বাপের টাকা আছে আমি লাক্সারি না ল্যান্ড ক্রুজার কিনি তোমাগো কি??? তোমাগো ট্যাক্স দিমু কে?
Like · Reply · May 31

Makid Hasan ১. মদ/মদ জাতীয় পানীয় : বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী নাগরিকদের জন্য মদ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আনলে কাস্টমস তা আটক করবে। বিদেশী পাসপোর্টধারী নাগরিক হলে ১ লিটার পর্যন্ত আনতে পারবেন। Injustices .... Bangladeshi der jonno alteast 500 ml allow kora uchit. onke shok kore boro bhai- bon er jonno antei pare 😐 pls eita bibechona kore dekben..
Like · Reply · June 10 at 2:28am

সাব্বির শাহ্ উচ্চ শুল্কের জনগনের ভোগান্তি.

Like · Reply · 1 · May 7 at 6:13am

Jacky William Gomez নিজের স্টেটাস বাড়াতে গিয়ে টেক্স না দিয়ে দামী গাড়ি আমদানি করল কিন্তু এখন যে ধরা খেলো এতে কি গাড়ির মালিকের স্টেটাস কমলো নাকি বাড়লো???

Like · Reply · 5 · May 7 at 1:50am

Minu Rahman Nayon Congratulations Customs intelligence

Like · Reply · May 12 at 11:03am

Ruhul Amin Carry on Bangladesh custom

Like · Reply · May 12 at 3:16pm

Ridwan Alam Well done brothers..!!!

Like · Reply · May 12 at 11:21am

Sohel Chowdhury Brilliant

Like · Reply · May 12 at 11:52am

Lutful Kabir Shaon Good job boys.. Keep up good work

Like · Reply · May 12 at 5:02pm

Ze San Page ta like na dile bujtamna, eto operation hoy desh e

Like · Reply · 5

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ Please invite your friends to like our page and help others create awareness. Thanks

Like · Reply · 2

Sumon Sani কোটি কোটি টাকা পাচার করার শাস্তি মাত্র চার বছর! তাও আবার কবে বিচার হবে ঠিক নেই, পরে কিছু টাকা দিয়ে জামিন। এরকম অপরাধে আরো গুরুতর সাজা এবং দ্রুত বিচার করা উচিৎ, না হলে অনেকে মানি লন্ডারিং এর মত অপরাধ করেও সামান্য দন্ডে পার পেয়ে যাবে তাও আবার ধরা পড়ার পরে। এবং তারা হিসাব করেই এমন দেশোদ্রোহীতা মূলক কাজ করবে।

Like · Reply · 1 · June 20 at 9:35am

Anower Zahid ওরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী দেয়না, ওরা সরকারকে আয়কর দেয়না অথচ চোরা পথে দেশীয় মুদ্রা বিদেশে পাচার করে বহাল তবিয়তে সসম্মানে দিনাতিপাত করছে আইন ওদের কাছে ভোতা। তাই বলা হয়ে থাকে,"বিচারের বানী নিভৃতে নিভৃতে কাঁদতেই থাকে" এই অব্যাবস্থার নিরসন হোক।

Like · Reply · June 22 at 12:09am

Nasir Mohsin আরো কত বোয়াল আছে,ধরা-ছোয়ার বাইরে। তাদেরকে শুল্ক গোয়েন্দা সংস্থা জেনে শুনে বুঝে গোপন রেখেছেন।

Like · Reply · June 20 at 10:46pm

Sadharon Kothok অর্থনৈতিক-জঙ্গিদেরকে ক্রসফায়ার করার ব্যবস্থা নেই? অর্থের জোরে মামলা হজম করে এরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

Like · Reply · June 20 at 1:26pm

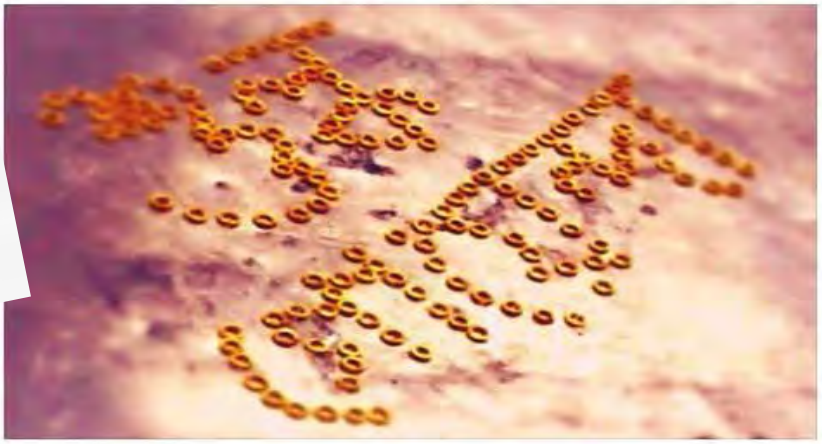

শুল্ক গোয়েন্দার সাম্প্রতিক দৃশ্যমান কাজে আপ্লুত হয়ে স্বর্ণখোচিত অংকনটি করেন একজন শুভানুধ্যায়ী। সবার সামনে অংকনটি তুলে ধরা হলো। শুভানুধ্যায়ীর নাম সাইফুল বাবু।

Tanvir Khan

Like · Reply · 1 · June 20

View 1 more reply

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ You are wrong . And it is wrong conception. Nobody has the guts to release the Detained cars without paying taxes .

Like · Reply · 3 · June 21

Masum Ahmed Sir please can u tell me about cigarate auction? buy... plz eeply me if possible.

Like · Reply · 14 hrs

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ We do not auction cigarettes, dear. These are generally destroyed. Thanks

Like · Reply · 4 hrs

View more replies

Sohel Arman যেসব সুশীল - চুশীল রা নেগেটিভ কমেন্ট করতেছেন তাদের জন্য --

ভালো কোনো কাজের প্রশংসা না করতে পারেন নেগেটিভ কমেন্ট কেন করেন ? কিছু সরকারী আমলা - সচিবদের স্বদিচ্ছার কারণেই এতো বড় অভিযান জালানো গেছে। ২৭ টন মদ আটক করা হইছে। আর আপনার কি মনে হয় যারা অবৈধ মদের ব্যবসা করে ওরা কম শক্তিশালী ? আমলা - সচিবরা চাইলে ওদের বাসায় ওরা ফ্রি মদ পাঠায় দিত , আটক করে খাওয়া লাগতোনা। অনুপ্রেরণা না দিতে পারেন দয়া করে খোচা দিতে আইসেন না ; যারা এইসব অভিযান চালায় তারা উপর কি পরিমান প্রেসার থাকে।

চোরাকারবারিদের শত কোটি কোটি টাকার পণ্য আটক করে অনেক সং কাস্টমস/শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জীবনের হুমকিতে আছেন। আপনার কি মনে হয় জীবনের হুমকি নিয়ে তারা এসব আটক করে বসদের ফ্রি খাওয়ানোর জন্য ?

মনে যা খুশি আসলো লিখে দেয়া সোজা; বাস্তব পরিস্থিতির সামনে পড়লে আপনাদের মতো সুশীল নাগরিকরা প্যান্ট ভিজায় ফেলতেন এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

Like · Reply · 5 · May 6 at 8:18pm

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ Thanks . Your comment makes us strong . We believe we can . But assistance requires from other part too . We can't change . Sorry for late reply . Thanks again .

Like · Reply · June 13 at 6:59pm

Mishu Hossan Good job.u guys are boss.1st time dekhlam morog o dim pare

Like · Reply · 5 · May 10 at 2:35pm

Moin Jashoree customs intelligence in action

Like · Reply · 1 · May 10 at 3:08pm

Lo Ko

Like · Reply · 4 · May 10 · Edited

Rajib Ahmed Jony অবৈধ চালান ধরতেও পটু, facebook এ status দিতেও পটু......চালাইয়া যান, আমাদের দোয়া ও শুভ কামনা রইল সাথে সাথে অনলাইনে জন্য
Like · Reply · 2 · June 5 at 8:26am
Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বা
Thanks
Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ
https://bangladesh24online.com/?p=64288
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দশটি স্বর্ণের ডিম পাড়লেন এক যাত্রী!
BANGLADESH24ONLINE.COM | BY BANGLADESH24O...
Like · Reply · 1 · June 10 at 12:28am
Shadman Tajwar Eder apnara khuje pan kemne??
Like · Reply · June 8 at 4:31pm
Nur A Asad Bappy
Like · Reply · 1 · June 9 at 2:43pm
Mizanur Rahman ভ্যাট যদি এত বেশি হয় তাহলে যে কেউ ফাঁকি দিতে চাইবে। ৮৩৩% কোন যুক্তিতে? অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল না। বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজার খানেক গাড়ি ঢুকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে। ট্যাক্স যদি একটা যৌক্তিক অংকের হত তাহলে কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দিত না। ৫.৫০ কোটি টাকা লাগে গাড়িটি দেশে আনতে তার মধ্যে ৪.৪০ কোটি টাকাই ট্যাক্স। আপনারা নিজেরাই চিন্তা করেন এটা কতটুকু অযৌক্তিক।
Like · Reply · 7 · June 7 at 2:11pm · Edited
Imran Siddique হা হা হা.....আগামী সরকার ত কএদিন পর সুন্দরি বউ বিয়া করলেও ট্যাক্স নিব......আসেন ভাই সবাই বাপ খাই আর সরকারের চোর কর্মচারিদের বেতন বারাই আমাদের দেওয়া কর দিয়া। কি মজা....
Rajib Ahmed Jony চোরাকারবারীরা দেখা যায় বিশাল চতুর, তার থেকে বড় সেয়াল আমাদের অফিসাররা !!!!!
Like · Reply · 8 · June 7 at 7:33pm
Shabnam Shishir এতো বুদ্ধি,মেধা, যদি অন্য কোন ভালো কাজে লাগাতো
Like · Reply · 2 · June 7 at 10:17pm
Hridoy Hasan Kam hoisellamar oi lokh ta ke dorkar,ami kisu golden egg dhar nimu onar kas theke
Like · Reply · 1 · June 7 at 12:34pm
Râbbý Khan Mobile, cigarett agula atok ar pore ki kora hoy ata janar onek issa.....
Like · Reply · 2 · June 11 at 4:04pm · Edited
View previous replies
Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ
Cigarette is destroyed
Like · Reply · June 12 at 10:15am
Rajib Ahmed Jony westin, radisson aei type hotel golor parking a intelligence lagaiaa diben....
Like · Reply · 1 · June 8 at 1:05pm
Samir Shah কেন তুই গাড়ি কিনতে পারিস না দেখে হিংসা হয়
Like · Reply · 5 · June 8 at 1:20pm
Amitesh Das Customs baire theke ki dekhe bujhe j ei loker rectum e kisu ase??
Like · Reply · 1 · May 10 at 3:37pm
1 Reply
Like · Reply · 6 · May 10 at 1:25pm
Shanti Chakma
Like · Reply · 1 · May 10 at 3:08pm
Samir Shah কি করবে কাস্টমস এর লোকজন, সরকারের টাকা চাই টাকা
Like · Reply · 1 · June 20 at 10:57pm
Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ Hahah ... Thanks . Nice humour,dear.
Fazle Rabby ভাই আমরে এক প্যাকেট দিয়া দেন.... হাহাহা
Like · Reply · 1 · June 23 at 12:20pm
Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ Next time please. Thanks
Like · Reply · 2 · June 23 at 9:34pm
উজ্জ্বল নক্ষত্র আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে অবশ্যই স্বাগত জানাই। আপনারা আইন বানান না একথা পুরোপুরি সত্য কিন্তু আপনারা চাইলে এর কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন। সরকার তার নিজের লাভের জন্য শুল্ক বাড়াচ্ছে আর আপনারা তা আদায় করার জন্য পাবলিক এর উপর অত্যাচার করছেন। আপনারা যদি এভাবে মুখ বুঝে সব মেনে নিতে থাকেন তাহলে কোনো এক সময় আমাদের ১০০০% শুল্ক দিতে হবে যে কোনো কিছু আমাদানি করতে হলে। আমাদের দেশ এভাবে দিনের পর দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে আর আপনারা যারা সরকারের উচ্চ মহলে আছেন তারা যদি আমাদের এভাবে হতাশ করেন তাহলে আমরা কোথায় যাবো বলতে পারেন>>>> দেশের স্বার্থে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে>>>> ধন্যবাদ আপনাদের

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ গ্রেফতার হবেন মুন?
http://www.bd-pratidin.com/entertainment/2016/04/19/139541
Like · Reply · April 20 at 12:39am · Edited

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ http://www.bd-pratidin.com/home/printnews/139541

গ্রেফতার হতে পারেন মডেল মুন, দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা | Bangladesh Pratidin
BD-PRATIDIN.COM
Like · Reply · April 20 at 12:00pm

Ami Abedin বাংলাদেশে যে কাস্টমস গোয়েন্দা আছে তা অনেকেই জানে না, আগে কাগজে কলমে ছিল
এখন একেবারেই দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।
Like · Reply · 4 · April 19 at 7:50pm

Mohammad Zakaria young blood can do.....
Like · Reply · 1 · April 19 at 8:19pm

Hasnat Rehman Apnader kache QS Shudu Gold Bar dhortesen & Poroshob koracchan dekchy but agular Next kno update r pai na like agulo Kothai jai or kichu .....2013 theke joto Bar atok korechen + Proshob koriyachen apnara agulo diya e to PADMA Bridge 2ta Kora jaito + Concrete ar replacement hishebe Gold Bar gulo e use kora jaito
Like · Reply · 8 · May 19 at 11:49am · Edited

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ These all gold bars are kept to Bangladesh Bank properly . To clear the conception , while counting the gold bars other government agencies work together . And it turns to money when govt require.
Like · Reply · 5 · May 19 at 12:40pm

Hasnat Rehman Thanks for ur kind information
Like · Reply · 2 · May 19 at 12:43pm

Syed Mukaddas Hossain Foysal Customs Intelligence showing the way to exercise the authority given to Bangladesh Customs under law. Applauding job done.
Like · Reply · 5 · March 25 at 12:43am

Ami Abedin ওয়েল ডান। কিন্তু আমার জানামতে এই রকম পরিচয়বিহিন প্রচুর লোক বিমানের গোডাউন ও কার্গো ভিলেজে যাতায়াত করে বা কাজ করে। ওয়াল বাই ওয়াল যদি চেক করেন তাহলে দেখবেন অধিকাংশের পরিচয় নাই বা তারা unauthorised পাবলিক। বৈধ পরিচয় পত্র নাই এই রকম লোক অনেক আছে।
Like · Reply · 1 · March 25 at 12:54am

Mohammad Zakaria Now no visitors can enter the airport. So how he entered??? where is Civil Aviation & new security team AVSAC!!!!

সরিষার ভূত আগে তাড়াতে হবে ।।।
Like · Reply · March 25 at 9:18pm

M Yakub Chowdhury No matter how much cunning smugglers are, customs intelligence can catch them. Congratulations to CI.
Like · Reply · August 23, 2015 at 4:12pm

Selim Raj Great!!!
Like · Reply · August 15, 2015 at 7:59pm

Kamrul Hasan customs er kahini sobai jane kader dhore kader dhorena 😀
Like · Reply · 2 · May 3 at 11:24am

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ এটি পুরানো ও একপেশে ধারণা। কাস্টমস এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এর মধ্যে অনেক সফলতা এসেছে। আরো আসবে। আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ দরকার।
Like · Reply · 8 · May 3 at 12:56pm

Kamrul Hasan Well,that's a good news for our country 😃 keep it up 🙂
Like · Reply · 2 · May 3 at 12:58pm

Foysal Azam কাস্টমসে আটকৃত মালগুলোর শেষ পরিনতি কি হয়?থিওরোটিকালি না প্র্যাক্টিক্যালি
Like · Reply · 2 · May 3 at 10:39am

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ আটক সোনা প্রথমে অস্থায়ী জমা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকে। এরপর বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে স্থায়ী জমা হয়। তখন এই স্বর্ণ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়। এর উপর সবার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বর্ণ আপনার ও আমার হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজসহ নানা উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হয়।
Like · Reply · 7 · May 3 at 3:01pm

Makid Hasan Sir car er upor tax komai den... eto tax impose korar ki dorkar ..?? Bangladesh er Road e sob BMW, Audi, Mercedes choluk na .. tate ki problm? polution kombe dhaka city er
Like · Reply · 24 · June 13 at 10:22pm · Edited

View previous replies

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ bhai , amra law make kori na , law palon kori . kombe ekdin . apnader dabi government shunbe ekdin.
Like · Reply · 12 · June 16 at 1:22pm

Al Amin Mahmud Ashraf Thanx a lot our proud officer.....
Like · Reply · April 3, 2015 at 7:33pm

Md Manik ধন্যবাদ" শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের "মাননিয়" মহাপরিচালক স্যার কে ও সকল অফিসার ওসকল ষ্টাফদের...।
Like · Reply · April 3, 2015 at 10:11am

Masud Rana Please clear your contact information. I think there is so many person who wants to give you the information about money laundering, but they are not getting proper address and procedures. Also sometimes informer is worried about his own safety. Thanks
Like · Reply · June 16 at 10:55am

Customs Intelligence, Bangladesh কাস্টমস গোয়েন্দা, বাংলাদেশ thank Mr.Masud Rana. please send message to our page. thanks again.
Like · Reply · June 16 at 1:16pm

The Prospective Side of Implementing VGM: A Customs Perspective

-Mokitul Hasan

On 10 February, 2016 the secretary-general of International Maritime Organization (IMO) issued a letter to notify all IMO members that the amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) as amended at its ninety-fourth session will enter into force on 01 July, 2016, in accordance with SOLAS article viii(b)(vii)(2). This means that from the fore mentioned date the shippers all around the world will have to undergo a mandatory container weight verification process which started its journey of formulation from 2009. The primary benefit as expected out of this endeavor is to have a safer transportation of shipping containers for exporting and importing purposes. However other concomitant benefits can emerge as windfall for customs administration in terms of protecting revenue and risk management.

Consequences of over loading of containers

The mis-declaration of container weights is instrumental in many of the capsized ships incident. Some of the more known incidents include MOL Comfort, capsized in June 2013, which suffered a crack in the middle of the ship due to overweight containers, the MSC Napoli, capsized in January, 2007, which had a weight that was 312 tonnes heavier than the cargo manifest. This issue has lost the shipping industry an estimated $130 million annually and has been an issue that has concerned many in the shipping industry for some time. Again, over loaded containers may impair container handling equipments at the port, cause damage to loading trucks. Besides financial losses, such incidents can incur perpetual environment disasters Over weight (and therefore mis-declared) containers also help unethical importers to evade customs duty.Taking the incidents and the corresponding losses in consideration. The World Shipping Council (WSC) and the International Chamber of Shipping (ICS) set out to change the rules to ensure safe movement of containers by sea.

The idea of implementing Verified Gross Mass (VGM) is primarily to avoid such situations but the implications can be far-reaching

Chronology of events towards a solution

In November, 2009, the WSC and ICS published “Safe Transport of Containers by Sea: Guideline of Best Practices”. This guide is a compilation of the good practices that are already undertaken by responsible companies within transport chain. This compilation later went to prove as the first step towards formulating the counter measures to prevent mis-declaration of container weight. In 2010, the WSC and the ICS issued a joint statement calling forth for an international solution to the problem with mis-declared container weights vis-à-vis the efforts those have been undertaken to date to address the issue. In 2011, the WSC, the ICS and the International Association of Ports and Harbors (IAPH) underscored the need to amend SOLAS convention to require verification of containers’ actual weights before stowing aboard a ship regulated by SOLAS. This proposal was placed before the IMO sub-committee on Dangerous goods, Solid cargoes and Containers (DSC), which was working on the solution of the same. On 2012, in its 17th meeting, DSC established a corresponding group, chaired by U.S. and in which WSC was a participant. The group was tasked with developing both specific amendments to SOLAS and formulating guidelines for the implementation of the compromise proposal for consideration at DSC’s next meeting in September, 2013. In its 18th meeting, DSC approved proposed changes to SOLAS and accompanying guidelines which was officially ratified by IMO’s Maritime Safety Committee (MSC 94) in November 21, 2014. Thus the new SOLAS requirement emerged which states a condition for vessel loading, the weight of a packed export container be verified by the shipper using either of the two permissible methods. It was also decided that, the new SOLAS container weight verification requirement will enter into force on July 1, 2016.

The basic statement of the amendment

The main provisions to the rules are:

- The shipper is responsible for obtaining and documenting the verified gross mass of a packed container.
- The verified gross mass must be communicated to the ship’s master or the shipping line’s terminal representative prior to loading on the ship.
- The communication should be signed by a duly authorized representative of the ship per.
- Packed containers will not be loaded on ships unless the verified mass is provided to the master.
- Estimating weight is not permitted
- Weighing equipment must be certified by the appropriate national government agency
- To accommodate potential deviations in method 2, the verified gross weight of a packed container should be accepted with a margin of ± 5 % of the total gross weight.

Methods for obtaining the verified gross mass of a packed container

There are two authorized methods for obtaining the verified gross mass:

- Method 1: Weighing the packed container as a whole
- Method 2: Weighing each item of cargo that will be packed into the container (ex: pallets, cartons, dunnage, packing and bracing material) and adding those weights to

the tare weight of the container.

- Method 2 is not to be used for bulk cargo (ex: bulk grain, scrap metal, etc.)

The weighing process for method 2

Calculation of the gross weight of the packed container, under Method 2, should follow the process below:

Step 1 – Weight of the cargo

- Adding the weight of each individual cargo items together. In the case of suitable bulk products the weight may be obtained from the production process.

Step 2 – Weight of the packaging

- The weight of the packaging is either obtained from the manufacturer of the packaging material or based on shippers' / forwarders' data

Step 3 – Weight of pallets, securing materials and dunnage

- The weight of pallets, packing materials, securing devices such as shoring poles and dunnage is obtained either from the manufacturer or based on shippers' / forwarders' data

Step 4 – Tare weight of the empty container

- The carrier should provide the correct tare weight of the empty container timely for the shipper to be able to include this in the gross weight calculation of a container. In the absence of this information, the shipper should use the tare weight indicated on the container or any specific information provided by the carrier.
- The posted tare weight on the container is also acceptable.

Step 5 – Gross weight of the packed container

- The weights obtained in steps 1 to 4 above are added together to get the gross mass of the packed container.

Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo

on 9 June, 2014 IMO has issued a guideline to establish a common approach for the implementing and enforcement of the SOLAS requirement regarding the verification of the gross mass of packed containers. Based on the extracts of these guidelines , all IMO members are advised to formulate the guideline annexed and bring it to the

attention of all parties concerned.
While constructing national guideline the following facts, inter alia, can be taken into considerations-

- It should be kept in mind that implementation of the amendment should not result in additional paper work or greater compliance cost, nor lead to congestion at the port/terminal.

- Again, the use of electronic means to communicate information regarding the gross mass of the containers, so that transaction costs could be minimized and ease of doing business could improve. Therefore, consultation with stakeholders is of utter importance.

- The verification of gross mass of the container shall be carried out at a location away from port/terminal to avoid congestion at the port/terminal area.

- To avoid forgery or duplication, shipper should be compelled to upload the information about VGM of container on a dedicated secure website that can be accessed by all concerned entities.

- Container owners not marking the correct tare weight on the container or shippers defaulting in the declaration of the verified gross mass of containers must strongly penalized.

Significance of a weight of container from customs viewpoint

Every customs official recognizes the importance of declaring proper weight of a container. Of course, the off hand objective is to ensure proper revenue as in case of many items, the statistical unit is “kg”. However, the weight of a container can also act as a yard stick to measure the accuracy of other declarations like area (square meter), number of packages, CBM, value etc. For instance, an import item as frequent as tiles (hs code 6908.90.00) of size 300mmx300mm, the standard gross weight has been observed to be 23.5 ton (20’ FCL) and a container of 23.5 ton should contain around 1500m2 of tiles corresponding to 21 CBM. Likewise, the standard weight for tiles of size 600mm x 600mm has been observed to be 26.5-27 ton corresponding to around 1350 m2 of tiles. Such empirical rules can be applied for granite slabs, praying rugs, carpets, tyre cord, padlocks etc. once the weight has been properly declared (these items has been chosen because very insignificant or no packing material is used while items are stuffed in container. Therefore, the gross weight can be considered as net weight). Again, a heavier sealed lead acid battery must have more Ampere-hour (because of the presence of more plates of lead) than a lighter one thus creating a significant difference in value. Moreover, having proper weight declared for a container is also a very effective tool for verification of the accuracy of tariff and commercial declaration. A 20’ FCL container with 26-28 CBM should not have more than 08 ton of cotton yarn. If the declared weight surpasses this weight by a good margin, then the actual goods can be something else in lieu of cotton yarn.

Implementation of VGM is an opportunity for the customs

It is evident that a verified gross mass database of packed containers can be of great use to customs administration. But the point is, to what extent customs authority can have access to this database? Of course SOLAS does not regulate Customs matters and the process is expected to be carried on by Ministry of Shipping of the regulating country. The only way customs authority can gain access to this wealth of resource is by including the provision to national customs legislation. Keeping this fact in mind, India while drafting “the guidelines for implementing amendments to regulation 2 of chapter –vi of the SOLAS convention” categorically states in paragraph 25 that, “the dedicated secure website shall provide without any cost, the information regarding gross mass of containers and other relevant information to all Government Authorities like ….Customs & Central Excise Department.” Another point can be taken into consideration to rip off maximum benefit out of this database that while using method -2 to obtain VGM, the confirmation of using proper packaging code can be made a mandatory field in the corresponding report. Needless to say, The importance of using correct packaging code cannot be overstated. It provides insight on product characteristics such as the common name, list of key ingredients, grade/quality, compliance of health/safety standards etc. The use of packaging code can be regulated in accordance with recommendation 21 adopted by the "Working Party on Facilitation of International Trade Procedures" in Geneva on August, 1994.

Conclusion

Modern customs has transformed from the idea of "stop everything, let something go" to "stop something, let everything go" approach. Effective tools of modern customs management like risk management, post clearance audit, authorized economic operator, non intrusive inspection have been instrumental to this transformation. The success of these tools depends on optimizing the risk factors among which proper declaration of weight is of utter most importance. The implementation of VGM has provided customs administration with a great chance to minimize this risk factor. With a view to cash in on this opportunity it can be made a legal compulsion to provide customs authority with the access to VGM database and make some necessary incorporations to every VGM report of container so that along with other international community's customs can also be a "symbolic" entity.

*view's expressed here are writer's own

References

Capt. K.P. Jayakumar, Deputy Nautical Adviser to the Govt. of India.(2016). Guidelines for implementing amendments to Regulation 2 of chapter-vi of the SOLAS Convention entering into force with effect from 01st July, 2016 concerning verified gross mass of the container-reg.(final draft).6

World Shipping Council.(2015).VGM-Industry FAQS.4

International Maritime Organization.(2014).Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo.3

Secretary General, International Maritime Organization.(2016).Verification of the gross mass of packed containers-amendments to SOLAS regulation vi/2.(3624)1-2

- **Mokitul Hasan,** Assistant Commissioner, Customs Excise and VAT Commissionerate, Comilla

MAERSK
MAERSK
MAERSK

মার্সিডিজ তরুণীর খোঁজে

- প্রভাত কুমার সিংহ

০৮-০৪-২০১৬ খ্রিঃ। বিকাল ৪-৩০ ঘটিকা।
হঠাৎ করে ডিজি মহোদয়ের মোবাইল নম্বর থেকে একটি ছোট বার্তা।
সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারে। খানিকটা কৌতূহল, আংশিক ভয়। বাকিটা রোমাঞ্চকর।
ছোট বার্তায় একটি ঠিকানা ও গাড়ির গ্যারেজ নম্বর।
মুহূর্তেই মগজে একটি ঢেউ খেলে গেল। কলিংবেল বাজার সাথে সাথেই চৌকস 'শুল্ক গোয়েন্দা দল' হাজির।
'তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হন'।
'ওয়াকিটকি রেডি করেন'।
'স্যার, পুলিশকে জানাবেন?' প্রশ্ন করেন একজন।
'এখনি না। আগে লোকেশন ট্রেক করেন। গাড়িটি আছে কি না দেখেন। চলেন যাই'।
গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়ার সাথে সাথে টিমের সকলেই ফিসফিস শুরু করেছে।
'স্যার, গাড়িটি কী মডেলের? কত টাকা শুল্ক ফাঁকি আছে? গাড়িটি আছে তো সেখানে'?
'স্যার, গাড়ির মালিককে কি আটক করবেন'? প্রশ্ন করে গাড়ির ভেতরের সবাই।
' আরে বাবা, চুপ করেন। আল্লাহর নাম ডাকেন। গাড়ি ওখানে না থাকলে ডিজি স্যার বারোটা বাজিয়ে দিবেন।'

বিকাল ৫ টা।
বি এম টাওয়ার।
সুন্দর একটি বার তলা বিশি' ভবন।
গাড়ি গেটের সাথে থামতেই সিকিউরিটি সতর্ক দৃ'িতে উঠে দাঁড়ায়।
'স্যার, কাকে চান'? সিকিউরিটি বলে।
'আমরা একটি কোম্পানির লোক। এই বিল্ডিংএ একটি দামি গাড়ি বিক্রি হবে। আমাদের সাথে আলাপ হয়েছে মালিকের। গাড়িটি দেখে পছন্দ হলে কিনব' আমার এক কর্মকর্তা খানিকটা ধমকের সুরে উত্তর দেন। সন্দেহের চোখে তাকায় সিকিউরিটি।
'একটু অপেক্ষা করেন'। সিকিউরিটি বলেন।
'হায়দার ভাই, দেখেন তো ওনারা কী বলেন'। সিকিউরিটি মহোদয় একটু দূরে বসা আরেকজন সিকিউরিটিকে প্রশ্নটি করেন।
ইউনিফর্ম পরা ভদ্রলোক হায়দার সাহেব আমাদের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকান। তার চাহনীতে মনে হলো যেন আমরা অনেক বড় অপরাধ করেছি এই রকমের ।
'হায়দার সাহেব গেটটা খোলেন, একটু কথা বলবো। এভাবে তো কথা বলা যায় না' আমি বলি।
'গেট খোলেন হায়দার সাহেব। চোখে সন্দেহ ও ভয়।
' আচ্ছা, হায়দার সাহেব, এখানে বি-৩ গাড়ির পার্কিং কোথায়। আমাদের যে গাড়িটা কেনার কথা ওটা ওখানে কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে'। আমি বলি।
নিমিষেই হায়দার সাহেবের আতিথেয়তা উবে গেল। কঠোর একটা চোখের ভাষা। চোখ দিয়ে একেবারে পিষে ফেলবে।
'গাড়ির পার্কিং সব ওপর তলায়, আপনারা দেখেন,' হায়দার সাহেব উত্তর দেন।
ইতোমধ্যে দলের গোয়েন্দা সদস্যগণ গ্যারেজের সকল গাড়ি দেখে ফেলেছে। ফিরে এসেছে হতাশায়। তাদের দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় আন্ডার গ্রাউন্ডে খোঁজতে বললাম। বিষয়টি তাদের মাথায় আসেনি যে নিচতলায় গাড়ি পার্কিং করা থাকতে পারে। ওরা সবাই নিচতলায় গেল।
'আচ্ছা, হায়দার সাহেব, এ বিল্ডিং এর মালিক কয়জন? আপনার কয়টা বাচ্চা? কোথায় থাকেন?' আমি প্রশ্ন করি হায়দারকে যাতে নীচতলায় গাড়িগুলো ইতোমধ্যে দেখে আসতে পারে।
হায়দার সাহেব আমতা আমতা করেন। এদিকে সেদিকে তাকান। ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠছি।'গাড়িটি আছে তো'?
হায়দার সাহেবের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। এদিকে হাঁটেন আবার ওদিকে হাঁটেন। কিছুক্ষণ পর পর ইন্টারকমে রিং দেন। ওপর থেকে কেউ ধরে না। আঁড় চোখে আমার দিকে তাকায়। হায়দার সাহেবের চোখে চোখ পড়ার সাথে আমি দাঁতগুলো বের করে হাসি।

হায়দার সাহেবের আমার হাসি ভালো লাগে না তা প্রকাশ পায়।
নিচতলার গাড়ি পার্কিংর সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছি। উৎকণ্ঠিত। রোমাঞ্চিত।
১০.. ৯.. ৮.. ৭.. ৬.. ৫.. ৪.. ৩.. ২.. ১... গুনতে থাকি।
দলের লোকেরা একজন একজন করে উপরে আসছে।
চোখের ভাষায় কথা বলছে।
তাদের দৃ'ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সব ঠিক আছে।
'হায়দার সাহেব ঠিক আছে, ভালো থাকেন। আবার দেখা হতে পারে'।
হায়দার সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। আমরাও ফেলি।
উচ্ছ্বাসিত রোমাঞ্চ নিয়ে ডিজি মহোদয়কে ফোন করি।
'স্যার, সব ঠিক আছে'।
'ঠিক আছে, চলে আসো'। ডিজি মহোদয় কে জানাল।

রাত ১১:৩০ বাজে আইপিএল খেলার চরম উত্তেজনা। ডিজি মহোদয়ের একটি ছোট বার্তা IPL এর উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে গেল।
'কালকেই গাড়িটি আটক করবে, সব লোক প্রস্তুত রেখ'।
উত্তর লিখে পাঠাই 'জি স্যার'।
দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে প্রথমে সকালেই ঐ বাড়ির সামনে সিপাহী পাঠিয়ে নজর রাখতে বলি।
মনে একটু উসখুস করতে থাকে। হায়দার সাহেবের তাকানো দৃ'ি ভালো লাগেনি। শকুনের চোখ। যদি গাড়ির মালিককে বলে দেয় তাহলে গাড়িটি ওখানে আর রাখবে না। রাতেই সরিয়ে ফেলবে। যে গাড়ি এতদিন শুল্ক ফাঁকি দিয়ে রেখেছে সে আর যাই হোক বোকা না নিশ্চয়।
'কি বোকার মতো কাজ করলাম'। বিড় বিড় করে নিজেকে গালি দেই। ঔ গেটের বাহিরে একজনকে নজরদারি করতে বললে ভালো হতো। ডিজি মহোদয় না বললেও স্টেশন ইনচার্জ হিসেবে আমার সেই কাজটা করা উচিত ছিল।
'সালাম স্যার, জ্বি স্যার, জ্বি- জ্বি'। ডিজি মহোদয় ফোনের ওপাশ থেকে কথা বলেন।
'তুমি কি একা ঐ কাজটা করতে পারবে, নাকি ঢাকা থেকে অফিসার পাঠাবো'?
বসের এ প্রশ্নে হ্যাঁ বা না কোনোটাই বলা যায় না। মাঝখানে অবস্থান নিতে হয়। সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে হয়। হ্যাঁ বললে অতি পাকনামি আর যদি ঠিকমত কাজটা করতে না পারি তাহলে তো জবাবদিহি করতে হবে। আর না বললে আপনি Capable না, Incompetent শুনতে হতে পারে।
'স্যার, মনে হয় পারব। তারপরও আপনি যদি বলেন, তাহলে একজন ভালো অফিসার সকালের ফ্লাইটে পাঠালে ভালো হয়। আমাদের টিমের সংখ্যা বেশি নয়। যদি ঢাকা থেকে একজন অফিসার আসে, তাহলে আটকসংক্রান্ত কাজগুলো করতে সুবিধা হয়'।
'আচ্ছা, শোনো, আমি একজন সহকারী পরিচালক ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা আরিফকে সকালে পাঠিয়ে দিচ্ছি'।
'জ্বি স্যার'।
'সাবধান, Be careful । এ ধরনের কাজ Successfully করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি পুলিশ কমিশনার ও র‍্যাবের CEO কে বলে দিচ্ছি। যদি সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদের সাথে কথা বলে নিও'।
'জ্বি স্যার'।
'আচ্ছা, শোনো সহকারী পরিচালককে পাঠানোর প্রয়োজন মনে হয় নেই। শুধু আরিফকে পাঠাচ্ছি। হবে না'?
'জ্বি স্যার, হবে। জ্বি স্যার'।
হ্যাঁ বা না বলার সুযোগ নেই। কেউ আসুক বা না আসুক কাজটা সুন্দরভাবে ঝামেলা ছাড়াই করতে হবে।
'ঠিক আছে, সবাইকে রেডি রাখ। সাবধানে কাজটা কর। সব সময় যোগাযোগ রাখবে'।

'জ্বি স্যার, অবশ্যই'।

০৯/০৪/২০১৬ খ্রিঃ
সকাল ৮ টা।
অফিসের সকলের চোখে আলোর রেখা।
কৌতূহলী চোখ।
আত্মবিশ্বাস।
অফিসের অস্থায়ী এমএলএসএস জয়নাল সকালে এসেই অফিস পরিষ্কার করে ফেলেছে। লুঙ্গি পরা জয়নালকে না দেখে আমি একটু অবাক হলাম। অফিসের একজনের প্যান্ট পড়েছে আজ।
'সবার পোশাক আছে তো, আরিফ সাহেব'?
সকালে দুইজনকে ঐ বাসায় পাঠিয়েছেন?
আরিফ সাহেব 'হ্যাঁ' বোধক উত্তর দেন।
'চিঠিগুলো তৈরি করে ফেলেন। পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের পুলিশ ফোর্স প্রদানের সহায়তা চেয়ে চিঠি প্রস্তুত করেন। কাস্টমস আইনের তল্লাশি পরোয়ানা চিঠি তৈরি করেন। আটক তালিকার কপি ঠিক করেন'।
আরিফ সাহেব 'হ্যাঁ' বোধক উত্তর দিয়ে কম্পিউটারের কি বোর্ডে লিখতে শুরু করেন।
'আজকে একটু ভালো নাস্তা খাওয়া যায়। কি বলেন এস আই সাহেব! যান, একটু ভালো নাস্তা নিয়ে আসেন সবার জন্য। দুপুরে বা রাতে খাবার সময় হয় কি না সন্দেহ আছে', আমি বলি।
হালকা করে গোঁফে তা দিয়ে এস আই আবুল কালাম আজাদ অফিসের বাইরে বেরিয়ে যান।

সকাল ১১ টা।
সিপাই বদর উদ্দিন পুলিশ প্রশাসনে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার সাথে সাথেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাউস সাহেব তার টহল টিম পাঠিয়ে দিয়েছেন।
ফরহাদ সাহেব। পুলিশের এস আই। তার টহল টিম নিয়ে হাজির। ফরহাদ সাহেবকে দেখে মনে হলো অনেক দিনের পরিচিত। যখন কাউকে প্রথম দেখায় অনেক দিনের পরিচিত মনে হয়, তার সাথে আনন্দের সাথে কাজ করা যায়। টিমের সবাই প্রস্তুত। ফরহাদ সাহেবকে একটু পেছনে থাকতে বলি। আমরা গাড়িতে করে আস্তে আস্তে এগোই। ইতোমধ্যে কয়েকজন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সাংবাদিক বন্ধুরা চলে এসেছেন।
শুল্ক গোয়েন্দা সিলেটে কারো বাসায় গিয়ে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া গাড়ি আটক করবে এটাই প্রথম। তাই সবাই একটু বেশি উৎসাহিত।

বি এম টাওয়ার।
হায়দার সাহেব গত কালকের মতো তার চেয়ারে আরামে বসে আয়েশ করছেন। আমাদের দেখামাত্র উঠে দাঁড়ায় সামনে। এগিয়ে আমরা পরিচয় দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি।
'হায়দার সাহেব, এই তল্লাশি পত্রটা আপনি গ্রহণ করে বি-৩ পার্কিংয়ের গাড়ির মালিকের নিকট দিবেন এবং ওনাকে নিচে নামতে বলেন'।
'মালিক তো নাই, বাসায় কেউ নাই', ধূর্ত হায়দার আস্তে করে বলেন।
'কালকে আপনি সহযোগিতা করেননি। আজকে ঝামেলা করলে আপনাকে থানায় নিয়ে যাব। যা বলছি, করেন', হায়দার সাহেবকে ধমকের সুরে বলি।
'হায়দার সাহেব, একটু বিচলিত। হতভম্ব! কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিক সেদিক হাঁটতে থাকেন। ইন্টারকমে রিং দিতে থাকেন। কেউ ও প্রান্ত থেকে ধরে না'।
'এই মিয়া ওনি যা বলছেন, শুনেন না কেন? যান গাড়ির মালিককে ডাকেন', ফরহাদ সাহেব ধমক দেন।

‘আচ্ছা, এ ভবনের ম্যানেজারের নাম্বার দেন’। হায়দার সাহেব আমতা আমতা করে তার কাছে ম্যানেজারের নাম্বার নেই বলেন। ফরহাদ সাহেব থানায় নিয়ে পেটানোর কথা বলতেই হায়দার সাহেব বিল্ডিংয়ের ম্যানেজারের মোবাইল নাম্বার দেওয়ার জন্য তার মোবাইলটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিল।

‘দাদা, নিচে গাড়ি তো নাই। নিয়ে গেছে। সরিয়ে ফেলেছে। এখন কি করবেন’? একজন সাংবাদিক ইতোমধ্যে নিচ তলার গাড়ির পার্কিং ঘুরে চলে এসেছেন।

‘কি বলেন, ভাই। নাই’? আমি বিচলিত এবং চমকে উঠি।

‘কি যে হবে, আজ কপালে’ মনে মনে বলি। ‘ সমস্যা নাই, ওখানে যে গাড়ি কালকে ছিল তার ছবি আমাদের কাছে আছে। গাড়ির মালিককে আমাদের নিকট হস্তান্তর করতে হবে’। দৃঢ় কণ্ঠে সাংবাদিক বন্ধুকে উত্তর দেই, যদিও মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। যদি গাড়ি না পাওয়া যায় তা হলে অভিযান ব্যর্থ।

আশাবাদী আমি হায়দার সাহেবকে ধমক দিয়ে চিঠিটি গাড়ির মালিককে দিতে বলে সবাইকে নিয়ে নিচতলার গাড়ির পার্কিং এর দিকে রওনা দেই।

‘স্যার, গতকাল গাড়িটি এখানে ছিল। এই দেখেন মোবাইলে তোলা ছবি’

‘এই দেখেন, গাড়ির চাকার ছাপ’।

গাড়িটা যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তার ছাপ ফ্লোরে বিদ্যমান। কিন্তু গাড়িটা নেই সেখানে এটাই হলো বড় কথা । রাতের ভাবনার সাথে ঘটনা মিলে যাওয়ার নিজের ওপর রাগ হয়।

‘আচ্ছা, চলেন তো পার্কিংয়ের অন্য গাড়িগুলো দেখি’ হতাশ কণ্ঠে বলি।

নিচ তলার পার্কিংয়ের সকল গাড়ি দেখা শেষ। গাড়িটা নেই। হতাশ ও বিচলিত।

‘এবার বাজে অ্যাকশন নিতে হবে’ বিড়বিড় করে নিজেকে বলি।

‘হায়দার সাহেব, গাড়িটা কোথায় আছে বলেন, না হলে আপনাকে এরেস্ট করে থানায় দেওয়া হবে। আপনি জানেন গাড়িটা কত টাকা শুল্ক ফাঁকি দেওয়া আছে’ হায়দার সাহেবকে ধমক দেই।

সকলকে নিয়ে আবার উপরে উঠে যাই।

‘গাড়িটা যে ওখানে ছিল আপনি তা কালকে দেখেছেন, হায়দার সাহেব?’

‘হায়দার সাহেব হ্যাঁ উত্তর দেয়’।

‘আপনাদের বিল্ডিং এ সিসি ক্যামেরা আছে’?

‘জ্বি স্যার’ হায়দার সাহেব বলেন।

‘চলেন সিসি ক্যামরা দেখি’।

‘সিসি ক্যামরার রুমের চাবি ম্যানেজারের কাছে আছে স্যার,’ হায়দার সাহেব উত্তর দেন।

এবার মেজাজটা চটে যায়। মনে মনে বলি তারা জেনেই কাজটা করেছে। ‘ম্যানেজারকে ডাকেন, না হলে রুমের তালা ভাঙবো’।

‘এই নেন স্যার, চাবি, আমার কাছে অতিরিক্ত একটি চাবি আছে’।

সিসি ক্যামেরার রুমে রাখা Hard Disk-এ দেখা গেল যে কোনো Data Storage হচ্ছে না। খিটখিটে মেজাজটা আবার চটে গেল। মনে হলো ইচ্ছে করেই সিসি ক্যামেরার কোনো রের্কড রাখছে না।

ফরহাদ সাহেব বলেন,‘ স্যার চলেন, ওদের বাসায় যাই এবং জিজ্ঞাসাবাদ করি’।

পুলিশ ও সাংবাদিক বন্ধুদের নিয়ে গাড়ির মালিকের ফ্লাটে যাই। বাসায় গিয়ে তল্লাশি পরোয়ানাটা বাসার লোকজনদের নিকট দেই।

‘স্যার, আমরা সবাই মেহমান। আমরা কিছুই জানি না। আসেন বাসায় এসে দেখেন কেউ নেই’। একজন ত্রিশোর্ধ্ব মহিলা বলেন।

‘বাড়ির মালিক কোথায়? ম্যাডাম কোথায়?’

‘স্যার, মালিক কালকে লন্ডনে চলে গেছেন। ভাবী, বাচ্চাদের নিয়ে বাহিরে গেছেন। আজকে আর আসবেন না’। তাদের একজন ভয়ার্ত স্বরে উত্তর দেন।

ফরহাদ সাহেব ধমক দেন 'ফাজলামি করেন। আপনাদের সকলকে ধরে নেওয়া হবে। সত্য কথা বলেন বাড়ির মালিক কোথায়'?
'মহিলা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেন, আল্লাহর কসম জানি না, স্যার। দেখেন, বাসায় দেখেন। ওয়ারড্রবে দেখেন। বারান্দায় দেখেন'।
অনিচ্ছাকৃতভাবে পুরো বাসাটা তল্লাশি চালাই। কিছুই নেই। অনন্ত গাড়িটা তো বার তলায় রাখবে না।
'আপনার বাসার মালিক ও ম্যাডামকে বলবেন গাড়িটা ফেরত দিতে, না হলে তাদের আটক করা হবে। একজন কর্মকর্তা ভয় দেখায়'।
হায়দারকে আবার ধমক দেয়। হায়দার এবার সত্যি সত্যি ভয় পায়।
'রাতে আমার ডিউটি ছিল না, স্যার। আরেকজন ছিল। আমি জানি না, আল্লাহর কসম'।
'কোথায় ওনি?'
'এখনি ডিউটিতে আসবে। তার ডিউটি দুপুর ২-৩০ মিনিট থেকে শুরু'।
বলতে বলতেই পোশাক পরা একজন সিকিউরিটি প্রবেশ করে।
'এই ভাই, কাল রাতে একটি মার্সিডিজ গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখেছেন'। সাংবাদিক বন্ধু প্রশ্ন করেন।
' জ্বি স্যার, কাল রাতে ১১-৩০ মিনিটের দিকে একটি মার্সিডিজ গাড়ি চলে যায়'। তার উত্তরটা শুনে আমার শরীরটা শীতল হয়ে যায়। তার মানে ওরা বুঝেই গাড়ি সরিয়ে ফেলেছে।
'কোথায় নিয়ে গেছে'
'জানি না,' স্যার।
'ড্রাইভারের নাম্বার আছে?'
'জ্বী স্যার'।
তিনি তার মোবাইল থেকে ঐ গাড়ির চালককে রিং দেন।
'মোবাইল বন্ধ, স্যার'।

ডিজি মহোদয়কে জানাই।
'তার সকল পরিচিত আত্মীয়দের বাড়ির সন্ধান নাও, এবং বিভিন্ন মার্কেটের গ্যারেজ সার্চ কর'। কঠিন স্বরে ডিজি মহোদয় বলেন।
ইতোমধ্যে কাস্টমস অ্যাক্ট এর নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্য ও সিসি ক্যামরার ডিভাইজ আটক করে গাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।
গাড়ির মালিকের পরিচিত আত্মীয়স্বজনের বিভিন্ন বাড়িতে এবং বিভিন্ন মার্কেটের গ্যারেজে গাড়িটি খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যা নেমে পড়ে।

রাত ৮ টা।
ডিজি মহোদয়কে গাড়ি চালকের নাম্বার প্রদান করি। Call Track করার জন্য।
'ড্রাইভার পালাচ্ছে, সিলেট থেকে ঢাকায় চলে যাবে'। ডিজি মহোদয় জানান। 'ড্রাইভার ওখানে আছে। যাও, ট্র্যাক করে ড্রাইভারকে ধরতে চে'া কর'।
ড্রাইভারকে কখনো দেখি নাই তাই ঐ হায়দার আলীকে সাথে করে পুলিশকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে থাকি।
ইতোমধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে শহরে।
শুল্ক গোয়েন্দা গাড়ি খুঁজছে। বিভিন্ন সন্দেহজনক স্থানে অভিযান চালিয়ে গাড়িটি না পেয়ে সেদিন রাত ১২-০০ টায় অভিযান শেষ করি। যুগ্ম পরিচালক মহোদয়কে বিষয়টি অবহিত করি। তিনি আমার কাঁচা কাজের জন্য বকা দেন। আমি ভুলের ক্ষমা চেয়ে ফোনটা রাখি।

রাত ১২ টা।
অপরিচিত নম্বরের রিং বেজে উঠে মোবাইলে।
ঐ প্রান্তে একজন মধ্যবয়সী মহিলার কণ্ঠস্বর।
'আপনারা বি এম টাওয়ারের যে বাড়িতে সার্চ করেছিলেন আমি তার গিন্নি', মহিলা পরিচয় দেন।
সালাম দিয়ে কথা বলি।
'আপনারা গাড়িটা লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। গাড়িটা লুকালে আপনারা আরো বিপদে পড়বেন। গাড়িটা যদি আমাদের কাছে জমা দেন তাহলে আপনারা শুল্ক কর পরিশোধ করে গাড়িটি নিতে পারবেন। না হলে ঝামেলায় পড়বেন' দৃঢ় কণ্ঠে মহিলাকে বলি।
'আমাদের কোনো ঐ রকম গাড়ি নেই' মহিলা বলেন।
'না থাকলে ভাল, যদি আমরা খুঁজে পাই তাহলে আপনারা বিপদে পড়বেন। আপনার স্বামীকে তা জানাবেন'
ফোনটা কেটে দেয়।
ইতোমধ্যে অপরিচিত দু-একটি কল আসে এবং তারা গাড়ির বিষয়ে জানতে চায়।
গাড়ি সম্পর্কে আশার আলো উঁকি দেয়। আমি তাদেরকে জানিয়ে দেই যে গাড়িটি ভালোমতো জমা দিলে আর হয়রানি কারা হবে না। গাড়ির মালিককে আটক করা হবে না। না হলে অনেক কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
ক্লান্ত আমি অবশেষে মোবাইলের সুইচ অফ করে দেই।

সকাল ১০টা। ১০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।
ইমিগ্রেশনের সহকারী পুলিশ কমিশনারের রুমের সামনে। গাড়ির মালিকের সকল তথ্য ইতোমধ্যে আমাদের কাছে চলে আসছে। তার পাসপোর্টের বিষয়ে অভিযোগ গঠনের জন্য ইমিগ্রেশনের সামনে আসতেই হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল।
পরিচিত নম্বর। আমার মুখে একচিলতে হাসি।
'দাদা, আমি রবার্ট (ছদ্ম নাম) বলছি। আপনার সাথে Mersadez Car নিয়ে একটু কথা বলা দরকার। আপনি কি ফ্রি আছেন? গাড়ির মালিকের সাথে আমার কথা হয়েছে। তিনি একটি সমাধান চান'
'ভাই, এয়ারপোর্টে আসেন। তাড়াতাড়ি আসেন। আমি তো এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনে গাড়ির মালিকের পাসপোর্টের অবজেকশন দিতে আসছি' উত্তর দেই।
'ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করেন। আমরা একটু কথা বলে নেই। তারপর না হয় যা করার করেন'
আশার আলো দেখা হৃদয়ে হঠাৎ করে আনন্দের ঢেউ খেলা করল।

দুপুর ১২ টা।
ডিজি মহোদয়ের ফোন।
'Any update? গাড়ির মালিকের ছবি ও পাসপোর্ট ঠিকানা সংগ্রহ করে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ কর। তার বিদেশ যাওয়া বাতিল কর'
'জ্বী স্যার'
'সম্ভাব্য সকল স্থানে সার্চ কর। গাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে গাড়িটি জমা দিতে বলো। গাড়িটি জমা না দিলে তাকে আইনের সকল প্রয়োগগুলো বল'
'জ্বী স্যার। জ্বী স্যার। আমি কাজটি ঠিকমতো শেষ করতে পারলাম না। আমি ফেইলর হলাম স্যার। আমি চে'া করছি, স্যার।'
'ঠিক আছে। তোমাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে সকল টেকনিক অবলম্বন করে গাড়িটি আটক কর। এটা তোমার একটা চ্যালেঞ্জ'
'জ্বী স্যার'

এয়ারপোর্টের ভিআইপি রুম।
রবার্ট ভাই আসলেন। অনেকদিন পরে দেখা। দেখা হয়ে ভালো লাগছে।
'ভাই, কেমন আছেন? অনেকদিন পরে দেখা? সেই ভ্যাটের এক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল' আমি হাসতে হাসতে বলি।
'ভালো, দাদা। আপনার সাথে অনেক দিন পরে দেখা হলো' তিনি বলেন।
'গাড়ির মালিক আমাকে ধরেছে। তিনি ভয় পাচ্ছেন। নির্ভরযোগ্য কাউকে পাচ্ছেন না যিনি আপনার সাথে কথা বলবেন। গাড়িটা কিভাবে জমা দেওয়া যায়? গাড়ি জমা দিলে তাকে আটক করবেন কিনা'?
সারা শরীরে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তাকে বুঝতে না দিয়ে বলি, 'দেখেন, ভাই, গাড়িটা ওনার তা আমরা কনফার্ম। গাড়িটা যদি আমাদের নিকট হয়রানি না করে জমা দেন তাহলে তার Offense কম হবে। শাস্তির মাত্রা কমবে। যদি পেঁচিয়ে সময় ন' করেন তাহলে বিপদে পড়বেন। আর গাড়ি শুল্ক কর পরিশোধ করে তিনি আবার গাড়িটি ছাড় করিয়ে নিতে পারবেন'
রবার্ট ভাইয়ের সাথে এ বিষয়ে অনেক কথা হয়। তিনি দুপুরে গাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে জানাবেন বলে চলে যান।
সবসময়ের আশাবাদী আমি একটু চিন্তামুক্ত হই।
যুগ্ম পরিচালক মহোদয়ের ফোন। তিনি উৎসাহ দেন। ' চালিয়ে যাও, পারবে তোমরা'
'জ্বী স্যার'

দুপুর বিকাল ৪ টা।
রবার্ট ভাইয়ের রেস্টুরেন্টে আমি ও আমার পুরো টিম।
'তিনি গাড়িটা কিভাবে জমা দিবেন? গাড়ি জমা দিলে তাকে বা তার ড্রাইভারকে আটক করা হবে না তো? ' রবার্ট ভাই চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করেন।
'না! কাউকে আটক করা হবে না। আমি কথা দিচ্ছি। তিনি গাড়িটা আমাদের অফিসে বা ওনার বিল্ডিংয়ের সামনে রাখতে পারেন। তা না হলে কোথায় আছে আমাদেরকে জানান, আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসবো, কাউকে আটক করব না'
'ঠিক আছে ভাই। কিন্তু মিডিয়ার ভয় পাচ্ছেন। পুলিশের ভয় পাচ্ছেন, যদি আটক করে ফেলে। ইতোমধ্যে আমি পুলিশের সহায়তায় ওয়াকিটকির মাধ্যমে গাড়িটি দেখামাত্র আটক করার জন্য অনুরোধ করেছি'
তিনি গাড়ি মালিকের সাথে কথা বলেন। তিনি জানান যে, গাড়ির মালিক রাজস্ব বোর্ড বরাবর একটি পত্র বাহক মারফত দিবেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করি যে গাড়ির মালিককে সকল প্রকার সহযোগিতা করা হবে।
রাত ৭টায় গাড়িটি আমাদের নিকট হস্তান্তর করা হবে এই বিশ্বাসে অবশেষে টিমের সকলকে নিয়ে অফিসে ফিরি। সবার মনে খুশির আনন্দ। বিজয়ের আনন্দ।

রাত ৮ টা।
আমি রবার্ট ভাইকে ফোন করি। তিনি বলেন যে গাড়ি আসবে।
আবার চিন্তিত। যদি জমা না দেয়?
যদি অন্যত্র সরিয়ে ফেলে?
আমাদের সকল প্রচে'া বিফল। সাফল্য একটি বড় শূন্য। অপেক্ষায় থাকি।
অপেক্ষার প্রহরগুলো অনেক লম্বা হয়।

রাত ১০ টা। শরীর ঘামছে।
নিম্ন রক্তচাপের এই আমি ধীরে ধীরে চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত। ক্লান্ত। গত ২৪ ঘণ্টা ঘুম হয়নি। আরো ১২ ঘণ্টা গেলে ডিজি মহোদয়ের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম শেষ হয়ে যাবে। মাঠ পর্যায়ে প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হব আমি। একজন ব্যর্থ কর্মকর্তা। ব্যর্থ কর্মকর্তাদের কেউ কাছে রাখে না। এ সময় যুগ্ম পরিচালক মহোদয়ের সাথে এ বিষয়ে কথা হয়।

রাত ১২ টা।
বিদ্যুতের চমক। মেঘের গর্জন। কাল বৈশাখির ঝড়। বিদ্যুৎ চলে গেল। আবারো বৃ্ষি পড়ছে।
হতাশ!
ক্লান্ত!
অবসন্ন!
মনে মনে বলি, সেদিন গাড়িটা কাউকে নজরদারিতে রাখলে আজ এই অবস্থা হতো না
ভুল সিদ্বান্ত। নিজের ওপর মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায়।
সবাই অপেক্ষা করছে।
'কখন আসবে?'
'আসবে তো?'
'যদি না আসে?'
বৃ্ষি পড়ছে।
এই বৃ্ষি এখন ভালো লাগছে না একেক সময়, ভাল লাগা অনেক কিছুই ভালো লাগে না।
সবাই অফিসের বারান্দায় অপেক্ষায়।
ফিস ফিস শব্দ।
বাইরে অন্ধকার।
ঝড় বেড়ে গেছে।
বাতাসের তোপে সুপারি গাছগুলো বেঁকে পড়ছে; আবার উঠছে।
অসহ্য লাগছে সব কিছু।
এভাবে আরো আধঘণ্টা সময় চলে গেল।
'চিটিং করল না চিটিং তো করার কথা না'
নাকি রাস্তায় পুলিশে আটকালো।

রাত ১ টা।
বৃষ্টি' থেমে গেছে।
বাইরে দাঁড়ানো আমরা সবাই।
প্রধান অতিথির অপেক্ষায়।
অথবা প্রেমিক প্রেমিকার অপেক্ষায়। আসবে তো? যেন তার সাথে অনেকদিন দেখা হয় না।
অথবা মেলা থেকে বাবার খেলনা আনবে এই ভালো লাগার অপেক্ষায়।
অপেক্ষারা অনেক দীর্ঘ হয়।
অপেক্ষা শেষ হয় না।
হঠাৎ মোবাইল ফোন বেজে ওঠে।
অপরিচিত নম্বর থেকে।
'স্যার, গাড়িটি এখন বি এম টাওয়ারের সামনে। আপনারা নিয়ে যান'
চিৎকার দিয়ে উঠে আমি।
পাওয়া গেছে।
পারলাম।
আমরা শেষ করতে পারলাম।
বুকে আনন্দ।

মনে খুশি।
খুশির ঢেউ।
টিমকে পাঠিয়ে দিলাম গাড়িটি নিয়ে আসতে। আমি এখন গাড়িটির জন্য অপেক্ষা করব। প্রতীক্ষা করব। এ রকম প্রতীক্ষায় কেউ ক্লান্ত হয় না।

রাত ১.৩০ মিনিট।
বাইরে বসা আমি।
প্রতীক্ষা করছি।
প্রতীক্ষা।
বিদ্যুৎহীন এই ঝড়ের রাতের অন্ধকার গেটের সামনে একটি হঠাৎ আলোর রেখা।
কেউ একজন গেট খুলছে।
ঐ যে দেখা যাচ্ছে।
ঐ যে।
আসছে।
ধীরে ধীরে।
নেচে নেচে এগুচ্ছে।
চঞ্চলা কিশোরীর মতো। সিলভার রংয়ের গাড়ি।
আমার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে তার লাইটগুলো।
আমি তার প্রতীক্ষায় ছিলাম।
গত ৩৬ ঘণ্টা। আমরা সবাই অক্লান্ত প্রতীক্ষায় ছিলাম।
ঐ যে! গেট ছেড়ে ভিতরে আসছে।
আমরা তার অপেক্ষায় ছিলাম।
আরো একটু না হয় তার অপেক্ষায় থাকি! কি-বা এসে যায় তাতে???

- **প্রভাত কুমার সিংহ,** সহকারী পরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

আন্ডারকাভার

-মোঃ আল আমিন

ক্রিং.... ক্রিং.... ক্রিং.... ক্রিং.... !
টেলিফোনটি বেজে উঠে রাত তিনটার একটু পরে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে মাথা তোলে আয়াতুল আমিন। দাপ্তরিক টেলিফোন নাম্বার বলে কথা, রিসিভ না করলে বিপত্তি হতে পারে। শীতকালে এ সময়টাতে ফ্লাইট থাকে না বললেই চলে। সুতরাং অফিসাররা সবাই যার যার চেয়ারে গা এলিয়ে একটুখানি ঝিমিয়ে নেয়। আজ আয়াতেরও হয়েছে সেই দশা। কাস্টমসের নবীন সহকারী কমিশনার সে। শুরুতেই এয়ারপোর্টে পোস্টিং, শিফট ইনচার্জ হিসেবে। সিনিয়রদের, বিশেষ করে এডিসি ম্যাডামের কাছ থেকে পাওয়া একগাদা টিপস ছাড়া অভিজ্ঞতা বলতে শূন্য।
রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওপাশে কাঁপা কণ্ঠস্বর ঃ গোপন সংবাদ, "কিছুক্ষণের মধ্যে রিয়াদের যে ফ্লাইটটি ল্যান্ড করতে যাচ্ছে তাতেই রয়েছে কাঙ্ক্ষিত যাত্রী। নাম সজিব মিয়া, বাড়ি ঢাকা জেলার সোনাকান্দা, পকেটে লুক্কায়িত স্বর্ণবার কমপক্ষে ১০ পিস" ব্যাস, এটুকুই। ওপাশে ফোন রাখার তাড়া, আর কিছু বের করা গেল না।

হঠাৎ করেই শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল আয়াতের। এয়ারপোর্টের মতো পারফরম্যান্স ওরিয়েন্টেড জায়গায় তার প্রশাসনিক দক্ষতা প্রশংসনীয় হলেও বড় রিকভারি এখনো নেই। উল্লেখযোগ্য কিছু করার তৃষ্ণা তাঁকে তাই মাঝেমধ্যেই নাড়া দেয়। মনিটরে চোখ পড়তেই চোখ দুটো গোল্লা হয়ে গেল। বিজি রিয়াদ ল্যান্ড করবে আর দুই মিনিটের মধ্যে! ওয়াকিটকি হাতে নিয়েই বোর্ডিং ব্রিজে দায়িত্বরত মাইক-১০ ইন্সপেক্টর তারিকুল-কে ডাকতে শুরু করল। চারবার ডাকার পর সাড়া পাওয়া গেল। ফ্লাইট ল্যান্ডিং এর আপডেট চাইতেই মাইক-১০ "দেখে জানাচ্ছি" বলাতে মেজাজটা বিগড়ে গেল। পরক্ষণেই আবার নিজেকে শান্ত করতে হলো। মাথা ঠাণ্ডা রেখেই কাজ বের করতে হবে। সেলফোনটা হাতে নিতেই প্রথমে ইন্সপেক্টর মজিদ এর কথা মনে পড়ল। ছেলেটা তৎপর আছে, বললে যে কোনো কাজ বের করে আনতে পারে। সামনে যাকে যাকে পাবে সবাইকে নিয়ে এক্ষুনি রুমে আসতে বলল।

গভীর রাতের ডাকাডাকিতে সবার তন্দ্রাভাব কেটে গেছে যেন। সিসিটিভি মনিটরে কয়েকজনকে সচকিত হয়ে রুমের দিকে আসতে দেখা গেল। মাত্র দুই মিনিটের একটা গড়পড়তা অপারেশন প্ল্যানিং ব্রিফ করা হলো। কে কোথায় অবস্থান নিবে, কিভাবে কী করবে তা নির্ধারণ করা হলো। ঠিক তখনই ওয়াকিটকিতে ভেসে এলো মাইক-১০ এর বিধ্বস্ত কণ্ঠ "স্যার, বিজি রিয়াদ অলরেডি ল্যান্ডেড, কানেক্টেড টু বোর্ডিং ব্রিজ থ্রি, টোটাল প্যাসেঞ্জার টু হান্ড্রেড এন্ড টেন"। ধ্যাৎ, চেয়ার ছেড়ে আয়াত নিজেই ছুটল বোর্ডিং ব্রিজের দিকে। বোর্ডিং গেটে পাসপোর্ট ধরে ধরে যাত্রী খুঁজে বের করার সুযোগটা বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেল।

তাড়াহুড়ার সময় ব্রেন একটু দেরিতে খোলে আয়াতের। হঠাৎই মনে পড়ল ইমিগ্রেশন সেরে বেল্ট এলাকায় বের হওয়ার একটাই ফটক। সেখানে আবার ইমিগ্রেশনের একজন অফিসার সব পাসপোর্ট হাতে নিয়ে চেক করে দেখে ইমিগ্রেশন সিল পড়েছে কিনা। ওখানে একজনকে দাঁড় করালেই তো হয়। ইমিগ্রেশন অফিসারকে ম্যানেজ করে তার সাথে সাথে সব পাসপোর্ট দেখে নিবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ইমিগ্রেশনকে কনভিন্স করার মতো কে আছে? স্যার! ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই রোমানার দিকে চোখ পড়ল। সদ্য যোগদান করা সিপাই মেয়েটি অল্প ক'দিনেই প্রিভেন্টিভ কার্যক্রমের কলাকৌশল বেশ দখল করে ফেলেছে। তাঁকে পাঠানো হলো। নির্ধারিত পয়েন্টে পৌঁছার ঠিক দশ সেকেন্ড পরেই দূর থেকে আয়াত দেখল ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্ট দেখা শেষ করেই রোমানার হাতে তুলে দিচ্ছে।

পাঁচ মিনিট .. দশ মিনিট .. এভাবে আধাঘণ্টা পার হয়ে গেল। একে একে সব যাত্রী বের হয়ে বেল্টের দিকে যাচ্ছে। একটু পরেই বেল্টে লাগেজ দিবে। তখন সবাই হুড়মুড় করে লাগেজ নিয়ে গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে সোনাকান্দার সজিব মিয়াকে খুঁজে বের করতে না পারলে আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। পাগলের মতো এদিকওদিক ছুটছে আয়াত। একবার বেল্ট এলাকা, আবার ইমিগ্রেশন, আবার গ্রিন চ্যানেল। সেইসাথে ওয়াকিটকিতে সবার কাছ থেকে আপডেট নেয়া। কিন্তু সজিব মিয়ার কোন খোঁজ নেই। ইতোমধ্যেই ইন্সপেক্টর বিধান প্যাসেঞ্জার মেনিফেস্ট নিয়ে চলে এসেছে। গরু খোঁজা খুঁজেও তাতে সজিব মিয়ার নাম পাওয়া গেল না। বেল্ট এলাকায় নাম ধরে ডেকেও কারো কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

No Smoking

তবে কি তথ্য ভুল ছিল? নাকি কেউ কাস্টমসের সাথে মজা নিল? নাকি অন্য কিছু?

"ও ভাই, রিয়াদের সামানা কয় নাম্বার বেল্টে দিছে, কইবার পারেন?"
পাশ ফিরল আয়াত। বাম পাশে খালি ট্রলি হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক মাঝ বয়সি ভদ্রলোক। মুখে ছাটানো গোঁফ, গায়ে একরঙা ফুলহাতা শার্ট। জিন্সের প্যান্ট, তার সাথে ফরমাল স্যু। দেখে চিরাচরিত প্রবাসী ভাইদের মতই লাগে।
রিয়াদ থেকে আসছেন?
হ।
কী নাম আপনার ভাই?
মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ।
(সজিব .. শহিদ .. সজিব .. শহিদ, আয়াত আওড়ায়)
বাড়ি কোথায়?
ডাকা ডিস্ট্রিক।
গ্রামের নাম?
শোনাকান্দা।
ঢেউ খেলে যায় আয়াতের মাথায়, সোনাকান্দার সজিব নয়, সোনাকান্দার শহিদ!
আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি, প্লিজ?
ক্যান ভাই, আপনেরে পাসপোর্ট দেখামু ক্যান?
আইডেনটিটি কার্ড দেখায় আয়াত। আমি এয়ারপোর্ট কাস্টমসের শিফট ইনচার্জ, যুক্তিসঙ্গত কারণেই আপনার পাসপোর্ট দেখা আমার প্রয়োজন। আইনগতভাবে সে অধিকার আমার আছে। বুঝিয়ে বলে আয়াত।
শার্টের বুক পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে শহিদুল্লাহ। একটানে তা হাতে নিয়ে খুলে দেখে আয়াত।
নাম ঠিকানা ঠিক আছে, শ্রমিক ভিসা, তবে ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লাইয়ার নয়। গত সাত বছরে এনিয়ে দু'বার দেশে এসেছে। প্রকৃত প্রবাসী শ্রমিকদের মতই যাতায়াত।

আপনাকে আমার সাথে একটু আসতে হবে।
একটু খানি ভড়কে যায় শহিদুল্লাহ। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে, "বাই, আমার লাকিজ ত পাই নাই এহনো। লাকিজ ফালাইয়া আপনের লগে কই জাইতাম?"
ইতোমধ্যেই দু'জন ইন্সপেক্টর এসে যোগ দিয়েছে আয়াতের সাথে।
লাগেজ নিয়ে একদম ভাববেন না। লাগেজ ট্যাগগুলো দিন। আমাদের অফিসাররা সেগুলো নিয়ে আসবে। আপনি আমার সাথে চলুন। পকেট থেকে লাগেজ ট্যাগ বের করে দেয় শহিদুল্লাহ। আয়াত সেটা ইন্সপেক্টর আলতাফ আর সাইদ-কে বুঝিয়ে দিয়ে অফিস রুমের দিকে এগুতে থাকে। পাশে হাঁটছে শহিদুল্লাহ। বিড়বিড় করে কিছু বলছে যেন। গালিটালি দিচ্ছে বোধহয় কাউকে। কাস্টমসকেও হতে পারে। সারা পথ ভ্রমণ করে দেশে নেমে কাস্টমসের চেকিংকে অনেকের কাছেই বিরক্তিকর বলে মনে হয়। অবশ্য এসব বিরক্তিকর পরিস্থিতি নীরবে সহ্য করেও কাজ বের করে নেয়ার দক্ষতা কাস্টমস কর্মকর্তাদের বরাবরই রয়েছে।

জেসি স্যারের ফাঁকা কক্ষে ঢুকানো হলো শহিদুল্লাহকে। ইন্সপেক্টর শচীন আর শাহজাহান-কে নিয়োগ করা হলো দেহ তল্লাশিতে। গায়ে হাত পড়তেই রেগে গেল শহিদুল্লাহ। "আপনারা আমারে হয়রানি করতাছেন" অভিযোগ উত্থাপন করলো শহিদুল্লাহ। অফিসাররা কেয়ার করল না। গোপনীয়তা রক্ষার আশ্বাস দিয়ে একে একে সব জামাকাপড় খুলতে বলা হলো। শার্টটা খুলতেই ধরা খেল শহিদুল্লাহ। দুই হাতের কনুইয়ের ভাঁজে কালো রঙয়ের স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো কিছু চোখে পড়ল। কাস্টমস অফিসারদের
অভিজ্ঞ চোখ চকচক করে উঠল। দুইশত গ্রাম ওজনের তিনটি স্বর্ণের বার। সারা দেহ ঘেঁটে আর কিছু মিলল না।

“স্যার, গরিব ঘরের পোলা আমি। সাত বছর বিদেশ করেও লাভ করতে পারি নাই। মালিক ভালো পরে নাই, বেতনও দেয় কম। এইবার একবারে চইলা আইচিতো, তাই কয়টা টাকার লোবে এই জিনিস লইয়া আইচি। আমারে ছাইড়া দেন স্যার, এইবারের মতো মাপ কইরা দেন। আপনার পায়ে পড়ি স্যার।”

আয়াতের মাথায় এ আকুতি ঢুকে না। সোর্স এর দেয়া সব তথ্যই মোটামুটি মিলে গেল, শুধু স্বর্ণের বারের সংখ্যা মিলছে না। অন্তত দশটি স্বর্ণের বার থাকার কথা, পাওয়া গেল মাত্র তিনটি। বাকিগুলো কোথায় গেল, নাকি এর মধ্যেই হ্যান্ডওভার হয়ে বেরিয়ে গেছে? ঠিক তখনই বেল্ট থেকে শহিদুল্লাহর দুইটি লাগেজ নিয়ে এলো ইন্সপেক্টর সাইদ। অধীর আগ্রহ আর পুলক নিয়ে বার বার করে লাগেজ দু'টি স্ক্যানিং মেশিনে ঢুকিয়েও সন্দেহজনক কোন ইমেজ পাওয়া গেল না। অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর পারোয়ার-কে নিয়ে লাগেজ খুলে পাওয়া গেল প্রবাসী শ্রমিকদের আনীত প্রচলিত জিনিসপত্র কাপড়-চোপড়, সাবান, শ্যাম্পু, খেজুর, জায়নামাজ, আতর, বাচ্চাদের খেলনা ইত্যাদি। হিসাব মিলছে না আয়াতের মাথায়। নিজের রুমে শহিদুল্লাহকে নিয়ে গিয়ে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদেও মিলছে না কোনো তথ্য। শহিদুল্লাহর সাফ জবাব, তার কাছে আর কোনো স্বর্ণের বার নেই।

পাশের সিসিটিভি মনিটরে চোখ রাখল আয়াত। বিজি রিয়াদ ফ্লাইটের যাত্রীরা গ্রিন চ্যানেল পার হচ্ছে। যাত্রীদের বড় একটা অংশ ইতোমধ্যেই বের হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই এডিসি ম্যাডামের কাছ থেকে এয়ারপোর্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে শোনা গল্পের একটা লাইন মাথায় খেলে গেল। সবাইকে রেখে রুদ্ধশ্বাসে গ্রিন চ্যানেলের দিকে ছুটল আয়াত। ব্যাগেজ কাউন্টারে টেবিলের কোণায় ছোট একটা ধাক্কা লাগলেও সেদিকে হুঁশ নেই তাঁর। গ্রিন চ্যানেলের মুখে পৌঁছে ওয়াকিটকিটা কোমরে লুকিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো আয়াত। অবশিষ্ট যাত্রীদের মধ্য থেকেই খুঁজতে হবে কাঙ্ক্ষিত মিয়া ভাইকে। বাজ পাখির দৃষ্টি দিয়ে সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখ আটকে গেল একজনের দিকে। বিশ বাইশ বছর বয়সী তরুণ ছেলেটি। ট্রলিতে ছোট্ট একটি লাগেজ ঠেলে নিয়ে খুব ধীর গতিতে গ্রিন চ্যানেলের দিকে এগুচ্ছে। পায়ের চেয়ে বেশি চলছে যেন চোখ দুটো। অনবরত এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছে যেন। একা একা গ্রিণ চ্যানেল পার হতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না, এমন একটা ভাব তার চলনে। ভাগ্যের ওপর ঝুঁকি নিল আয়াত। শেষ চেষ্টা হিসেবে বাল্যকালের আনাড়ি চাল দিল একটা। যাত্রীর পাশে গিয়ে অন্যদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমাকে ফলো করেন। লোকটা থমকে গেল, আপাদমস্তক সিভিল পোশাকধারী আয়াতকে দেখল একবার।

চোখে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট। ভুরু কুচকে বলল, মানে? আবার টোপ দিল আয়াত, এত কথা বলার সময় নাই। আগেরজন ধরা খেয়ে গেছে, কাস্টমস ওদিকে ব্যস্ত। আমাকে ফলো করেন।

গুনে গুনে সাত কদম হাঁটল আয়াত। লোকটা ঠিক সাত কদমেই তাকে ফলো করল। সাফল্যের সম্ভাবনা টের পেল আয়াত। তারা এখন রেড চ্যানেলের কাছাকাছি, ফাঁকা জায়গায়। চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করল আয়াত এবার, গোল্ড কোথায়, লাগেজে নাকি বডিতে? লোকটা সামান্য কেঁপে উঠল যেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে একবার মিনতি করার সুযোগ নিল, যা চান তাই দিব, এবারের মতো ছেড়ে দেন। কোমর থেকে ওয়াকিটকি বের করে লোকটার ঘাড়ের দিকে তাক করে গর্জন করল আয়াত, পাসপোর্ট বের করেন। গর্জন শুনে ছুটে এলো অন্য অফিসাররা। সেইসাথে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনও চোখের পলকে হাজির। সবার উপস্থিতিতে তাকে এস্কর্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যাগেজ কাউন্টারে। নিজের আসন্ন বিপদ টের পেয়েও মেনে নিল যেন লোকটা। সবার কথামত নিজ হাতে লাগেজ খুলে বের করে আনল দু'টি বর্গাকার কালো রঙয়ের প্যাকেট। প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে আসতে লাগল স্বর্ণের বার, একে একে মোট একত্রিশটি!

নেচে উঠলো কাস্টমস, জেগে উঠলো সমস্ত এয়ারপোর্ট। কাস্টমসের মাথায় আরেকটি সাফল্যের মুকুট। খুশিতে আত্মহারা সবাই। শুধু আয়াত এর মাথায় একরাশ কৃতজ্ঞতা .. এডিসি ম্যাডামের লেকচার ... আন্ডারকাভার স্মাগলিং ... বড় চালান পার করতে ছোট চালান ধরিয়ে দেয়া ... ভুল তথ্য দিয়ে কাস্টমসের মনোযোগ ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়া ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

- মোঃ আল আমিন, সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা

গোয়েন্দার ডায়েরি থেকে

-মোঃ তারেক মাহমুদ

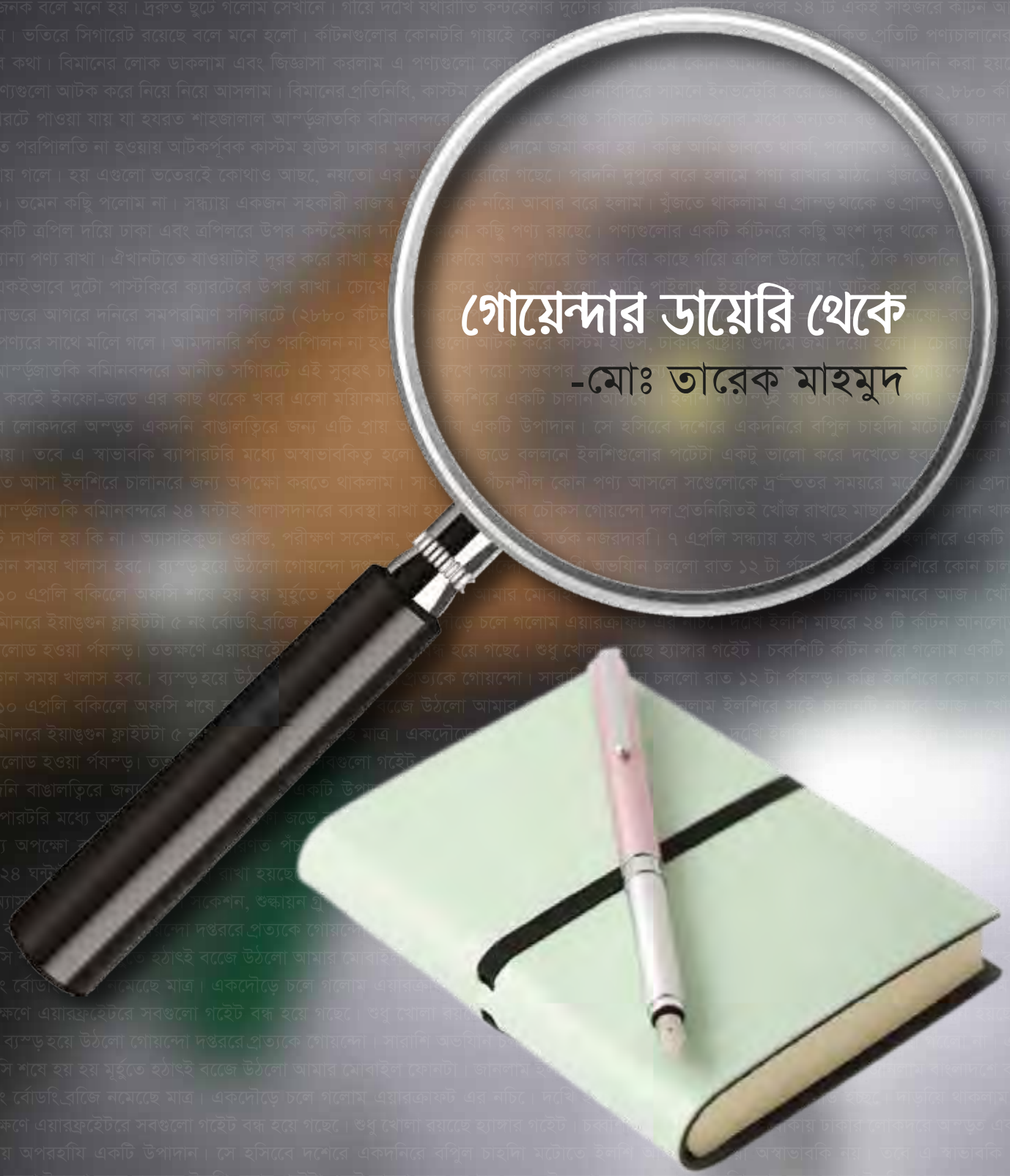

ঘটনা-১

সবে গোয়েন্দা কাজের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সার্কেলে পদস্থ হয়েছি। কাজের ক্ষেত্রগুলো বুঝে ওঠার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে গোয়েন্দা কাজের অভিজ্ঞতা বলতে দু-চার পাতা শার্লক হোমস বা ফেলুদার গল্প! তবে এরই মধ্যে এটুকু বুঝেছি যে ভালো ইনফর্মার ছাড়া গোয়েন্দা কাজ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই চেষ্টা করছিলাম ভালো কিছু ইনফরমার জোগাড়ের। এরই মধ্যে পেয়ে গেলাম ইনফো-রতন (সাংকেতিক নাম) কে। হঠাৎ করেই একদিন একটি এয়ারওয়ে বিল(বিমানযোগে বাহিত পণ্য চালানের ইউনিক নম্বর) নম্বর দিয়ে বললেন এই এয়ারওয়ে বিলের পণ্যগুলো যেন ভালো করে দেখি। অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড (কাস্টমস এর অটোমেটেড সিস্টেম সফটওয়্যার) এ দেখলাম চালানটিতে চারটি কার্টন রয়েছে যা অ্যাসোর্টেড নামে ঘোষণা দেয়া আছে। সন্দেহ হলো। সাথে সাথে সদলবলে পুরো মাঠ খুঁজে এই এয়ারওয়ে বিলের চারটি ক্যারেট (একটি বড় কার্টন যার ভেতরে কতগুলো ছোট ছোট কার্টন মোড়ানো থাকে) মাঠের এক কোনায় পাওয়া গেছে বলে একজন কর্মকর্তা জানালেন। সে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেই দেখি ক্যারেট চারটি আর সেখানে নেই। এত দ্রুত বড় বড় চারটি ক্যারেট হাওয়া হয়ে গেল! আমি বিস্ময়ে হতবিহ্বল! সবাই মিলে পুরো মাঠ আবার খুঁজলাম। কিন্তু না, কোথাও আর এই এয়ারওয়ে বিলের কোনো পণ্যের হদিস পেলাম না।

বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে বললাম এই পণ্যগুলো খুঁজে দিতে। তারাও খোঁজাখুজি করলেন। কিন্তু আর কোনো হদিস পাওয়া গেল না। খুব হতাশ হলাম। কিন্তু আশা ছাড়লাম না। পরের দিন হঠাৎই ইনফো-রতন জানালো একে-১৭৭১৭, একে-১৭৭৫৩ নম্বরের এয়ার কন্টেইনারের মাঝে কিছু কার্টন আছে যা তার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়। দ্রুত ছুটে গেলাম

সেখানে। গিয়ে দেখি যথারীতি কন্টেইনার দুটোর মাঝে দুটি ক্যারেটের ওপর ২৪টি একই সাইজের কার্টন আছে। একটু খোঁচা দিয়ে দেখলাম, ভিতরে সিগারেট রয়েছে বলে মনে হলো। কার্টনগুলোর কোনটির গায়েই কোন এয়ারওয়ে বিল নম্বর নেই যেটা আমদানিকৃত প্রতিটি পণ্য চালানের প্রতিটি কার্টনের গায়েই থাকার কথা। বিমানের লোক ডাকলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম এই পণ্যগুলো কোন এয়ারলাইনসের মাধ্যমে কোন আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি করা হয়েছে তা জানাতে। একই সাথে পণ্যগুলো আটক করে নিয়ে আসলাম। বিমানের প্রতিনিধি ও কাস্টম হাউস ঢাকার প্রতিনিধিদের সামনে ইনভেন্ট্রি করে জো-ব্লাক বান্ডের ২,৮৮০ কার্টন (৪,৬০,৮০০ শলাকা) সিগারেট পাওয়া যায়। যা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিকট অতীতে প্রাপ্ত সিগারেট চালানগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় সিগারেটের চালান। সিগারেটগুলো আমদানির শর্ত পরিপালিত না হওয়ায় আটকপূর্বক কাস্টম হাউস ঢাকার মূল্যবান রাষ্ট্রীয় গুদামে জমা করা হয়। কিন্তু আমি ভাবতে থাকি, পেলাম তো দুটি ক্যারেট। আর দুটি ক্যারেট কোথায় গেল। হয় এগুলো ভেতরের কোথাও কাছে, নয় এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে। পরদিন বের হলাম পণ্য রাখার মাঠে। খুঁজতে থাকলাম এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। তেমন কিছু পেলাম না। সন্ধ্যায় একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে নিয়ে আবার বের হলাম। খুঁজতে থাকলাম এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। হঠাৎ দূর থেকে দেখলাম প্লাস্টিকের একটি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা এবং ত্রিপলের ওপর কন্টেইনার দিয়ে লুকানো কিছু পণ্য রয়েছে। পণ্যগুলোর একটি কার্টনের কিছু অংশ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। কার্টনগুলোর চারদিকে অন্যান্য পণ্য রাখা। ঐখানটাতে যাওয়াটাই দুরূহ করে রাখা হয়েছে। লাফিয়ে অন্য পণ্যে ওপর দিয়ে কাছে গিয়ে ত্রিপল উঠিয়ে দেখি, ঠিক গতদিনে পাওয়া কার্টনের অনুরূপ কার্টন এবং একইভাবে দুটো প্লাস্টিকের ক্যারেটের ওপর রাখা। চোখে চকচক করে ওঠে। মনে হলো, আমি পাইলাম, ইহাকে পাইলাম! আটক করে অফিসে এনে ইনভেন্ট্রি করে ঠিক একই ব্রান্ডের আগের দিনের সমপরিমাণ সিগারেট (২,৮৮০ কার্টন) সিগারেট পাওয়া গেলো। অবশেষে হিসাব মিললো! ২+২ = চার হলো! ইনফো- রতনের দেয়া চার ক্যারেট সন্দেহজনক পণ্যের সাথে মিলে গেল। আমদানির শর্ত পরিপালন না হওয়ায় এগুলো আটক করে কাস্টম হাউস, ঢাকার রাষ্ট্রীয় গুদামে জমা দেয়া হলো। চোরাচালানের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আনীত সিগারেট এই সুবৃহৎ চালানটি রুখে দেয়া সম্ভবপর হলো। ধন্যবাদ ইনফো-রতনকে, ধন্যবাদ শুল্ক গোয়েন্দা টিমকে।

ঘটনা-২

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। হঠাৎ করে ইনফো-জেড এর কাছ থেকে খবর এলো মিয়ানমার হতে ইলিশের একটি চালান আসবে। ইলিশ নিতান্তই স্বাভাবিক একটি পণ্য। আর সামনে পহেলা বৈশাখ থাকায় ঢাকার লোকদের অন্তত একদিনের বাঙালিত্বের জন্য এটি প্রায় অপরিহার্য একটি উপাদান। সে হিসেবে দেশের একদিনের বিপুল চাহিদা মিটাতে ইলিশ আমদানি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে এ স্বাভাবিক ব্যাপারটির মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব হলো ইনফো-জেড বললেন ইলিশের পেটটা একটু ভালো করে দেখতে হবে। ইনফো-জেড এর সূত্র ধরে মিয়ানমার হতে আসা ইলিশের চালানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। সাধারণত পঁচনশীল কোনো পণ্য আসলে সেগুলোকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে খালাস প্রদানের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২৪ ঘণ্টাই খালাসদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। আমার চৌকস গোয়েন্দা দল প্রতিনিয়তই খোঁজ রাখছে মাছের কোনো চালান খালাসের জন্য কোনো বিল অব এন্ট্রি দাখিল হয় কিনা। অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড, পরীক্ষণ সেকশন, শুল্কায়ণ গ্রুপ সর্বত্রই সতর্ক নজরদারি।
৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় হঠাৎ খবর এলো ইলিশের একটি চালান শুল্কায়ণ হয়েছে, যে কোনো সময় খালাস হবে। ব্যস্ত হয়ে উঠলো গোয়েন্দা দপ্তরের প্রত্যেক গোয়েন্দা। সাড়াশি অভিযান চললো রাত ১২টা পর্যন্ত। কিন্তু ইলিশের কোনো চালান পাওয়া গেলো না। এরপর ১০ এপ্রিল অফিস শেষ হয়। মুহূর্তে হঠাৎই বেজে উঠলো আমার মোবাইল ফোনটা। জানলাম ইলিশের সেই চালানটি নামবে আজ। খোঁজ নিয়ে জানলাম বাংলাদেশ বিমানের ইয়াঙ্গুন ফ্লাইটটা ৫নং বোর্ডিং ব্রিজে নেমেছে মাত্র। এক দৌড়ে চলে গেলাম এয়ারক্র্যাফট এর নিচে। দেখি ইলিশ মাছের ২৪টি কার্টন আনলোড হচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকলাম আনলোড হওয়া পর্যন্ত। ততক্ষণে এয়ারফ্রেইটের সবগুলো গেট বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু খোলা রয়েছে হ্যাঙ্গার গেট। চব্বিশটি কার্টন নিয়ে গেলাম হ্যাঙ্গার গেটে। স্ক্যান করা হলো। স্ক্যানিং এ কিছু বুঝা গেলো না। মাছগুলোর কার্টন খুললাম। বরফ দিয়ে রাখার কারণে জমাট বেঁধে প্রচণ্ড শক্ত হয়ে আছে। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নরম করলাম। পেট কাটলাম। না নাড়িভুঁড়ি, আর ডিম ছাড়া আর কিছু নেই। কয়েকটি মাছ দেখলাম; কিন্তু না, কিছুই মিললো না। ব্যর্থ হলাম। তবে আশা ছাড়লাম না। একদিন হয়তো সত্যিই ধরে ফেলবো মাছের পেট নাড়িভুঁড়ি-ডিম এর বদলে ভরা রয়েছে ইয়াবায়, সেই আশায় রইলাম।

ঘটনা-৩

এয়ারফ্রেইট থেকে তখন সবে এয়ারপোর্টে এসেছি। দেখে শুনে-বুঝে ওঠার চেষ্টা করছি। আমাদের সুদক্ষ গোয়েন্দা দলের কাছ থেকে নিত্যনতুন কৌশলে ঘটা চোরাচালান প্রতিহতের তালিম নিচ্ছিলাম। একদিন আমাদের কর্মকর্তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মালেয়শিয়া ফেরত একজন যাত্রীকে গ্রিনচ্যানেল অতিক্রমকালে ব্যাগেজ কাউন্টারে নিয়ে আসলো। উক্ত ব্যক্তির ব্যাগেজ ও দেহ তল্লাশি করা হলো। তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল দুটো রিচার্জ্যাবল চার্জার লাইট। চার্জার লাইটটি হাতে নিয়ে তুলে ধরলাম। নিচের দিকের ওজনটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। চার্জার লাইটটি খোলার নির্দেশ দিলাম। লাইটা খুলে ভেতরে ব্যাটারি পাওয়া গেল। ব্যাটারির ওজনের অস্বাভাবিকত্ব দেখে ভয়ে ভয়ে ব্যাটারি কাটার নির্দেশ দিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম এই কারণে যে, যদি ভিতরে সেরকম কিছু না থাকে, তবে চার্জারটাই আর ব্যবহারের উপযোগী থাকবে না। কিন্তু ব্যাটারি ভেঙে ভেতরে ছয়টি (প্রতিটি ১০ তোলা ওজনের) স্বর্ণবার পাওয়া গেল। আমাদের মুখে হাসির ঝিলিক। আরেকটি চার্জার লাইটেও একই পদ্ধতিতে ছয়টি স্বর্ণবার রাখা ছিল। মোট ১২ টি স্বর্ণবার (ওজন প্রায় ১.৫ কেজি) পাওয়া গেল। উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে জানালো যে, অন্য আরেকজন ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য এনেছে। আটককৃত ব্যক্তিকে দিয়ে ফোন করালাম সেই ব্যক্তিকে এবং বলতে বললাম যে, কাস্টমস এ একটু সমস্যা হয়েছে, সে যেন কিছু টাকা নিয়ে আসে। উক্ত ব্যক্তি আসলে আমাদের চৌকস গোয়েন্দা দল তাকেও প্রায় ৬০ হাজার টাকাসহ আটক করে আনতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে আটককৃত দুই ব্যক্তিকেই পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

গোয়েন্দা কাজ হলো কিছুটা ইনফরমেশন, কিছুটা ইনটেলিজেন্স, কিছুটা দক্ষতা, কিছুটা অভিজ্ঞতা, কিছুটা অধ্যবসায়সহ আরও কিছুর সংমিশ্রণ। সবচেয়ে বেশি যেটা দরকারি সেটা হলো টিমওয়ার্ক। আর টিমওয়ার্কটা খুব ভালো বলেই শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে।

- **মোঃ তারেক মাহমুদ,** সহকারী পরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

PORT OF HOUSTON AUTHORITY

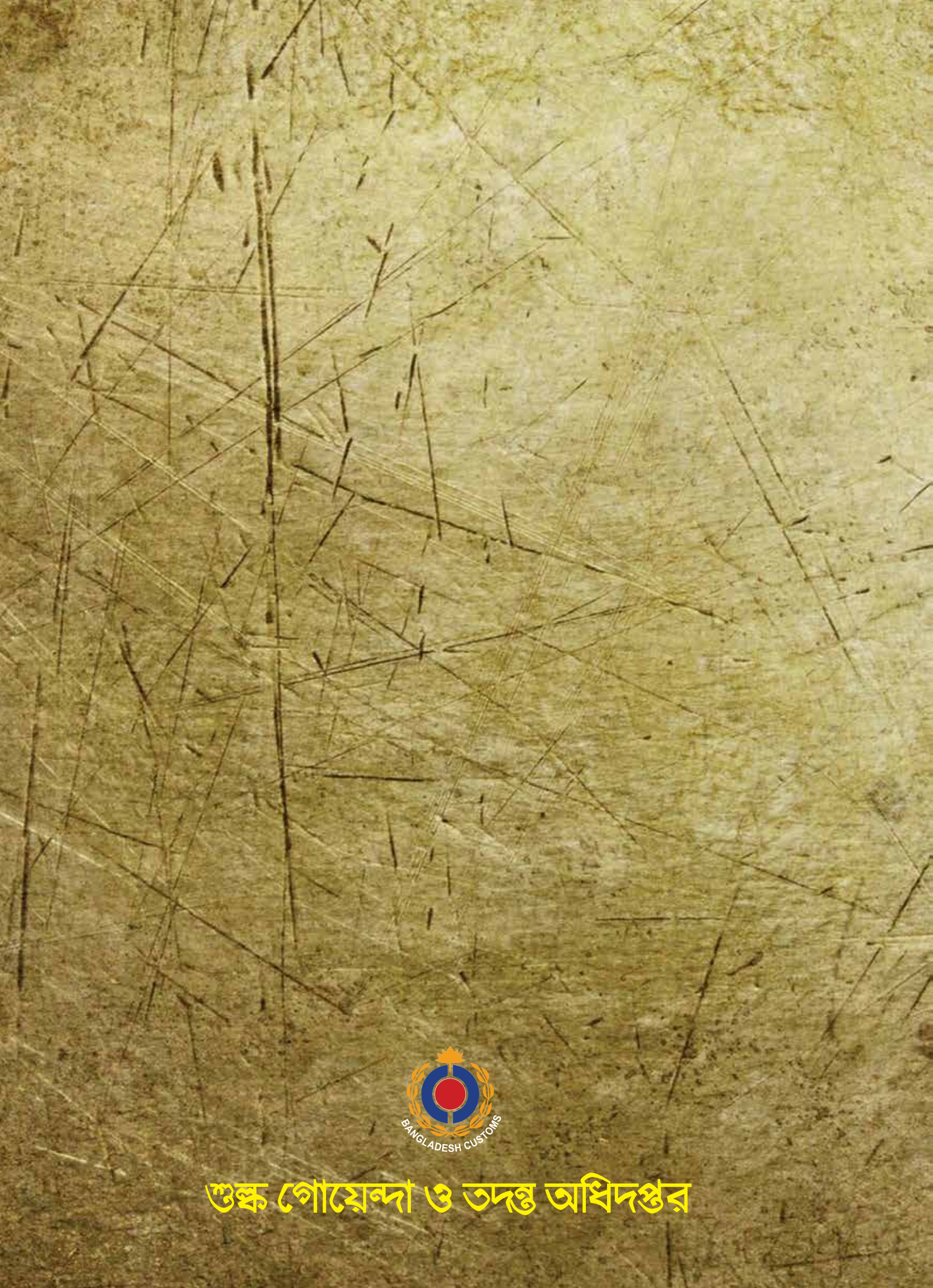

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর